সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

নৃশংসভাবে নিহত
বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা শঙ্কর গুহনিয়োগীর
স্মৃতির প্রতি নিবেদিত হল
যোগসূত্রের বর্তমান সংখ্যাটি

সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা ১৯৯১

সম্পাদক : বিনয় ঘোষ
শিল্প নির্দেশক : দেবাশিস দত্ত
প্রচার : গোপাল বসু, মানস বসু
বিজ্ঞাপন : পারমিতা সিন্‌হা
ব্যবস্থাপনা : দিলীপ সেন
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : সোমনাথ হোর
যোগাযোগ : টি জি ২ / ২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়াড়া, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন : ৫৯৪০৪৮
৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

চিঠি : অনুরাধা, আপনি কোন দলে ৩ ☐ মিহির চক্রবর্তী / খেলা ভাঙার খেলা ৯ ☐ অরূপরতন বসু / প্রতারক ২১ ☐ কৃষ্ণগোপাল মল্লিক / গোলদীঘির এইখানটা ৪৫ ☐ অতীন্দ্রিয় পাঠক / মানুষের সীমানা ৫১ ☐ সিদ্ধার্থ সেন / আশ্চর্য দৃশ্যমালা ৫৮ ☐ ল্যাডলী মুখোপাধ্যায় / জনৈক আদমের সুরত ৮১ ☐ প্রশান্ত ভট্টাচার্য / এসো, উদ্দালকের পিছু পিছু ৯০ ☐ প্রভাস সেন / চিত্ত প্রসাদ, কিছু স্মৃতিচারণ ১০৪ ☐ সোমনাথ হোর / চিত্ত প্রসাদ ১১০ ☐ গৌরী ভট্টাচার্য / নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক ১১৪

চিত্ত প্রসাদ ক্রোড়পত্র ১—৯৮

চিত্রকর বনাম বিজ্ঞাপনের দালাল ২ ☐ গুহাচিত্র ১৫ ☐ টুকরো লেখা ২৪ ☐ হাংরি বেঙ্গল ৩৮ ☐ পরিশিষ্ট ৮১

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত 'হাংরি বেঙ্গল' যোগসূত্রের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হল। হাংরি বেঙ্গল এবং চিত্ত প্রসাদের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির কপি উদ্ধার গৌরী ভট্টাচার্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। এই সংখ্যা মুদ্রণে সহায়তা করেছেন রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌-এর কর্মীবৃন্দ। এঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। সুব্রত মজুমদার মুদ্রণের দায়িত্বে ছিলেন, ধন্যবাদ তাঁকেও।

১০ অক্টোবর, ১৯৯১

□

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

M/s. R. K. INTERNATIONAL

4/8, JOGENDRA BASAK ROAD
CALCUTTA-700 036
PHONE NO. : 52 6062

OFFICE :

80/1, GREY STREET
CALCUTTA-700 006
PHONE NO. : 55 5554, 55 6301

CITY OFFICE :

"TRUST HOUSE", 3RD FLOOR
32A, CHITTARANJAN AVENUE
CALCUTTA-700 012
PHONE NO. : 26 6914, 26 4790

BRANCH OFFICE :

16, VIDYASAGAR ROAD, KHALPARA
SILIGURI-734 405

FRASER ROAD, PATNA

MUZAFFARPUR, BIHAR

□

টক খেলে গলা ধরে ? মাথা ন্যাড়া করলে চুল গজায় ?
জন্ডিস কি মালায় সারে ? শুকনো ভাত খেলে কি
গলার কাঁটা নামে ? সিগারেট খেলে ক্যানসার হবেই ?

শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে এমন নানা প্রশ্নের
উত্তর পেতে হলে পড়ুন ও পড়ান

ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্যর

শরীর স্বাস্থ্য জিজ্ঞাসা

২৫ টাকা

দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট □ কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

□

□

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

Karigari

56, EKDALIA ROAD
CALCUTTA-700 019

□

DRINK
KENDUGURI TEA
IT IS
DELICIOUS, FRESH AND FLAVOURY
FOR YOUR REQUIREMENT OF QUALITY TEA
ORTHODOX, CTC AND GREEN

CONTACT :

The Kalyani Tea Co. Ltd.

11, R. N. MUKHERJEE ROAD
CALCUTTA-700 001
Phones : 28-5926 / 20-8281

□

□

With best compliments from :

ARBEITS (INDIA)
8/1, Middleton Road
5th Floor
Calcutta-700 071

□

With best compliments from :

ARINDAM AND BIKRAM

□

শুভেচ্ছা যোগসূত্রকে

অর্ঘ বসু
ও
অমিতেশ বসু

□

With best compliments from :

B. S. SIPANI & COMPANY

□

□

Lot of good wishes from :

M/s. DAS PRINTERS

Leading House of Quality Photo Offset &
Letterpress Printing

123/1, A. P. C. ROAD
CALCUTTA-700 006
Phone : 35-4312

Branch Office :
61, SURYA SEN STREET
CALCUTTA-700 009
Phone : 36-1543

□

With best compliments from :

Rupnarayanpur Metal & Wire Industries

157, Netaji Subhas Road
Calcutta-700 001

Manufacturers of Copper Wire

Factory :

RIC Shed, Dist. : Burdwan
Rupnarayanpur

□

□

Club Show & Tent Show
In 35 m.m. and 16 m.m.

Contact :

Lata Pictures

50/2, LENIN SARANI
CALCUTTA-700 013
Phone : 24-6092

□

With best compliments of

Shaw Wallace & Company Limited

4, BANKSHALL STREET
CALCUTTA-700 001

□

□

With best compliments from :

Electro Engineering Corporation

Electrical, Mechanical Engineers & Licensed Contractors

30, GOKUL BORAL STREET
CALCUTTA-700 012
Ring : 27-5904

□

With best compliments from :

ENGINEERING EXPORT PROMOTION COUNCIL

14/1B, EZRA STREET
CALCUTTA-700 001
Phone : 26-3080 (5 lines)
Telex : 215109
Fax : 266302

□

প্রথম সংখ্যা সম্পর্কে 'বাহ বাহ', 'ভাল, ভাল' কিংবা 'এ আর নতুন কী' গোছের মন্তব্য প্রধান ২৪টি চিঠি আমরা পেয়েছি। ব্যতিক্রম একটিই. তাতে আছে তীব্র প্রতিক্রিয়া এবং কিছু প্রশ্নও তোলা হয়েছে। অনুরাধার লেখাই পত্রপ্রেরকের বিচার্য। লেখাটিকে তিনি কাটা ছেঁড়া করেছেন। আশা করি অনুরাধা তাঁর বক্তব্য পেশ করবেন আগামী সংখ্যায়—সম্পাদক।

অনুরাধা, আপনি কোন দলে?

আপনাদের পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অনুধারা মহাপাত্র'র 'অজ্ঞাতবাসের পথে' নামক হাস্যরস লেখাটি পড়ে এই চিঠিটি লিখতে প্ররোচিত হলাম। অনুরাধার অতি দুর্বল গদ্যশৈলীর বাধা পেরিয়ে লেখাটি পড়তে দম পেয়েছিলাম এই কারণে যে সেখানে ইতস্তত আমার দু-চারটি বন্ধুর কথা বলা হয়েছে। পরে দেখা গেল যে অনুরাধা ওঁদের সম্পর্কে নিছক খানিক কুৎসা করেছেন। যাই হোক, সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। প্রথমে অনুরাধার 'বক্তব্য' নিয়ে আমার কিছু বলার আছে, সেটা বলি।

লেখাটিতে অনুরাধা অবশ্য সরাসরি তাঁর বক্তব্য বলে কিছু রাখেননি। বা, বলা ভাল, লেখাটির বাঁধুনি এতই দুর্বল যে খুব চেষ্টা না করলে তা থেকে 'বক্তব্য'বের করা খুব কঠিন। অবশ্য অনুরাধা অত্যন্ত চালাক। চেপে ধরা যায় এরকম বেফাঁস কথা বিশেষ বলেননি। সবটাই ঠারে-ঠোরে। অবশ্য বঙ্গ সংস্কৃতির নব্য বাবু-বিবি সম্প্রদায়ের, (যাঁরা এখন কফি হাউসে ফোক্-ফরেন্-বাউল ভলান্টারি-এজেন্সি-গ্রাম-লোকশিল্প নিয়ে মাতামাতি করেন) স্বভাবটাই এই: তাঁরা সর্বদাই নন্-কমিটাল থাকতে পছন্দ করেন। অনুরাধা কোনও ব্যতিক্রম নন।

বাহ্যতঃ অনুরাধার লেখার বিষয়বস্তু মানসিক প্রতিবন্ধকতা। মানসিক প্রতিবন্ধীদের রক্ষণাবেক্ষণে যে সব পেশাদার সমাজসেবকরা জড়িত তাঁরা কী ভীষণ অমানবিক ও নিষ্ঠুর, এটা নিয়ে অনুরাধা বিস্তর ভাটিয়েছেন। তার বিপরীতে, অনুরাধা নিজে কি অসামান্য মানবিকতা ও স্নেহের আকর, দূরদৃষ্টিসম্পন্না এবং কী ভীষণ জ্ঞানী— এই নিয়ে বেশ খানিক জ্ঞানদান। নিজের ঢাক পেটানো একটু রেখে-ঢেকে করলে ভাল হয়, উদ্দেশ্য সফল হয়, 'গ্রামের মেয়ে', সরলতা ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ অনুরাধা সম্ভবত এটা বোঝেন না। একটা উদাহরণ দিই। জনৈকা পেশাদার সমাজ-সেবিকার প্রসঙ্গে অনুরাধা গভীর বিরাগ নিয়ে বলছেন 'গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের মায়ের অবস্থার কথা বলতে গিয়ে রঞ্জিনী গর্ভপাতের কথায় আসে। তার গলায় স্বর

অতি স্বাভাবিক বা অভিনয়ের মতো স্বাভাবিক। সমাজে গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা তো স্বতঃসিদ্ধ। আমার বুক প্রায় শুকিয়ে ওঠে। পচা পাপড়ির মতো শিশুদের মুখ ভেসে ওঠে। এসব গবেষণা তো আসলে যাদের খুনের স্বভাব আছে, তাদের পরিচয়ই প্রকাশ করে।' (পৃ. ৮-৯) রঞ্জিনী নামক এই মেয়েটি অবশ্য বারবারই লেখাটির মধ্যে অনুরাধার কোপের বলি হয়েছেন। একাধিকবার তাঁকে 'বড়লোকের মেয়ে' 'ফেমিনিস্ট' বলে গালি দেওয়া হয়েছে। যাই হোক, সেটা না হয় মেয়েলি পরশ্রীকাতরতা বলে মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত লাইনগুলি অতি মারাত্মক। অনুরাধার পক্ষে। মানসিক প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গবেষণা বা লেখালেখি করতে হলে গর্ভাবস্থায় প্রতিবন্ধী বাচ্চাদের মায়ের অবস্থার কথা নিয়ে ভাবতে হবেই। এবং আর সব গবেষণার মতোই সেটা স্বাভাবিকভাবে বলা ছাড়া উপায় কি? চেঁচিয়ে, নাটক করে, গলা কাঁপিয়ে বা আবৃত্তি করে বললে কি অনুরাধা সেটা অনুমোদন করবেন? এবং এই গবেষণার সঙ্গে 'খুনের স্বভাবের' সম্পর্ক কি? অনুরাধা বুঝিয়ে বলবেন কি? বস্তুতঃপক্ষে, অনুরাধা নিজের অজান্তে নিজেকে চিনিয়ে ফেলেছেন। 'সমাজে গর্ভপাত, ভ্রূণহত্যা তো স্বতঃসিদ্ধ।'— এই বাক্যটির অর্থ কি? অনুরাধা কি জানেন যে গর্ভপাতকে মেয়েদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করতে, আইনী করতে, কত দীর্ঘদিনের নারী আন্দোলন ও লড়াই হয়েছে? অনুরাধা আসলে সেই সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল পুরুত ও পিউরিটান ভণ্ডদের পক্ষে কথা বলছেন যারা বলেন যে গর্ভপাত ও ভ্রূণহত্যা খুব খারাপ কাজ ও পাপ কারণ সন্তান ঈশ্বরের দান। গর্ভপাতের অধিকার মেয়েদের অর্জিত পবিত্র অধিকার যা পুরুষতন্ত্র থেকে আদায় করতে বহু লড়াকু মেয়ে লড়েছেন। অনুরাধার মতো কবিনী যিনি তৃতীয় শ্রেণীর মার্কিনী কাগজে নিজের পদ্য ছাপেন ও বিদেশি অর্থসাহায্যপুষ্ট 'সমাজসেবী' প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন আগে পর্যন্ত 'সমাজসেবার' চাকরি করতেন, কোন সাহসে ও ধৃষ্টতায় তিনি তার বিরোধিতা করেন? অথবা, এই 'গবেষণায়' তাঁর যদি এতই বিরাগ তবে তিনি সেটা করতেই বা গেলেন কেন? কে তাঁকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

অবশ্য নিজের সম্পর্কে অনুরাধার ধারণা অত্যন্ত উঁচু। আলোচ্য লেখাটিতে তিনি নিজের সম্পর্কে বলছেন: 'আমি ইন্টারভিউয়ার নই, কবিতা লেখক নই, দর্শক নই— আমাকে পালিয়ে যেতে হবে লেখকদের আড্ডা থেকে কর্মীদের দ্বন্দ্ব থেকে···। ···ঈশ্বরের দিকে ধাবমান আমার নৈরাজ্যবোধ। নারী স্বাধীনতার পদাধিকার পাওয়ার ঝোঁকও আমার নেই। আমি শুধু মানুষ।' (পৃ. ১৩-১৪) 'নারী স্বাধীনতাটা, অনুরাধার মতো 'মানবতাবাদীদের' পছন্দ নয়। সেটা বোঝাই যাচ্ছে। অবশ্য গোটা লেখাটি জুড়েই অনুরাধা নিজের বিস্তর গুণকীর্তন করেছেন। বারবার বলেছেন যে তিনি গ্রামের মেয়ে, গ্রামে যেতে চান, শহরের মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি তাঁর খুবই না-পসন্দ, লোকশিল্প-টিল্প তাঁর খুব পছন্দ। অনুরাধা, আপনাকে জিজ্ঞাস্য একটাই: শহরের প্রতি আপনার এই তীব্র 'অনীহা'র মধ্যে যদি একবিন্দু সত্যও থাকে, তবে বুঝিয়ে বলুন

যে কেন আপনি এই মুহূর্তে গ্রামে চলে যাচ্ছেন না ? কে আপনাকে আটকে রেখেছে ? আর মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির প্রতি আপনার এই তীব্র বিরাগের পরিপেক্ষিতে এটা বোঝা খুবই কঠিন যে কেন আপনি 'যোগসূত্র'র মতো একটা মধ্যবিত্ত পরিচালিত ও মধ্যবিত্ত-পঠিত, নিতান্তই শহুরে একটা সাংস্কৃতিক প্রোজেক্টে আপনার বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ের অশ্রু-সঞ্জাত ব্যথা উজাড় করে দিচ্ছেন ?

আসলে, অনুরাধা আপনি মধ্যবিত্ত সংস্কৃতির একটা অতি নিকৃষ্ট অংশের অসচেতন প্রতিনিধিত্ব করছেন। আপনার শ্রেণীচরিত্র এবং খোলসটা, আপনার সুবিধের জন্যই, আমি আপনাকে খোলসা করে দেখিয়ে দিচ্ছি। আশা করব আগামী লেখায় আপনি খানিক সতর্ক হবেন। এই বাউল-পটুয়ার গ্রাম্য ইউটোপিয়া ও বিদেশি সাহায্যপুষ্ট ভলান্টারি এজেন্সির সমাজসেবার 'দেশীয়' দেউলে ছকটা 'যোগসূত্র'র পাঠকের কাছে বিক্রি করার চেষ্টা করবেন না।

অনুরাধা, আপনার লেখা থেকে স্পষ্ট যে রাজনীতি তথা বামপন্থী রাজনীতি সম্পর্কে আপনার গভীর বিরাগ। শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আপনার মন্তব্য (পৃ. ২১) থেকে, এবং সামগ্রিকভাবে লেখাটার শুরু থেকে সেটা পরিষ্কার। এই তথাকথিত অরাজনৈতিকতার বেসাতি করতে গিয়ে আপনি গভীর গাড্ডায় চলে গেছেন। কয়েকটা উদাহরণ দিই। আমরা সবাই জানি যে আমাদের দেশে সাধারণ গরিব মানুষ খেতে পায় না। এই পোড়া দেশে যেখানে হাত-পা-বুদ্ধি যাদের অটুট, যারা পরিশ্রমবিমুখ নয়, তারাই যখন কর্মহীন, বুভুক্ষু, দুর্ভিক্ষপীড়িত, তখন মানসিক প্রতিবন্ধীরা সমাজে অবাঞ্ছিত ও অবহেলিত হবে এটা খুব স্বাভাবিক। এই প্রতিবন্ধীদের অসহায়ত্ব, কষ্ট ও বঞ্চনা নিয়ে আপনার মতো যারা লিটল ম্যাগাজিনে 'পচা' কবিতা করেন, তাঁদের এটা জেনে রাখা দরকার যে আমাদের সমাজের যাবতীয় অন্যায় ও বঞ্চনার কারণ হল শোষণ। এই ব্যাপারটার কোনও স্বীকৃতি লেখায় নেই। এক শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত সমাজেই একমাত্র মানসিক প্রতিবন্ধীদের সমস্যার যথার্থ সমাধান সম্ভব। অনুরাধা, আমি অভিযোগ করছি যে আপনি সমস্যাটার আসল জায়গাটা পাশ কাটিয়ে গেছেন। মানসিক প্রতিবন্ধী, লোকশিল্পীর অনাদর ও অবক্ষয়, মেয়েদের সমস্যা, বাস্তুহারা ও ছিন্নমূলদের সমস্যা, অর্থাৎ এই লেখাটিতে আপনি যে সমস্যাগুলি সম্পর্কে চিন্তিত ও পীড়িত বলে দাবি করেছেন এই সবকটির মূলে আছে শোষণ : একটি শ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর শোষণ। এই মারাত্মক জরুরি কথাটি একবারও না বলে আপনি অনর্থক, হাস্যকর কতকগুলি পচা কবিতা করেছেন। যেমন, মানসিক অসুস্থতা প্রসঙ্গে আপনি বলেছেন : 'উন্মাদ জগতের একটা ভাষা আছে··· ।··· তার স্বাভাবিক প্রকৃতিকে বুঝতে হবে। তার অস্ফুট ব্যঞ্জনাগুলি, তার উন্মেষের ইচ্ছা, তার ধ্বনিতরঙ্গ, শরীরছন্দকে যাতায়াতের পথ করে দিতে হবে।···যোদ্ধা, ভবঘুরে, সুফি, ফকিরদের, লোককারিগর-দের পথসন্ধান বলতে পারি। তাঁদের বলা পথ এই দিকেই।' (পৃ. ১৪) এর মানে

কি ? 'অস্ফুট ব্যঞ্জনা', 'ধ্বনিতরঙ্গ', 'শরীরছন্দ' এসব কবি-কবি ন্যাকামো করার অর্থ কি ? এবং আমি যতদূর জানি ভবঘুরে, সুফি, ফকির ও লোককারিগরদের তৈরি করা কোনও মানসিক অসুস্থতার ওষুধ নেই। মানসিক অসুস্থতার জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া কর্তব্য আর সমাজ থেকে মানসিক অসুস্থতা দূর করতে হলে সমাজ-বিপ্লব করতে হয়, রাজনীতি করতে হয়। যাদের সেটা করার সাহস, সামর্থ ও সাহস নেই তারা ন্যাকা-ন্যাকা, কবি-কবি, ভাবুক-ভাবুক কথা বলে মানুষকে ভুল বোঝায় আর নিজের কেউকেটা সেজে পয়সা করে, ধান্ধা করে আর কাগজে লেখা ছাপায়। অনুরাধা, আপনি কোন্ দলে ?

শহর / গ্রাম এবং প্রতিবন্ধী সমস্যা নিয়ে অনুরাধার বক্তব্য : 'আমরা তো আদিবাসী প্রবাহের উত্তরাধিকারী, তাই রক্তের ভিতর এসব মানুষের প্রতি ভালোবাসা বয়ে বেড়াই। শহরে কেউ কেউ এদের জন্য বেদনা অনুভব করে, কিন্তু শহরের সামাজিক নিয়ম মানুষকে রক্ষা করার, আশ্রয় দেবার স্থির অনুভব সঞ্চার করতে দেয় না মানুষের ভেতর। শুধু যন্ত্রণা বাড়ায়, শুধু বিচ্ছিন্ন করে।' (পৃ. ১৭)।

'আদিবাসী প্রবাহ' মানে কি তা একমাত্র অনুরাধাই জানেন। তিনি অথবা তাঁরা কারা ? সেটার একচেটিয়া অধিকার কী করে পেলেন, কে দিল, সেটাও অপরিষ্কার। পরের পঙক্তি দুটি আরো হাস্যকর। শহরে প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেকে বেদনা অনুভব করেন বটে (অনুরাধা অবশ্যই যাঁদের মধ্যে এক নম্বর) কিন্তু শহরে নাকি কি একটা 'সামাজিক নিয়ম' করে দেওয়া আছে (আমি বহু শহরে থেকেছি, এরকম কোনও নিয়মের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত নই) যার জন্য প্রতিবন্ধীদের কেউ আশ্রয় দেয় না ! তাহলে অনুরাধার মতে মানসিক প্রতিবন্ধীকতার আদর্শ সমাধান কোথায় ? অবশ্যই গ্রামে। অনুরাধার ভাষাতেই বলি : 'গ্রামে পাগল, ক্ষ্যাপা, অর্ধবুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা মা, ঠাকুমা, পিসিমার আশ্রয়ে থাকত।··· । তবু এতটা বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েনি। অপরিণত বুদ্ধির ছেলে-মেয়েদের বিয়েও হত। তাদের স্ত্রীরা অনেকটা বেশি স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা করত। এখন গ্রামও বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত।' (পৃ. ১৬)। অনুরাধার বিশ্লেষণ শক্তির অগভীরতা বিস্ময়কর। গ্রামে মানসিক প্রতিবন্ধীরা বিচ্ছিন্ন বা নিঃসঙ্গ নয়— এ যুক্তিও ধোঁপে টেকে না। আমি প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গবেষণাসূত্রেই গ্রামে গেছি, আমার অভিজ্ঞতাও এটা বলে না। অনুরাধা এই প্রতিবন্ধীদের ইন্টারভিউ করার চাকরিটা তিন মাস করেন। তিন মাসে তিনি মোট তিনটি ইন্টারভিউ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে তিনটিই শহরে। আমি নিজের চোখে সেই ইন্টারভিউগুলি দেখেছি। যদি কাজটাতে তিনি লেগে থাকতেন এবং আরেকটু পরিশ্রমী হতেন, তবে কয়েকদিন পরেই তাঁকে গ্রামেও পাঠানো হত। স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখলে তিনি এসব গ্রামসংক্রান্ত কল্পগল্প বলতেন না। অবশ্য তিনি বলছেন যে এখন গ্রামেও অবস্থাটা তত ভাল নয়। অবশ্য অনুরাধার

কথা অনুযায়ী অতীতে কোনও এক স্বর্ণযুগে গ্রামে প্রতিবন্ধীদের অবস্থার বেশ রমরমা ছিল। প্রতিবন্ধীদের বিয়ে-থা দিয়ে দেওয়া হত এবং তাদের স্ত্রীদের স্নেহ ভালোবাসায় গদগদ হয়ে থেকে তারা খুব সুখে জীবনযাপন করত। এখন প্রশ্ন হল যে তথ্য হিসাবে এটা কতটা সত্য? যদি ধরে নেওয়া যায় যে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে গ্রাম 'বিচ্ছিন্নতা ও অস্থিরতার আক্রান্ত' ছিল না, তবে সে সময়ে গ্রামীণ মানসিক প্রতিবন্ধীদের অবস্থা কেমনটা ছিল সেটা অনুরাধা কেমন করে জানলেন? এর স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ আছে? যদি আমি ঠিক এর উল্টোটা বলি, যদি বলি যে পঞ্চাশ বছর আগের থেকে গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থা আজ অনেক ভাল এবং তার ফলে গ্রামীণ প্রতিবন্ধী-দের বিশেষ চিকিৎসা তথা যত্ন পাওয়ার সুযোগ আজ অনেক বেশি, তবে অনুরাধা আমার যুক্তি খণ্ডন করবেন কীভাবে? অবশ্য অনুরাধা যুক্তির বিশেষ ধার ধারেন না। প্রতিবন্ধীদের বিয়ে সংক্রান্ত প্রসঙ্গ থেকে সেটা পরিষ্কার। প্রতিবন্ধীদের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের বিয়ে দেওয়াটা অতি অমানবিক ও অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার কাজ। গ্রাম্য সমাজে আরো বহু নিষ্ঠুরতা চালু ছিল (বহুবিবাহ, জাতপাতের বিচার, শোষণ ইত্যাদি)— এটাও তার মধ্যে একটা। আকাঁড়া উজবুক না হলে কেউ বলবেন না যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের ধপাধপ্ বিয়ে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হবে। বরঞ্চ উল্টোটাই। পয়সাওলা বাবা পাগল বা প্রতিবন্ধী ছেলের বিয়ে দিয়েছেন সুস্থ মেয়ের সঙ্গে (হয়তবা পাত্রী পক্ষের অজ্ঞতার সুযোগে)— এ আকছার হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার ফলাফল হয় বিষময়। অনুরাধা বাংলা সাহিত্যও খুব ভালভাবে পড়েন নি— এ ধরনের গল্প বিশ শতকের সাহিত্যে একাধিক আছে। যদি সাহিত্য সমাজের দলিল হয় তবে অনুরাধার বক্তব্য যে মানসিক প্রতিবন্ধীদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের প্রভূত স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে খুব সুখে রাখত— এটা নিছক মনগড়া একটা বাজে কথা। অনুরাধার এই বক্তব্যের ভিত্তি কি? তিনি কীভাবে জানলেন যে প্রতিবন্ধীদের স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের স্নেহভালবাসা দিয়ে ঢেকে রাখে? অবশ্য একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সেটা অত্যন্ত আনন্দজনক। অনুরাধা এই লেখাটিতে একাধিকবার তাঁর নিজের 'প্রেম', 'বিরহ' এসবের কথা বলেছেন। সেটা ইঙ্গিতবাহী। যদি অনুরাধা কোনও মানসিক প্রতিবন্ধীর প্রেমে পড়ে থাকেন এবং বর্তমানে প্রেমিকা ও পরে স্ত্রী হিসাবে 'অনেকটা বেশি স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে সম্পর্কটা স্বাভাবিক রাখতে চেষ্টা' করেন, তবে সে খুবই আনন্দের বিষয়। অনুরাধাকে আমার আগাম অভিনন্দন জানিয়ে রাখি।

ভাস্কর মুখোপাধ্যায়
৫২, রহিম ওস্তাগর রোড
কলকাতা-৪৫

২৫.৯.৯১

□

With best compliments from :

SHANKAR ENTERPRISE

Coal Suppliers

14 / 1, N. N. ROAD,

CALCUTTA-700028

মিহির চক্রবর্তী

খেলা ভাঙার খেলা

শ্রম ও সঙ্গীতের মতোই প্রাচীন এই গণিত— অর্থাৎ মানব অস্তিত্বের এবং সভ্যতার মাপকাঠিতে। অথচ শ্রমের অপরিহার্যতা স্পষ্ট, সঙ্গীতেরও। কিন্তু গণিত? এর যে এক ধরনের চূড়ান্ত বিমূর্ততা; যে বিমূর্ততা অন্য সমস্ত বিজ্ঞান থেকে গণিতকে স্বতন্ত্র করেছে কেন তা যুগ যুগ ধরে মানুষকে টেনেছে? খানিকটা সহজেই বোঝা যায় অরণ্য-পর্বতচারী চৈনিক পর্যবেক্ষকের অপার আনন্দ ও বিস্ময়কে যখন তিনি দেখেছিলেন একটি সুপারনোভাকে বিস্ফারিত হতে। সহজেই অনুমেয় এই আশ্চর্যদর্শীর কাছে বিবরণ শোনার পরে শ্রোতাদের কেউ কেউ পরবর্তী সমস্ত জীবন কেন কাটিয়ে দেবেন আর একটি বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করার আশায়। কিন্তু কেমনভাবে ব্যাখ্যা দেব যুগে যুগে কিছু কিছু মানুষ কেন তাঁদের গোটা জীবন কাটিয়ে দেবেন শুধু ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধটি প্রমাণিত করার প্রকল্প নিয়ে। স্বতঃসিদ্ধটির একটি পাঠ হল— একটি সরলরেখার বাইরের কোন বিন্দু থেকে ওই সরলরেখার সমান্তরাল করে ওই তলে একটিমাত্র সরলরেখাই থাকবে। এরকম একটি বক্তব্যকে ইউক্লিডের অন্যান্য স্বতঃসিদ্ধ থেকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণিত অথবা অপ্রমাণিত করার প্রকল্প গ্রহণের কি মূল্য থাকতে পারে ব্যক্তি জীবনে অথবা সমগ্র মানবজীবনে? অথচ ঘটেছে এমনটিই। অনেক সময় মনে হয় শ্রম বা সঙ্গীতের মতো বিমূর্তিকরণের (abstraction) দিকেও মানুষের টান স্বভাবজ। 'যে কেহ মোরে দিয়েছ দুঃখ দিয়েছ তাঁরি পরিচয়।' বিমূর্ততার দিকে অমোঘ আকর্ষণ এবং এই আকর্ষণজনিত দুঃখবোধ, যা ব্যক্তিমানুষকে অসম্ভব পীড়িত করতে পারে, তা মানব-জীবনের অস্তিত্বেরই পরিচয়। হয়ত বা অংশত।

বিমূর্তিকরণের পাল তুলেই তাহলে যাত্রা শুরু হোক আমাদের।

প্রথমত গণিতশাস্ত্রের বিষয়বস্তু কী? অর্থাৎ কাদের সম্পর্কে তার মাথাব্যথা? প্রায় তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে পারে যে কেউ— সংখ্যা জ্যামিতিক নক্সাগুলি বা এমনিতর অন্য কিছু। প্রশ্ন: এগুলির কি কোন বাস্তব অস্তিত্ব আছে? যে অর্থে একটি নক্ষত্রের বা তার গতিপথের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা হয়। আবার তৎক্ষণাৎ উত্তর আসবে— না। সংখ্যা, বিন্দু বা সরলরেখা অথবা বৃত্ত— এরা কোন বাস্তব জগতের অধিবাসী নয়

বরং মানুষেরই মনের সৃষ্টি এরা, অথবা এভাবে বলা হয়ত ঠিক যে গণিতবিদের মনের জগতের বাইরে কোথাও গণিতের কুশীলবদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু একথা এত সহজে স্বীকার করে নেবেন না সকলে। যেমন প্লেটো। প্লেটো বলবেন গণিতের অন্তর্গত ধারণাগুলির (concept) কোথাও একটি জগত আছে— যেমনটি আছে গ্রহ, নক্ষত্র অণু পরমাণুর জগত। এই জগতটি রয়েছে মানুষের মনের বাইরে— মানবমনের অস্তিত্ব নিরপেক্ষভাবে। বিজ্ঞানী যেমন তার মনসংযোগ করে এবং শ্রমস্বীকার করে জানার চেষ্টা করেন এবং কখনো কখনো জানতেও পারেন গ্রহনক্ষত্রের ধর্ম, গণিতজ্ঞও তেমনি চেষ্টা করেন গণিত-জগতের অধিবাসীদের ধর্ম আবিষ্কার করতে, যেমন তিনি হয়ত একদিন জানতে পারলেন যে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের উপর আঁকা বর্গক্ষেত্র, অন্য বাহুদুটির উপর আঁকা বর্গক্ষেত্রগুলির যোগফলের সমান। এটা তাঁর আবিষ্কার, অথবা দর্শন (observation-Hardy), কিন্তু মনের সৃষ্টি নয়। গণিতবিদ কোনদিন আবিষ্কার না করলেও এই সত্য অপরিবর্তিত থেকে যাবে। সত্য আমাদের মনের বাইরে থাকে। আমি কখনো তা জানতে সক্ষম হলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। গণিতের সত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। অন্য মতটির দিকে আবার একটু ফেরা যাক ; অর্থাৎ যে মত একথা মনে করে যে গণিতের জগত সম্পূর্ণভাবেই মানুষের সৃজন। অ্যারিস্টটল, ক্যান্ট এবং হালের ইনটুইশনিস্টদেরও মোটামুটিভাবে এই দলভুক্ত করা যেতে পারে। আমরা যেমন একটি উলের সুতো নিয়ে আপন মনে খেলা করি, এবং খেলার ছলে নানা ধরনের প্যাটার্ন ফুটিয়ে তুলি, গাণিতিক ক্রিয়াও আসলে তেমনি এক খেলা। গণিতের খেলায় যে মাতে সে প্রথমে ছোট ছোট প্যাটার্ন বানিয়ে নেয় তার ইচ্ছে মতো, এগুলি হল মূল concept, যে গুলি নিয়ে আবার গেঁথে গেঁথে (অবশ্যই সুচারুভাবে) তৈরি হবে আরো অনেক প্যাটার্ন অথবা গণিতের অবয়ব। এই অবয়ব সম্পূর্ণই গড়ে তোলা, এবং এই গড়ে তোলার আগে পর্যন্ত কোন অস্তিত্বই তার ছিল না। গণিতের কারিগরের মনের বাইরে আছে এমন কোন কিছুর ছায়া বা প্রতিরূপ যদি এই অবয়বে এসে ধরা পড়ে যায় তা হবে একান্তই বাড়তি পাওনা।

প্রথমোক্ত মতে গণিতবিদের ভূমিকা হচ্ছে, আবিষ্কারকের আর দ্বিতীয় মতানুযায়ী তা হল কারিগর বা শিল্পীর। গণিতের আবিষ্কারক আর গণিতের কারিগর। কিন্তু দু'দলের কোন দলই মনে করে না যে গণিতের মূল ধারণাগুলি, যেমন সংখ্যা, জ্যামিতিক চিত্রমালা অথবা সেট, বাস্তব জগতে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে। একদল বলছেন যে এদের জগত বাস্তব জগত নয়, এরা আছে তবে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে। 'The 'creation' of a consistent coherent concept in the human mind is actually the uncovering or discovering of a permanently and independently existing real abstract idea'. আর একদল বলছেন সে জগত কোথাও নেই। গণিতের ছাত্রকে আপন হৃদয় ও মননের পলিমাটি দিয়ে একটু একটু করে তা গড়ে তুলতে হবে।

ব্যবহার যোগ্যতার কথা এসে পড়ে এই প্রসঙ্গে। গণিত তো ব্যবহৃত হয়ে আসছে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বাণিজ্যে সেই উষাকাল থেকেই। বর্তমানে সেই ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়েছে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানেও— বস্তুত কোথায় নয়। থিওরিটিকাল ফিজিক্স-এর গবেষণা প্রবন্ধগুলি আজকাল এমন চেহারা নিচ্ছে যে সেগুলিকে পদার্থবিদ্যা বলে চেনাই যায় না বরং মনে হয় গণিতের কাছাকাছি কিছু একটা। আর সমাজবিজ্ঞানেও গণিতের ব্যবহার এত বেড়েছে যে জাতে ওঠার তাগিদে কোনো কোনো গবেষক তাঁদের প্রবন্ধে প্রয়োজনহীন গণিতচর্চাও করে থাকেন। ব্যাপারটাকে ঠাট্টা করে বলা হয় এইভাবে, 'একটু এপসিলনডেল্টার নৈবেদ্য ছিটিয়ে দিলুম আর কি।' প্রায় মধ্যযুগে ক্যালকুলাস আবিষ্কার বা সৃষ্টির পরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং মেকানিক্স-এ একের পরে এক দিগন্ত খুলে যেতে থাকে। গণিতের এই তত্ত্বটির বিপুল ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছেন অনেকেই আপাত অবিশ্বাস্য এই তত্ত্ব কেন যে ম্যাজিকের মতো কাজ করছে গণিতজগতের বাইরে! গ্রুপ থিওরির মতো চূড়ান্ত বিমূর্ত তত্ত্ব তো ফিজিক্স থেকে সমাজবিজ্ঞান সর্বত্রই আসন পেতেছে আজকে। ইউক্লিডির জ্যামিতির কথা ছেড়েই দিলাম, অ-ইউক্লিডিয় জ্যামিতিও ব্যবহৃত হয়ে গেল মহাবিশ্বের গঠন বিশ্লেষণে, গাণিতিক লজিক প্রতি পদপাতেই প্রয়োজন হচ্ছে কম্প্যুটার-এর প্রজন্ম সৃষ্টির কাজে। এছাড়াও গণিতের যুক্তিপরম্পরা সাজানোর পদ্ধতি (axiomatic-deductive method) এমন শক্তিশালী এবং সুচারু মনে হয়েছিল যে সমস্ত বিষয়ের, এমন কি নন্দনতত্ত্ব (Ethics-Spinoza)-এর উপস্থাপনাও করা হতে লাগল এই প্রথা মতো। মনে হল, প্রকৃতি, সমাজধর্ম বা মানবমনের গভীরের যে কোন তত্ত্বের যথাযথ উপস্থাপনার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় গাণিতিক আরোহী (deductive) পদ্ধতি। তবে কি ব্যবহার যোগ্যতাই মাপকাঠি? গণিতের কোন ধারণা বা তত্ত্বের সাফল্য কি নির্ভর করবে তা কি পরিমানে অন্য ক্ষেত্রে কাজে আসে তার উপরে? মনে রাখা দরকার গণিতকে, এই সু-সেবিকার ভূমিকা পালনের জন্যই, বরণ করা হয়েছে বিজ্ঞানের 'রানী' বলে। এই অসামান্য সাফল্যের পরেও কিন্তু মন মানেনি। গত শতকের শেষভাগ থেকে ক্রমে ক্রমে গণিত নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে কোলাহল থেকে। ঢেলে সাজিয়েছে নিজেকে; দাঁড়ানোর জমি পরীক্ষা করেছে বারবার, কখনো কখনো মুগ্ধ হয়ে থেকেছে নিজের রূপে। হার্ডির সোচ্চার ক্ষমা প্রার্থনা— আমি জীবনভর কখনো এমন কোন ফসল ফলাইনি যা কাজে লাগছে বা ভবিষ্যতে লাগতে পারে— এই বাক্যের মধ্যেই অন্যত্র ব্যবহারযোগ্যতার প্রশ্নটি সম্পর্কে এই শতকের গোড়ার দিকে যে মনোভাব প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণ বলা হয়ে গেছে। Synge ১৯৪৪-এ লিখেছেন— বিজ্ঞান এক অভূতপূর্ব উত্তেজনার মধ্য দিয়ে চলেছে আজকে। শুধু এতদিনকার অতন্দ্র প্রহরীটি আর নেই। সে কিন্তু নিদ্রামগ্ন নয়, আগের মতোই পরিশ্রম করে চলেছে সে, কিন্তু তা সে করছে কেবল নিজেরই জন্য। প্রহরীটি গণিত। গণিত অর্থাৎ বিশুদ্ধ গণিত-চর্চা যাঁরা করছেন, আজও পর্যন্ত তাঁরা মূলত এই প্রবণতারই ধারাবহনকারী।

কেন এমন হল ? আমার মনে হয় গণিতের ভিতরে এবং বাইরে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যার ফলেই এই আত্মমগ্নতার কাল সূচিত হয়। বাইরের কারণটিই প্রথমে ধরা যাক।

ক্যাপিটালিজমের হাতে হাত মিলিয়েই মানুষের জীবনে হাজির হয়েছিল specialisation। তার আগে যাঁরা জ্ঞানের পথের পথিক হতেন তাঁরা এক সমগ্রতার সন্ধান করেছেন, বিজ্ঞান-শিল্প-গণিত-দর্শন মিলেমিশে যেত তাঁদের কাজের ধারায়। এইসব 'জ্ঞানী'দের কাছে সমাজের চাহিদাও ছিল অনুরূপ। এটা ঠিক নয় যে জ্ঞানের পরিধির অসামান্য বিস্তৃতিলাভ এবং একজন ব্যক্তিমানুষের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার জন্যই সেই সমগ্রতার অনুসন্ধান আর কোন একক 'জ্ঞানী' ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা খুবই আংশিক সত্য। আসলে সমাজের কোথাও নতুন গড়ে ওঠা ক্ষমতা-কেন্দ্র চেয়েছে সমস্ত স্তরের কর্মবিভাজন, প্রত্যেক কর্মরত ব্যক্তিকে তার উদ্যোগের সীমা বেঁধে দিতে চেয়েছে এবং চেয়েছে সেই সীমারেখার মধ্যেই ব্যক্তিটি উত্তরোত্তর পারদর্শী হয়ে উঠুক আর সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই তৃপ্ত থাকতে শিখুক। সমগ্রতার দায় বহন করবে সেই চূড়ান্ত ক্ষমতার কেন্দ্রটি, যদি সে দায় আদৌ কাউকে বহন করতে হয়। এই কেন্দ্রনির্ভর ব্যবস্থাপনা ইতিহাসের একটি স্তরে সমাজ-বিকাশে একটা উল্লম্ফন এনে দিয়েছিল, ঘুচে গিয়েছে সামন্ততান্ত্রিক শিথিলতা। টানটান হয়ে পড়ছিল সমাজের শিরা-উপশিরা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝে বা না বুঝে তার নিজস্ব গণ্ডীটি খুঁজে নিতে হচ্ছিল এবং এটাই তার সত্বা (identity) বলে চিহ্নিত হচ্ছিল সমাজ দেহে। এই গণ্ডী খুঁজে নেওয়ার ছুটোছুটিকেই মনে হয়েছিল ব্যক্তির স্বাধীনতা। পরবর্তীকালে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার দর্শনেও মূলত এই প্যারাডাইমই গৃহীত হয়েছে। একটি বাড়তি সংযোজন হয়েছে তাতে। তা হল ব্যক্তিকে আর গণ্ডীটাও খুঁজে নিতে হবে না— আর এটাকেই বলা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা। ব্যক্তিমানুষের আগল খুলে যাবার যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছিল তার সাথে শক্তিশালী কেন্দ্র-নির্ভর সুবৃহৎ ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ তত্ত্ব হিসেবেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বস্তুত এই দর্শন তখন সাধারণভাবে সমর্থিত হয় এবং গণিতের কর্মীদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যেমন শ্রমের ক্ষেত্রে পাশের খোপের শ্রমের প্রতি অনাসক্তিই কাম্য হয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি গণিতের কর্মীরা ক্রমে অন্য বিভাগের ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কে উদাসীন হতে থেকেছেন। তার ফলে ক্রমে একটি বিভাজনের বেড়াও গজিয়ে উঠেছে সীমান্তে, যে সীমান্ত ইতিপূর্বে কোনকালেও সেভাবে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি।

এবারে আমরা এই আত্মবিচ্ছিন্নতার কারণ খুঁজব গণিতের নিজেরই অভ্যন্তরে। সতেরো, আঠারো এবং উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের অন্য সমস্ত বিভাগের মতোই গণিতের জগতেও অপর্যাপ্ত উৎপাদন হয়েছে। এই উৎপাদন খানিকটা কাঁচামাল উৎপাদনের মতো যার মূল ব্যবহারকারী নব্যবিজ্ঞান। আগেই উল্লেখ করেছি এমন

সুন্দরভাবে কাজে লেগে যাচ্ছিল সেই কাঁচামাল যে তার অন্তর্নিহিত বিভ্রান্তি নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসতই পাওয়া যায়নি তখন। বিজ্ঞানের রমরমা বাজারের মুখ্য জোগানদার গণিতের তখন বড়ই সময়ের অভাব নিজের পায়ের তলার মাটির দিকে নজর দেবার। কিন্তু সে মাটিও তখন ক্ষয়ে যাচ্ছে।

গণিতজ্ঞদের মনে হতে লাগল যে concept-গুলি নিয়ে তাঁরা কথা বলে আসছেন সেগুলি যেন অস্বচ্ছ যেমন ক্যালকুলাসের limit, অথবা complex numbers অথবা irrational numbers এমনকি পূর্ণ সংখ্যার ধারণাও। তাছাড়া যেভাবে এই ধারণাগুলির উপরে ভিত্তি করে করে গণিতের শরীরে সংযোজন হয়ে চলেছে তার যেন তেমন একটা যুক্তিনির্ভরতা নেই। এই সন্দেহের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে অ-ইউক্লিডিয় জ্যামিতি প্রস্তাবিত হবার সাথে সাথে। এই প্রস্তাবনার পরে একথা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছিল যে এতদিনের পরিচিত ইউক্লিড-প্রবর্তিত জ্যামিতি যার সত্যতা সম্পর্কে বিতর্ক ছিল না, যার ব্যবহারে কোথাও কোন অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়নি, তার মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে খুঁত থেকে গেছে। তাই সূচনা হল এমন একটি পর্যায়ের যখন গণিত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করল তার নিজের শরীরকে। সে তার ধারণাগুলির (concept) অস্পষ্টতাকে দূর করে সুনিপুণ কথায় সুনির্দিষ্ট করে তুলতে লাগল তাদের। ধারণাগুলির এলোমেলো তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যে (ad-hoc) ব্যবহারের পরিবর্তে তাদের মূল গুণাবলী এবং মূল আন্তঃসম্পর্কগুলি স্বতঃসিদ্ধ বলে ঘোষিত করার কথা বলা হল। এবং তার পরে একে একে অন্য গুণাবলী এবং আন্তঃসম্পর্কগুলি যুক্তি-প্রয়োগে, সন্তর্পণে প্রমাণ করে যাবার কথা বলা হল। সন্তর্পণে, কারণ এমন কোন কিছু যেন প্রমাণের সময় ব্যবহার না করা হয়ে যায় যা স্বতঃসিদ্ধগুলির বাইরে থেকে নেওয়া। এই পদ্ধতিকে বলা হয়ে থাকে অবরোহী পদ্ধতি (deductive method)। এই পদ্ধতির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল তীক্ষ্ম অনুশাসন মেনে চলা অথবা rigor।

এই পর্ব গণিতের সামগ্রিক আত্মসমীক্ষা এবং অনেক ক্ষেত্রে ঢেলে সাজানোর পর্ব। এমন কোন সিরিয়াস গণিতবিদ ছিলেন না যিনি এই আত্মসমীক্ষায় অংশ নেননি। এবং এসময় বড় বেদনার সময়, বাইরের জগতের দিকে তাকানো নিশ্চয়ই সম্ভব এই পর্যায়ে, কিন্তু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করা যায় না। গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ তো মানবিক ক্রিয়া-কলাপেরই অঙ্গ।

আত্মসমীক্ষণের পথ ধরেই এই শতকের গোড়ার দিকে এসে পেঁছন গেল এক সংকটময় সন্ধিক্ষণে। এ এমনই এক সংকট যে এর থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে পাবার আশাও নির্মূল হতে চলল। একের পর এক বিধ্বংসী ঢেউ এসে আঘাত করল তিন হাজার বছর ধরে গড়ে তোলা সৌধের ভিত্তিভূমিকে।

প্রথম আঘাত এল প্যারাডক্সগুলি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। রাসেল আবিষ্কৃত প্যারাডক্সটি নিয়ে এখানে একটু আলোচনা করব। কিছু বস্তুর সমষ্টিকে বলা হয় সেট।

যেমন পৃথিবীর অধিবাসী সমস্ত মানুষের সমষ্টি। প্রতিটি মানুষ এই সেটের উপাদান (element)। মনে করা যাক S হল সমস্ত রকম সেট-এর সমষ্টি। তাহলে S তার নিজেরই অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ S নিজেরই অন্যতম উপাদান। এই জাতীয় গোলমেলে সেটগুলি বাদ দেওয়া যাক। বেশিরভাগ সেটই তার নিজের অন্তর্ভুক্ত নয়। এদের বলা হয় সাধারণ (ordinary) সেট। যেমন সমস্ত মানুষের সেটটি একজন মানুষ নয়। এখন মনে করা যাক N হচ্ছে সেইসব সেটের সমষ্টি যারা নিজের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ N-এর উপাদান হল একটি সাধারণ সেট। এই নবগঠিত সেট N-কে নিয়ে সমস্যা। N নিজের অন্তর্ভুক্ত কি না। একটু চিন্তা করলেই সমস্যাটি বোঝা যাবে। N-কে যদি নিজের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয় তাহলে দেখানো যাবে N নিজের অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার উল্টোদিকে N যদি নিজের অন্তর্ভুক্ত না হয় তাহলে দেখানো যাবে যে N নিজের অন্তর্ভুক্ত।

Cantor-এর সেটতত্ত্ব সেই সময়ে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছিল এবং এই প্রতিষ্ঠা এমনই যে আজকের গণিতের যে কোন বিভাগই এই তত্ত্বের ভাষা ও ভিত্তির উপরে গড়ে তোলা হয়। কিন্তু উপরিউক্ত প্যারাডক্সের কোন সমাধান যদি না হয় তাহলে তো সেটতত্ত্ব সম্পর্কেই প্রশ্ন জাগে, প্রশ্ন জাগে তার যুক্তিগ্রাহ্যতা সম্পর্কে।

এরকম আরো বেশ কিছু প্যারাডক্স অত্যন্ত অস্বস্তিকর ছায়া ফেলে বিরাজ করতে লাগল গণিতের পরিমণ্ডলে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এল গণিতের মধ্যেকার সম্ভাব্য স্ববিরোধিতা নিয়ে। আজ যা আমি গাণিতিক সত্য বলে জানছি, কি স্থিরতা আছে যে ভবিষ্যতে তা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে না। প্রকৃতি বিজ্ঞান বা অন্যান্য ক্ষেত্রে তো এমন ঘটেই থাকে। কিন্তু গণিতের সত্যগুলি যেহেতু যুক্তিনির্ভর, তথ্যনির্ভর নয়, এমনই আশা করা স্বাভাবিক যে যুক্তি ঠিক থাকলে সত্যগুলি অপরিবর্তিত থাকবে। রাসেলের প্যারাডক্সে তো দেখা গেল N সেটটি নিজের অন্তর্গত এটি সত্য হলে যুক্তি প্রমাণ করছে যে N সেটটি নিজের অন্তর্গত নয়। এমন ঘটনা যদি জ্যামিতির ক্ষেত্রেও ঘটে, যদি কখনো আবিষ্কৃত হয় যে কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি ১৮০° থেকে কম অথবা বেশি? আমরা তো আজকে জানি যে ত্রিভুজের কোণ তিনটি যোগ করলে ১৮০° হবে। কোনো তত্ত্বের মধ্যে এই জাতীয় স্ববিরোধ তৈরি হলে স্বাভাবিকভাবেই তত্ত্বটি অর্থহীন হয়ে যায় প্রয়োগের দিক থেকে এবং তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য (balance) ও সৌন্দর্য (elegance) বিনষ্ট হয়। আবারও বলা যায় সমস্ত মহান গণিতবিদই এই সম্ভাব্য স্ববিরোধিতার প্রশ্নটি নিয়ে ভেবেছেন এই শতাব্দীর শুরুর দিকে। অবশ্য গণিতের জগতে নতুন নতুন তত্ত্বের আবির্ভাব বন্ধ থাকেনি এ কারণে। যাঁরা গণিতের তত্ত্ব তৈরি করছিলেন তাঁরা এই ঝুঁকি নিয়েই কাজ করে যাচ্ছিলেন যে স্ববিরোধ হঠাৎ দেখা দিতেই পারে এবং তাহলে সমস্ত প্রাসাদটাই ধসে পড়বে। তবুও Hilbert-এর মতো মহীরুহ ব্যক্তিত্ব এই আশা পোষণ করছিলেন যে অবশ্যই একদিন গণিতকে সম্পূর্ণভাবে স্ববিরোধমুক্ত বলে প্রমাণ করা

যাবে। কিন্তু চরম আঘাতটি হানলেন Gödel। তিনি প্রমাণ করে দিলেন একথা কখনোই প্রমাণ অথবা অপ্রমাণ করা যাবে না যে সংখ্যাতত্ত্ব (Number Theory) স্ববিরোধমুক্ত। আঘাতটি চরম, কারণ সংখ্যাতত্ত্ব প্রায় সমস্ত গণিতেরই গোড়ায়। এই তত্ত্বই যদি স্ববিরোধমুক্ত বলে নিশ্চিত না হওয়া যায় তাহলে তার উপর ভর দিয়ে গণিতের যে সমস্ত শাখাগুলি দাঁড়িয়ে আছে তাদের কি গতি হবে ?

তৃতীয় আঘাতটি এল 'প্রমাণ' এই ধারণাটিকেই যখন সন্দেহের চোখে দেখা শুরু হয়ে গেল। গাণিতিক প্রমাণ পদ্ধতি, যা শতাব্দীব্যাপী গৃহীত হয়ে এসেছে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তর্কাতীত বলে, তাকেও দাঁড়াতে হল কাঠগড়ায়। তাকে প্রশ্ন করা হল কয়েকটি দিক থেকে। যে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) সমস্ত প্রমাণের ভিত্তি হিসেবে চলে এসেছে, পুনর্বিন্যাসের পর্যায়ে যে ন্যায়শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ rigor-এর উপর দাঁড় করানো হয়েছে বলে বিশ্বাস জেগেছিল, এখন সেই ন্যায়শাস্ত্রের অনেক সূত্রই আক্রান্ত হল ; যেমন ইনটুইশনিস্টরা আপত্তি করলেন — — p → p সূত্রটিতে। এর অর্থ হচ্ছে কোনো বাক্যের অস্বীকৃতিকে অস্বীকার করলে বাক্যটিকে স্বীকার করা হয়। (প্রসঙ্গতঃ মার্কসবাদ অনুসারে নেগেশন অফ্ নেগেশন থেকে ঠিক স্থূলে ফিরে আসা হয় না)। ইনটুইশনিস্টদের আপত্তির কারণের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এখানে সম্ভব নয়, কিন্তু এই সূত্রের সত্যতা অস্বীকার করলে বর্তমানকালে প্রচলিত গণিতের অনেক প্রমাণিত সিদ্ধান্তই অগ্রাহ্য হয়ে যায় ; Cantor-এর তৈরি স্বর্গের বেশ কিছু অংশই ভেঙে পড়ে। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে এসে পড়ল গণিতের দর্শনের ontology সংক্রান্ত প্রশ্নটি। 'যে কোনো বহুঘাত সমীকরণের (polynomial equation) অন্তত একটি বীজ আছে', এই কথা থেকে কি বুঝি আমরা। এই 'আছে' বললে কি আমরা অন্তত একটি বীজ প্রকৃতই বার করার কথা বুঝব না কি অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেই চলবে ?

'প্রমাণ'-এর বিরুদ্ধে আর একটি মূল আক্রমণ এল Axiom of Choice-এর মতো কয়েকটি নীতিকে কেন্দ্র করে। এই নীতি জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে গাণিতিক প্রমাণ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে এবং কেউ সন্দেহ করেনি ইতিপূর্বে। রাসেল যেভাবে ব্যাপারটিকে সহজ করে বলতে চেয়েছেন সেভাবেই বলি। মনে করা যাক কয়েক জোড়া মোজা রয়েছে। প্রত্যেক জোড়া থেকে একটি করে নিয়ে তৈরি একটি মোজার সেট-এর অস্তিত্ব কি সম্ভব ? উত্তর হবে অবশ্যই সম্ভব। এটি এতই স্বাভাবিক কথা যে এর কোনো প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না। তাই এই সূত্রটিকে স্বতঃসিদ্ধ বা axiom বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু যদি একটি রোবট-কে বলা হয় ওই সেটটি তৈরি করে দিতে সে কী করবে ? সে প্রত্যেক সেটের কাছে যাবে এবং তার পরে ? দুটি একই রকম (মোজার যেহেতু ডান, বাঁ নেই) মোজার থেকে কোনটি সে নেবে ? রোবটের পক্ষে তো স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। সে অপেক্ষা করবে পরিচালকের পরবর্তী নির্দেশের

জন্য, কোনটি নেব ? পরিচালকের সমস্যা হল তিনি কোনোভাবেই মোজাগুলোকে চিহ্নিত করে রাখেননি— তাই তাঁর পক্ষেও আর কিছু নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ জুতোর জোড়া হলে তিনি সহজেই বলতে পারতেন বাঁ জুতোটি নাও অথবা ডান জুতোটি। অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে, নির্বাচন করতে গেলেই, শুধুমাত্র নির্বাচনের সেটটি দিলেই চলবে না, নির্বাচনের পদ্ধতিও বলতে হবে। Axiom of choice নির্বাচনের পদ্ধতির কথা না বলেই নির্বাচনের সম্ভাব্যতার কথা বলে। আসলে সে ধরেই নেয় নির্বাচনের পদ্ধতি স্থির করা সবসময়েই সম্ভব হবে।

আপত্তিটা উঠল এইখানে। যাঁরা গণিতের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা জানেন এই নীতির কি বিপুল প্রয়োগ করা হয় গণিতের প্রমাণগুলিতে। এই নীতিটিকে শুধু সন্দেহ করেই পর্বটি শেষ হল না, দেখা গেল যে axiom of choice-এর অস্বীকৃতি (negation)-কে গ্রহণ করে এগোলেও কোনো স্ববিরোধ সৃষ্টি হয় না। ঠিক যেমন ইউক্লিডের পঞ্চম স্বতঃসিদ্ধটি অস্বীকার করলেও কোনো স্ববিরোধ হয় না, একটি অন্য জ্যামিতির সৃষ্টি হয় মাত্র। তার অর্থ দাঁড়াল এমন একটি সুন্দর সেট তত্ত্ব তৈরি করা যায় যাতে axiom of choice অস্বীকৃত। Axiom of choice-এর মতোই আর একটি বিতর্কিত নীতি হল Continumm Hypothesis। একইরকমভাবে, একে যদিও এতদিন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, দেখা গেল এর অস্বীকৃতিও কোনো স্ববিরোধের জন্ম দেয় না।

একের পরে এক এই ধরনের যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলির পরে গণিতের পক্ষে আর এক সামঞ্জস্যমণ্ডিত, অদ্বিতীয় এবং পরম অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজমান থাকা সম্ভব রইল না। এক অর্থে এ হল মর্যাদার আসন থেকে চ্যুতি। আবার আর একদিক থেকে দেখলে এ হল বন্ধন মুক্তি।

এই শতকে এখন আমরা এমন একটা পর্যায়ের মধ্য দিয়ে চলেছি যখন ভাবনার ধারা বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর পথে বইয়ে দেওয়া সম্ভব। মাথার উপরে কোনো কর্তৃত্ব (authority) নেই। কর্তৃত্ব অর্থে অবশ্যই ব্যক্তিকর্তৃত্ব নয়। গণিতের কোনো ভিত্তিই আজ সংশয়াতীত নয়— এই অর্থে গণিত এখন হতে পারে একটু কর্তৃত্ব মুক্ত এবং তার ফলে খানিকটা নিয়ন্ত্রণহীনও। কেউ কেউ গাণিতিক স্বজ্ঞার (intuition) কথা আবার তুললেও, কোনো মানেই হয় না তাকেই শেষ কর্তৃত্ব বলে স্বীকার করবার। Intuition-এর সমস্যাবলী থেকেই rigoer-এ পদার্পণ করেছিলাম আমরা। Lakatos এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছেন এইভাবে— 'why then don't we stop earlier, why not say that the ultimate test whether a method is admissible in arithmetic must of course be whether it is intuitively convincing'.

Intuition শুধু গণিত কেন সমস্ত বিজ্ঞানকর্মের মধ্যেই কাজ করে যায়, কিন্তু তা কখনোই নির্ধারক হতে পারে না। অতএব 'প্রমাণে' আমাদের আসতেই হয়। 'Proof is an idol before whom a mathematician tortures himself'—

Eddington-এর এই কথা গণিতের পক্ষে অস্বীকার করা বোধহয় অসম্ভব।

সেট তত্ত্বকে ভিত্তি হিসেবে ধরতে গেলে প্রশ্ন ওঠে কোন সেটতত্ত্ব— Axiom of choice স্বীকার করে না অস্বীকার করে, Continumm Hypothesis স্বীকার করে না অস্বীকার করে? ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠবে, যে কোন সেটতত্ত্ব নিয়েই শুরু করি না কেন, সেই তত্ত্ব কি স্ববিরোধের দূষণ-মুক্ত? এর উত্তর হল আমরা জানি না। এখনো কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা হয়নি, তবে আশংকা থেকেই যাচ্ছে। এখনকার দিনে গণিতের মূল ধারা এই সেটতত্ত্বকে ভিত্তি করেই চলেছে। এখানে আমার একটি অস্পষ্ট ধারণার উল্লেখ করি। প্রথম দিকে বিরোধিতা পেলেও বর্তমানকালে সেট তত্ত্ব establishment-এর অত্যন্ত প্রিয় তত্ত্ব। এই তত্ত্বের অদ্ভুত ক্ষমতা ও নৈপুণ্যের কথা ছাড়াও দর্শনের দিক থেকেও বর্তমান পৃথিবীর ক্ষমতা কেন্দ্রগুলি এই তত্ত্বকে আদরণীয় মনে করে। যে কোনো গণিতের তত্ত্ব বর্তমানকালে শুরু করা হয় এইভাবে:

একটি সেট নেওয়া হল, যে সেটটি কিছু উপাদান বা element-এর সমষ্টি।

এবারে এই সেটের element-গুলির উপরে একে একে কিছু প্রাথমিক গুণ আরোপিত করা হল, এতে সেটটিও সামগ্রিকভাবে গুণান্বিত হল।

এরপরে মনে করা হল এই গুণারোপিত সেটটি একটি অভিনব ও রহস্যাবৃত বস্তু (object)। এবং সেই সেটটির অন্যান্য গুণাবলী লজিকের নিয়ম মেনে খুঁজে খুঁজে ক্রম অনুসারে theorem হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হতে লাগল।

ভাবনার এই সূত্র অনুসরণ করলে উপাদান (element) গুলির সেট নিরপেক্ষ অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব। Element-গুলি প্রাথমিক। সমগ্র সেটটির অস্তিত্ব তার পরে। ঠিক যেমনটি আজকাল ভাবা হয় সমাজের ক্ষেত্রেও। সমাজ একটি জনসমষ্টি যার উপাদান ব্যক্তিমানুষ। বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত এই ব্যক্তিমানুষ, এর ফলে সমাজের শরীরে গুণ বিকশিত হয়ে ওঠে, যেমন সমাজটি ধনতান্ত্রিক হয় বা সমাজতান্ত্রিক হয় ইত্যাদি। যে মূল গুণাবলী নিয়ে শুরু করা হয়েছিল তারাই সমস্ত গাণিতিক তত্ত্বটির ক্ষমতাকেন্দ্র, পরবর্তী সময়ে আবিষ্কৃত গুণাবলী, সেই মূল কেন্দ্রেরই ফলশ্রুতি। ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক সমাজ (রাষ্ট্র)—ধারণাতেও কতকগুলি মূল আন্তঃসম্পর্ক ব্যক্তিমানুষের মধ্যে স্বীকৃত হয়। এই আন্তঃসম্পর্কগুলি অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন। এগুলিতে পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলা হয় একটি অন্য সমাজ (রাষ্ট্র)। সমাজের এই ধারণার সঙ্গে বর্তমানকালের গণিত তত্ত্বের যে সাদৃশ্যের কথা আমার মনে আসে তা হল, ব্যক্তিকে প্রাথমিক উপাদান হিসেবে দেখা, ব্যক্তির মধ্যেকার আন্তঃসম্পর্ক দিয়ে সমাজের গুণ নির্ধারণের ধারণা এবং শক্তিশালী কেন্দ্রের ধারণার মধ্যে।

মূল কথায় ফিরে আসি। সেট তত্ত্বকে ভিত্তি হিসাবে মেনে নেবার সমস্যাগুলি কিছুটা বলা হল।

এবারে লজিক। আমরা দেখেছি যে লজিককে নিয়ে অর্থাৎ গণিতের প্রমাণ পদ্ধতি

নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা কতটা গভীর। যে প্রামাণ্যতার দেবতার সামনে গণিতবিদ নিজেকে নিগৃহীত করতে থাকেন, সেই দেবতার বেদীতেই ফাটল দেখা গেছে। কিছু কিছু প্রমাণিত সত্য intuitively সত্য বলে প্রতিভাত হচ্ছে না, এবং কিছু কিছু intuitively সত্য বিষয় গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনটাই করা যাচ্ছে না।

তাই কোন idol নেই আর আজকে। প্রকৃতপক্ষে গণিতকে একটিই স্রোতস্বিনী বলা বোধহয় আর সম্ভব নয়, এখন সে বহুধাবিভক্ত। Kline বলছেন এইভাবে: "The major fact that emerges from the several conflicting approaches to mathematics is that there is no one body of mathematics but many.' Von Neumann লক্ষণটি দেখে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন ১৯৪৭-এ— 'there is a danger that the subject will develop along the time of least resistance, that the stream so far from its source will seperate into a multitude of insignificant branches.' Von Neumann অবশ্য প্রতিকার হিসেবে গণিতকে তার উৎসে অর্থাৎ 'প্রকৃতিতে' ফিরতে বলেছেন!

Von Neumann-এর মতো মনীষা ঠিকই দেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর আশঙ্কার মূল কারণটি খুঁজতে গিয়ে অন্য একটি কথা উত্থাপন করা হয়ত অযৌক্তিক হবে না। ভাল এবং মন্দ, গুরুত্বপূর্ণ এবং অগভীর, সমস্ত ধরনের ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই মানুষ জীবন কাটায়। অগভীর, কম তাৎপর্যপূর্ণ বা তাৎপর্যহীন গবেষণার কাজ কেউ করে সাধারণত তখনই যখন কোন একটা বাইরের চাপ তার উপর ক্রিয়াশীল থাকে (Publish or perish)। এই চাপটা আসে শেষ বিচারে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে। গবেষণাকর্মীর দায়বদ্ধতা মূলত নিজের কাছে ও বিষয়ের কাছে। তার বাইরে, দ্বিতীয় স্তরে ঠিক দায়বদ্ধতা নয়, একটা প্রশংসিত হবার বা স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছে গবেষকের মধ্যে অবশ্যই কাজ করে। তার Community, রসিকজন বলছে বাঃ বেশ তো হয়েছে। এটা এখনকার পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে মূলগত ভাবেই ভিন্ন। প্রথমটিতে একান্ত আনন্দ, আর দ্বিতীয়টিতে সোচ্চার ঘোষণা। প্রথমটিতে শুধুই appreciation আছে, দ্বিতীয়টিতে appreciation হয়ত থাকে, কিন্তু সেইসঙ্গে থাকে একটি authority। এই প্রক্রিয়া গবেষকের মধ্যেও অহংবোধের জন্ম দেয় এবং একটা পর্যায়ে authority গবেষককে তার অংশভুক্ত করে ফেলে। তাই যে যেমন খুশি এবং যখন খুশি ভাবতে আর বলতে পারার পরিবেশই গবেষণা, বা সৃষ্টিধর্মী যে কোন কাজের পূর্বশর্ত। ধরেই নেওয়া যেতে পারে এইসব কর্মপ্রকল্পের নব্বই শতাংশই হবে কম তাৎপর্যসমন্বিত, সময় তার দায়িত্ব নেবে। কিন্তু শর্তমুক্ত, অতি দ্রুত গবেষণায় ফললাভের শর্তমুক্ত, এমনকি ফললাভ করতেই হবে এই শর্তমুক্ত বাতাবরণই আমাদের কাম্য ('জ্ঞান যেথা মুক্ত')।

দুটি বিষয়ের অবতারণা করে এই প্রবন্ধের ইতি টানছি।

১. গণিতের জগৎ থেকে এতদিন পরিবর্তনীয়তা (variability) এবং অস্পষ্টতা (vagueness) নির্বাসিত ছিল। এ ব্যাপারগুলিকে একটু খাটো করেই দেখা হত এতদিন। এখন আবার এই ধারণাগুলির গুরুত্ব অনুভূত হচ্ছে। যে সমস্ত শিরোনামায় এগুলি আলোচিত হচ্ছে তার কয়েকটি হল—

Sheaf Theory (1949)
Probabilistic Metric Space (1951)
Non-Standard Analysis (1961)
Kripke Model (1965)
Fuzzy Sets (1965)
Elementary Topoi (1969)
Internal Set Theory (1977)
Alternative Set Theory (1979)

এখনো এই ভাবনাগুলি রক্ষনশীল ক্ষমতাসীনদের কাছে গৃহীত হচ্ছে না। আমার মনে হয় গৃহীত না হলেই শুভ। এরই সাথে সাথে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের লজিক। খুব আশ্চর্যজনকভাবে এই নতুন ভাবনার জগতে অনেক সময়েই মূল অবদান এসেছে কম্প্যুটার টেকনলজির ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। কোন সন্দেহই নেই এই টেকনলজি একেবারে সরাসরি ক্ষমতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই সতর্ক থাকতেই হবে ক্ষমতার এই উৎসাহের কারণ সম্পর্কে।

২. মনে হচ্ছে গণিতের ক্ষেত্রে প্লেটোর দিন শেষ হতে চলেছে। কোন নির্দিষ্ট একক গণিতজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করা এবং সেই জগতের সত্যগুলি আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হওয়া, এখন আর সম্ভব নয়। এখন বরং স্বাভাবিক মনে হয়, কোন গণিত আমার পছন্দ হয়, কোন লজিক আমি প্রয়োগ করব, কোন সেটতত্ত্ব আমি ভিত্তি হিসেবে নেব, এই বহুত্বধর্মী মনোভাব (approach) গ্রহণ। ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর হলেই বিষয়টি হয়ে পড়ছে সংস্কৃতি-নির্ভর। গণিত কি ব্যক্তিমানুষের সংস্কৃতি-নির্ভর সামাজিক ক্রিয়া হতে যাচ্ছে আগামী দিনে? Wittgenstein বলেছেন, একটি সমগ্র জাতির রীতিনীতি, অভ্যাস এবং আচরণের উপর গণিতের বেড়ে ওঠা নির্ভর করে। সমগ্র জাতি বলতে সমগ্র মানবজাতির কথা স্পষ্ট করে বলা নেই কোথাও। তা যদি হয় তাহলে সংস্কৃতি-নির্ভর ভিন্ন ভিন্ন গণিত সৃষ্টি কি সম্ভব? যেমন ভিন্ন ভিন্ন সংগীত, বা সাহিত্য বা যে কোন শিল্প? ইতিমধ্যে কেউ কেউ সমস্ত পৃথিবীতে একই গণিত শিক্ষণের মধ্যে পশ্চিমের দেশগুলির সাংস্কৃতিক-সাম্রাজ্যবাদী লক্ষণের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছেন। মনে করছেন বর্তমান গণিত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে একটি মূল্যবোধও অনুপ্রবিষ্ট করা হচ্ছে। এই মূল্যবোধগুলি হল rationalism, objectivism এবং power ও control-এর মনোভাব সৃষ্টি। এবং এগুলি মূলত ইয়োরোপের মাটিতে জন্মগ্রহণ

করেছিল। অন্তত একথা বলা যায়, সমস্ত সংস্কৃতিতেই একই ধরনের rationalism ইত্যাদি তৈরি হয়নি।

আমি এই প্রসঙ্গগুলি সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত মতামত দিতে পারব না এই মুহূর্তে। তবে এখনকার বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি ও সামাজিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের দিকে চেয়ে মনে হচ্ছে প্রসঙ্গগুলি আর অবহেলার যোগ্য নয়। □

সহায়ক রচনাপঞ্জি :

Mathematics, the Loss of Certainty, M. Kline, Oxford University Press, 1980.

Quantum Probabiliy—Quantum Logic, I. Pitowsky, Springer Verlag, 1989.

Proofs and Refutations, I. Lakatos, Cambridge University Press, 1975.

A Mathematician's Apology, G. H. Hardy, Cambridge University Press.

Western Mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism, A. J. Bishop, Race & Class, 32(2), 1990.

Foundations of Fuzzy Sets: A Non-Standard Approach, C. A. Drossos, F. S. S. 37, 1990.

প্রতারক

মনীশকে যে আমি খুব ভালোভাবে চিনি এমন নয়, তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার একটা ডায়েরি আমার হাতে আসে, আর একটা ছোট্ট নোটবুক। মনীশের সঙ্গে আমি বরাবরই একটা দূরত্ব বজায় রেখেছি, বিশেষত তার বারবার নিজেকে একেবারে কপর্দকহীন, সর্বস্বান্ত করে দেয়ার যে-ঝোঁক ছিল, সেসব আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি। একেবারে শূন্যের ভিতর গিয়ে দাঁড়ানোর এই ঝোঁক আমার কিছুটা আত্মঘাতী মনে হয়েছে। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই, তার চরিত্রের এই দিকটাই আমাকে টেনেছে বেশি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাকে আমি দেখতে যাই, তখন তার কথা বলার কোনো উপায় ছিল না, গলায় ক্যানসার। চিকিৎসা দূরের কথা, পথ্য অর্থাৎ খাবার-ও তার জোটেনি। অবশ্য মনীশ কোনো চিকিৎসা-ও করেনি, সে কেবল ডাক্তারের কাছ থেকে, যন্ত্রণা কমানোর কিছু ওষুধ নেয়। এ-ব্যাপারে পাড়ার একটি ক্লাব থেকে সে কিছু সাহায্য-ও পায়। ব্যস আর কিছু না। এরপর তার মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ছিল। আমাকে সেদিন দেখে সে শান্তভাবেই তার পাশে রাখা ডায়রি ও নোটবুক আমার হাতে দেয়। তার মুখে কোনো ক্ষোভ ছিল না, অনুতাপ ছিল না, অভিযোগ-ও নয়। অথচ প্রশান্তি ছিল কি ? না, তা-ও নয়। শুধু এক অসীম ঔদাসীন্য ও প্রত্যাখ্যানে ভরা তার মুখ দেখে একবার হঠাৎ-ই মনে হয়েছিল, বোধহয় শূন্যের কিছুটা আভাস সে কোনো-ভাবে দেখতে পেয়েছে। মৃত্যুর অন্তস্থলে যে পরম নৈঃশব্দ্য আছে, তারই ভূমিকা হিসেবে তার বাকশক্তি লোপ পাওয়ায় সে যে স্তব্ধ হয়ে যেতে শুরু করে, নিশ্চয়ই তার জন্য তার কোনো মনস্তাপ ছিল না, এটা আমরা ধরে নিতে পারি।

আগেই বলেছি মনীশের কাছ থেকে একটা দূরত্ব আমি বরাবরই বজায় রেখেছি। সে-ও তাই, আমার কাছ থেকে। একসময় তাকে আমি পছন্দ করতাম, ক্রমে তার জায়গায় একটা বিতৃষ্ণা চলে আসে। মনে হতো মনীশ অহংকারী। একসময় তাকে আমি ধার দিয়েছি, বেশ কয়েক হাজার। সে ধারও সে শেষ পর্যন্ত শোধ করেনি। তার চরিত্রে এটা অবশ্য বেশ মানিয়ে যায়। সে সময় সে বেশ কিছু গল্প লিখে ফেলেছে, লেখক হিসেবে তাকে তখন অনেকে চেনে। তার লেখা আমি যে পছন্দ করতাম না এমন নয়, বলতে

দ্বিধা নেই তার চিন্তাভাবনায়, বা গল্পের কোনো কোনো চরিত্রে আমার নিজের ছায়া আমি লক্ষ্য করেছি। তখন অনেক সময়ই মনে হয়েছে লেখক হিসেবে সে আমাদের কাছ থেকে যেন তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশ কিছু বেশি-ই দাবি করছে। যেন সে ধরেই নিয়েছে সে 'লেখে' বলে আমাদেরও উচিত তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া, যেন তার 'লেখা'র জন্য সে নিজেকে যতটুকু নষ্ট করেছে, পুড়িয়ে ফেলেছে তার দায়িত্ব আমাদের, তার চারপাশের পরিচিত লোকেদের। বলতে দ্বিধা নেই, এই জন্য তাকে আমি ঘৃণা করেছি। কিন্তু 'ঘৃণা' বললে যথেষ্ট বলা হয় না, তার চেয়ে বলা ভালো আমি তাকে সন্দেহ করেছি। সে প্রকৃত লেখক কিনা, নাকি লেখকের ছদ্মবেশে কোনো প্রতারক, এই সন্দেহ আমার শেষ পর্যন্ত ছিল, তার ডায়েরি এবং নোটবুক পড়ার পরও। যেকোনো লোকেরই আত্মবিবরণীতে এক ধরনের কৈফিয়ত থাকে, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে, ফলে ডায়েরি ও নোটবুক পাঠ করে যেমন লোকটিকে তার ভেতর থেকে চেনা যায়, তেমনই, বলা যায় সেইজন্যই ঠিক তাকে নিরপেক্ষভাবে দেখা যায় না। কাজেই ডায়েরি ও নোটবুকের চেয়ে বড় কথা হল ঘটনা। তার জীবনের কিছু ঘটনা যদি পর পর সাজিয়ে দেখা যায়, তার কথা ও কাজের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে, তাহলে অবশ্যই আমরা তার কথায় সন্দেহ করব, সন্দেহ করব তার ব্যাখ্যায় ও কৈফিয়তে। এখন ঘটনার দিকে একটু নজর দেয়া যাক। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন আমি মনীশকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি, সে তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখেনি, কিংবা কাজও করেনি। বস্তুতপক্ষে মনীশকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না, আমি গুরুত্ব দিচ্ছি মনীশ নামে একটি 'সমস্যা'কে কিংবা ধরা যাক একটা বিশেষ মানসিক বিকারের উপসর্গকে, যার চেহারা ক্রমশই আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

মনীশের জীবনের কিছু ঘটনা আমি জানি, যেসব ঘটনা সে তার নোটবুক ও ডায়েরিতে উল্লেখ করেছে, তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সে নিজেই দিয়েছে। প্রথম ঘটনা হচ্ছে তার মা-র মৃত্যু। এ সম্পর্কে মনীশের জবানীতে তার নোটবুকে যা লেখা আছে, তারই উল্লেখ করছি :

মনীশের নোটবুক থেকে

মা-র মৃত্যু শেষ পর্যন্ত আমাকে এতটা ভয়ংকরভাবে পিষে থেঁতলে দেবে তা বুঝতে পারিনি। সত্যিকথা বলতে কী মা-র মৃত্যুর পরপরই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, আমার নিজেকে অনেক স্বাধীন ও মুক্ত বলে মনে হয়। এর জন্য সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দেখার কোনো দরকার নেই। এটা ঘটনা। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। মৃত্যুর আগে মা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। গা থেকে জামাকাপড় জোর করে খুলে ফেলত, মুখে অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষা। আমাকেই মা-র দু-হাত বেঁধে রেখে পাহারা দিতে হত। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে আমি লক্ষ্য করতাম সেই উন্মাদ বত্রিশ বছরের তরুণী কীভাবে

স্মৃতি ও স্বপ্নের জগতে ভেসে গিয়ে তার শরীর ও স্বাভাবিক চেতনার দাবিকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। মা তখনো ছিল বত্রিশ বছরের এক স্বামীহারা লাবণ্যময়ী তরুণী। তখন আমার বয়ঃসন্ধি। মা যে তখনো তরুণী সে সম্পর্কে আমি সদ্য সচেতন হয়েছি, তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আমার গোটা বাল্য ও শৈশব কেটেছে মা-র হাতে প্রচণ্ড প্রহার ও ভর্ৎসনায়। বাবার মৃত্যুর পর অত্যাচারী বাবার ভূমিকা আমার মাকেই নিতে হয়। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় হঠাৎ-ই মার জন্য আমার করুণা ও সমবেদনা আসে। তবু মার মৃত্যুর ঠিক পরেই এক ধরনের মুক্তির স্বাদ পাই। কিন্তু তার পাশাপাশি এক ভয়ংকর নিরাপত্তাবোধের অভাব আমাকে মাঝে মাঝেই দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার দিকে ঠেলে দিতে থাকে। কোনো কোনো সময় এই উদ্বেগ, আতঙ্কের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। এই সময় আমি অস্থির হয়ে উঠতাম, আমার নারী সঙ্গের প্রয়োজন হতো।

এর অনেকদিন পর হঠাৎ-ই হারমান হেসের ডেমিয়ান বইটি আমার হাতে আসে। তাতে, বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি, ডেমিয়ান, তার, এক সহপাঠীর মার প্রেমে পড়েছে। সেই মহিলার কোমল সোনালী অলকগুচ্ছের স্পর্শে শিহরিত হয়ে প্রথম চুম্বনের মুহূর্তে ডেমিয়ান একই সঙ্গে নারী ও জননীর সুরভিত ওষ্ঠাধরের স্বাদে বসন্তের ফুল ও ফলের ঘ্রাণ পাচ্ছে। আমি হেস্‌কে ধন্যবাদ জানাই। আমার হঠাৎ-ই মনে পড়ে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে মার চুম্বনের কথা। প্রতিবেশী এক বন্ধুর সঙ্গে আমি দূরের একটি শহরে বেড়াতে যাবো। এর আগে আমি কখনো মাকে ছেড়ে দূরের কোনো অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে থাকিনি। যাওয়ার আগের দিন তেতলার ছাদে অপরাহ্নের ম্লান আলোয় হঠাৎ অশ্রু ঝলমল চোখে মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে ও গালে চুম্বন দেয়। এখনো সেই চুম্বনের স্মৃতি হঠাৎই মাঝে মাঝে এক অকালমৃত তরুণীর ম্লান বিষণ্ন চোখ ও মূর্তিকে যেন সময়ের পরপার থেকে এক মৃদু তরঙ্গের ঝাপটায় আমার সামনে নিয়ে আসে। সে মূর্তি যেন অস্ফুট ভাষায় কিছু বলতে চায়, তারপর পলকের মধ্যে শিশির বিন্দুর মতো ভেঙে চুরমার হয়ে ফের মিশে যায় স্রোতে।

মার মৃত্যু কেন ও কীভাবে হয় তা এই মুহূর্তে বলছি না। শুধু স্মৃতি ও সময় নিয়ে এক অবিরাম জটিল ভাবনার মধ্যে ভেসে চলেছি। সেদিন স্টানিস্লাভ লেমের 'নক্ষত্র ডায়েরি' পড়লাম। তার একটি গল্পে মহাকাশে সময়ের আবর্ত বা টাইম ভরটেকসের উল্লেখ আছে যেখানে প্রতি মুহূর্তের 'আমি'-র সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে। যেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে আছে। সম্ভবত সেখানে মার সঙ্গে দেখা হলে এই ৫৩ বছরের 'আমি' এক ৩২ বছরের তরুণীকেই দেখতে পাবো। স্মৃতি ও সময়ের রহস্য নিয়ে এক জীবন ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ছি।

লেখকের বক্তব্য

চারপাশের বাস্তব জগত সম্পর্কে মনীশের একটু অসুস্থ ঔদাসীন্য বোধহয় এসময়

থেকেই তাকে ঠেলে দেয় দিবাস্বপ্ন ও মনোবিকারের দিকে, যেখানে তার কাছে ঘুম ও জাগরণ প্রায় একাকার হয়ে যেতে থাকে। মনীশের ব্যক্তিত্বে যে উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা এখান থেকেই লক্ষ্য করা যায়। নোটবুকের এই অংশে মনীশ কিছুটা কবিত্ব করেছে মৃত্যু সম্পর্কে। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে এমন কি তার কোনো বন্ধুর মৃত্যুতেও শবযাত্রায় অংশ নেয়নি। তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার কাছ থেকে আমি জানতে পারি, এমনকি তার মায়ের মৃত্যুর দিন ভোরবেলায় সে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, তাকে ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর আগেই তার মার মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে মনীশের ব্যাখ্যা কী তা জানার আগ্রহ আমার ছিল। তার নোটবুক তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় কয়েক লাইন পাই। তাদের নিচে তুলে দিচ্ছি :

মার মৃত্যু সম্পর্কে আমার দায়িত্ব

পর পর কয়েকদিন ভোররাতে ডাক্তারের কাছে যাই। সেদিনও গিয়ে ওষুধ এনে ঘুমিয়ে পড়ি। মার অবস্থা খুবই খারাপ। হঠাৎ একসময় কেউ আমাকে ফের ধাক্কা দিয়ে জাগায়। উঠতে সামান্য দেরি হয়। কিন্তু উঠি। ফের ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে বাড়িতে ঢুকতেই কান্নার রোল শুনি। আমার মেজমাসী আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন : 'ছি ছি, তুই দেরি করে গেলি, তোর জন্যই তো—'

আমি কিছুই বলিনা, মাথা নিচু করে থাকি। আমি জানি মার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে। যে দায়ী সে কিছুক্ষণ পরেই খাট ও রজনীগন্ধার গোছা নিয়ে আসে। তার ভাঙা গাল, কোটরে বসা চোখ, শিকারি বেড়ালের মতো তীব্র ধূর্ত চোখের মণি ঘুরতে ঘুরতে মেজমাসীর মুখে স্থির হয়। আজ তার গলায় সিল্কের গাঢ় নস্যিরঙের স্কার্ফ বাঁধা নেই, পরনে সিল্কের শার্ট ও গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার্স নেই। রমণীমোহনদা আজ খুবই শোকার্ত। কিন্তু কুমারী মেজমাসীকে ছেড়ে তরুণী বিধবা, আমার মায়ের দিকে চলে যাওয়ার জন্য মেজমাসী কখনো রমণীমোহনকে ক্ষমা করেনি। আজ তাই মেজমাসীর ক্রন্দনরত ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপ লক্ষ্য করে রমণীমোহন মৃতের শবযাত্রার দিকে মন দেয়।

আমি সবকিছু লক্ষ্য করি।

হা ঈশ্বর!

লেখকের বক্তব্য

এই কটি লাইন পড়ে বোঝা যাচ্ছে কিশোর বয়স থেকেই মনীশের মন সন্দেহপ্রবণ। আমি পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি মনীশের মার মৃত্যুর ব্যাপারে রমণীমোহনের ভূমিকা থাকলেও তার সঙ্গে মনীশের আত্মীয়াটির কোনো সম্পর্ক ছিল না। মনীশ যে সন্দেহপ্রবণ ছিল, তা আমি তার স্ত্রী ও দুই প্রেমিকার কাছ থেকে আরো জানতে পারি। এমনকি

আমাকেও সে তার প্রেম-ব্যাপারে সন্দেহ করেছে। তার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতাও সুস্থ নয়। আমি এবিষয়ে কিছুই বলতে চাই না। তার নোটবুকই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিক :

মনীশের নোটবুক

আমার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে স্বপ্নে! আমাদের শহরের পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট যিনি ছিলেন, তাঁর ছিল একটি হুডখোলা লাল গাড়ি, আর কিশোরী দুই মেয়ে। আমি স্বপ্নে দেখি সেই লাল হুডখোলা গাড়িটি চেপে তারা বেড়াতে চলেছে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ গাড়ি থেকে একটি মেয়ে আমার দিকে একটি চিঠি ছুঁড়ে দেয়। আমি হাত বাড়িয়ে রাস্তা থেকে চিঠি তুলে নিতে যাব, এমন সময় ঘুম ভেঙে যায়। হাতে ছোঁওয়া লাগে এক নগ্ন নারীশরীরের। তিনি আমার মাতৃসমা একজন। ভয়ে ও অপরাধে সারারাত জেগে থাকি।

লেখকের বক্তব্য

বয়স্ক মহিলাদের সম্পর্কে মনীশের যে যুবক বয়স থেকেই আগ্রহ ছিল, তা আমি জানি। অন্তত একজন তিরিশোর্ধা মহিলার সঙ্গে তার আঠারো বছর বয়সে যে সম্পর্ক হয় তার খুঁটিনাটিও একসময় আমি জানতাম। মনীশের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়িতেও গেছি। কিন্তু মনীশের নারীসঙ্গ সম্পর্কে আমার আগ্রহ কম। আমি তার স্বপ্ন ও স্মৃতির জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম। অথবা বলা ভালো তার 'অন্তর্জগৎ' সম্পর্কে আমার আগ্রহ। কেননা আমার ধারণা মনীশ তার বাইরের জীবন ও জগৎকে প্রতারণা করতে শুরু করে এই তথাকথিত 'অন্তর্জগতে'র তাড়নায়।

বলা ভালো, আমি 'অন্তর্জগতে' বিশ্বাসী নই। আমি বিশ্বাস করি মানুষের আচরণ-ই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়। অথবা বলা যায় তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। মনীশের একটানা নানান নারী সংসর্গ, তার অসুখী ও ভগ্ন দাম্পত্যজীবন, তার অবিরাম ঋণ করা ও ঋণ শোধ না-দেয়া, তার আত্মহত্যার চেষ্টা তার চাকুরিতে ইস্তফা দেয়া, তার সর্বস্বান্ত হওয়া, তার ঐশ্বরিক ধ্যান ও অভিজ্ঞতা, এ সবই আমার মনে হয়েছে যেন ন্যাড়া ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ঘুমের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া নিশ্চিত পতনের দিকে। বিশেষত তার ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা যে তার মনোবিকারের চরম পর্যায় এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। এই জন্যই আমি তার স্মৃতি ও স্বপ্নের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম।

মনীশের নোটবুক

অর্ফিউস সম্পর্কে একজায়গায় পড়লাম, শেষপর্যন্ত আত্মার মুক্তি হচ্ছে স্মৃতির

পুণ্য ঝর্ণা নেমোসাইনির জল পান করায়। এক মৃত্যুর ভিতর থেকে অন্যমৃত্যুতে, এক জন্ম থেকে অপর জন্মে ভেসে যেতে যেতে আত্মা তার পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে যদি সে বিস্মৃত না-হয় কখনো, যদি তার স্মৃতি থাকে জাগরূক। মৃত্যুর পরে যদি এই হয় তাহলে মৃত্যুর আগেও তাই, অর্থাৎ একবার পেছন ফিরে গোটা জীবনকে দেখে নেয়া, স্মৃতিতে। টেবিল ল্যাম্পের নিচে গ্লোব কত ছোটো, কিন্তু স্মৃতিতে কী বিশাল, যেন অন্তহীন। বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে। আর বোর্হেসের গল্পেও পড়েছিলাম, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গোটা জীবনকে দেখে নিচ্ছে। গোটা জীবনকে দেখে নেয়া সম্ভব নয়। বিশেষত যদি স্বপ্ন ও স্মৃতির কথা ভাবি। কাল রাত্রে দুবার একটি প্লেনে চড়ার স্বপ্ন দেখলাম। আজ সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় সমস্ত যাত্রীর মৃত্যু। এ-দুয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে কিনা জানি না, স্বপ্নে আমার প্লেনে চড়ায় কোনো গোলযোগ হয়নি। খুব নিরাপদে চমৎকার ভাবে ওঠানামা করেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে প্রতিদিনের স্বপ্ন মনে থাকে না। এখন প্রায় দিনই রুনুকে স্বপ্নে দেখছি। রুনুর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে বলে? রুনুর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া ; চলে যেতে বলছি, নিজেও বলছে চলে যাবে। আমিও বলছি সব শেষ করে দেবো, কিন্তু কিছুই শেষ হচ্ছে না। এই অসুখ থেকে আমার রেহাই নেই, মৃত্যু, ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণার দিকে এগিয়ে চলেছি, এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, আরোগ্য নেই। রুনু তবু যাবে না। অথবা এ-ও হতে পারে আমি রুনুকে ছাড়তে চাইছি না। রুনুকে ছেড়ে দিলেই রুনু চলে যাবে। মৃত্যুর কথা মনে হলে অবশ্যই মার কথা মনে পড়ে। মৃত্যুর আগের মনোবিকার- ভয়ঙ্কর। সরোজ বলে, আমি বিকারগ্রস্ত। আমি অস্বীকার করি না। তবু সরোজকে আমি স্বাভাবিক ভাবি, যদিও সরোজ, আলাপ হওয়ার বহু আগেই, মার্গারেটকে স্বপ্নে দেখে। অবশ্য স্বপ্নে ঠিক মার্গারেট নয়, একটি বিদেশী কিশোরীকে তার দিকে অনেকটা শাগাল-এর ছবিতে যেমন দেখা যায় সেভাবেই ভেসে আসতে দেখে সে। এর বহুবছর পর ভবতোষ যখন তার স্ত্রী অর্থাৎ মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় তখনই চিনতে পারে সরোজ, আরে একে তো সে স্বপ্নে দেখেছে! আমার মেজোমেসোও তাই। মেজো-মাসীকে নাকি স্বপ্নে দেখেন, তারপর রাস্তায় আলাপ। আমি যাদের স্বপ্নে দেখি তাদের সঙ্গে রাস্তায় কখনো দেখা হয় না।

শেষবার মার্গারেট ক-দিনের জন্য এখানে এসে চলে যায়। সরোজ আমাকে এয়ার-পোর্টে নিয়ে গেছিল। গভীর রাত্রে প্লেন। মাঝে মাঝে হু-হু হাওয়ার সঙ্গে গম্ভীর জেটের শব্দ। ঘুরন্ত সার্চলাইটের আলো। মার্গারেটদের প্লেন আসতে এখনো দেরি। সামনেই একটা বিদেশী প্লেন ছাড়ছে, তার ঘুরন্ত লাল আলো দপ্‌দপ করে জ্বলছে নিভছে, অনেকটা হৃৎস্পন্দনের মতো। মার্গারেট হঠাৎ আমায় ডাকলো—'মনীশ, এদিকে শোনো—।

আমি এগিয়ে গেলাম। মার্গারেট বলল, 'আমি সরোজকে চিঠি দিলে ও উত্তর দেয় না কেন?' আমার যা মাথায় আসে তাই বলি, 'হয়ত উত্তর দেয়নি বলে আজ তোমরা বুঝতে পারছ, কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছ।'

'তুমি ওর খবর জানিয়ে চিঠি দেবে?'

'দেব।'

ঠিক আছে।'

মার্গারেটকে খুশি দেখায়। আমি লক্ষ্য করি ভবতোষ একটু বেশি মনোযোগের সঙ্গে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। একটু পরেই ওদের প্লেনের ডাক এলো। ওরা এগিয়ে যায়। আর দেখা হয় না। ওদের প্লেন ছাড়ার আগেই আমি আর সরোজ, নমিতাদের গাড়িতে চেপে নমিতাদের ফ্লাটে যাই। গাড়ি চালাচ্ছিল নমিতার স্বামী বিনোদ। চমৎকার ছেলে। পাঁচ পেগে সামান্য নেশা হয়। সে রাত্রে বিনোদ আমাদের অবিরাম স্কচ সরবরাহ করে গেল। ওদের অসুবিধে নেই, ওরা কাস্টমসের লোক। শেষ রাতের দিকে যখন এমনকি বিনোদও নেশাগ্রস্ত, তখন কী আশ্চর্য নমিতা আমাকে একপাশে ডেকে বলল, 'তোমার কী মনে হয় মনীশ, সরোজ সত্যিই মার্গারেটকে ভালোবাসে?'

আমি নেশাগ্রস্তের মতো হেসে বলি, 'তোমার কি মনে হয় নমিতা তুমি ভবতোষকে ভালোবাস?'

এই সময় বিনোদ হা-হা করে হেসে উঠে বলে, 'কী যে ভালোবাসাবাসির কথা তোমরা বলে চলেছ।'

নমিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'চুপ কর বিনোদ, তোমার নেশা হয়ে গেছে।' বিনোদ উঠে বারান্দার দিকে চলে যায়। সরোজ এবার কাছে এসে কিছুটা জড়িত গলায় বলে, 'তোমার কি মনে হয় নমিতা একরাত্রে একজীবনের ভালোবাসাবাসি সম্ভব?'

নমিতা মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে সরে যায়। আমার মনে পড়ে ভবতোষ, তার বিয়ের আগে যেবার এখানে আসে, সেবারই এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্রির নেশার টানে, নমিতার সঙ্গে একই ঘরে রাত কাটায়। তারপরের দিন ভবতোষ চলে যায় রাতের আটলান্টিকের দিকে, আন্তর্জাতিক তারিখরেখা পেরিয়ে, মার্গারেটকে বিয়ে-ও করে ফ্যালে সে, কিন্তু নমিতা এখনো ভোলেনি সেই রাতের কথা, ভবতোষকে নিয়ে এখনো তার মনে প্রশ্ন আছে, বিনোদ তখন ছিল লাডাকের এক সীমান্তবর্তী গাঁ-এ। যে-সময় জনহীন, ঘটনা-হীন, ইতিহাসহীন, সেই শূন্য সময়ের ভিতর একের পর এক হঠাৎ ঘটনা এসে হাজির হয় ভোরের সমুদ্র-দিগন্তে হঠাৎ উঠে আসা একঝাঁক নৌকোর মাস্তুলের মতো; আর তারপর থেকে প্রতিটি ঘটনা তার নির্দয় ক্ষমাহীন পারম্পর্য অনুসরণ করে এগোতে থাকে উপকূলের দিকে যতক্ষণ না বালিয়াড়ির দিকে পৌঁছোয়, যতক্ষণ না নিজের পাটাতনের গর্ত খুলে ভাঁড়ারের অন্ধকার থেকে বের করে আনে সমুদ্রের ভিতর থেকে তুলে আনা তার মাছের ঝাঁক, তার শিকার। সরোজ তার স্বপ্নে দেখা কিশোরীর কথা

ভুলে গেছে। সরোজ তার স্বপ্নের কথা-ও সেদিন অস্বীকার করল।

যা তার জীবনে ঘটছে, সবই নাকি জাগ্রত অবস্থায়।

লেখকের বক্তব্য

আমার জীবনে স্বপ্নের প্রভাব কম। মনীশের উপরোক্ত অংশ পড়ে বুঝতে পারছি, ঘটনা একভাবে ঘটেছে আর তার ব্যাখ্যা অন্যভাবে দিয়ে চলেছে মনীশ। হ্যাঁ, মার্গারেটকে দেখার বহু আগেই আমি প্রায় কিশোর বয়সে একটি বিদেশী কিশোরীকে স্বপ্ন দেখি, যার মুখ আমার মনে না-থাকলেও মার্গারেটকে দেখামাত্রই তার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মার্গারেটের খবর, তার সাক্ষাতের বহু আগেই কেউ আমাকে স্বপ্নে পৌঁছে দিয়েছে, এমন কোনো জগৎ থেকে, যা লৌকিক নয়।

নিশ্চেতনা, নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। রহস্যে আমার বিশ্বাস নেই বা বিশ্বাস করলেও রহস্য হচ্ছে আমার কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়ার মতো, যার, একের পর এক সূত্র খুঁজে বের করে, কিনারা করা সম্ভব। এ বিষয়ে আমি সার্ত্রের সঙ্গে একমত।

মনীশ যে অবিকল স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি খুঁজছে, তা হাস্যকর। প্রথমত তার স্মৃতিচারণায় যথেষ্ট ভেজাল আছে, দ্বিতীয়ত এক জন্ম থেকে অপর জন্মে, এক মৃত্যু থেকে অপর মৃত্যুর দিকে ভেসে যাওয়া… ? না, একজীবনে কাপুরুষরাই বেশ কয়েকবার মারা যায় শুনেছি, আর মিথ্যাবাদীরা বেশ কয়েকবার জন্মায়। কিন্তু একথা সত্যের খাতিরে মানতেই হবে যে মনীশ মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ ছিল না। তাহলে ? সম্ভবত মনীশ ভুলবশত স্মৃতির পুণ্যঝর্ণা নেমোসাইনির জল পান না-করে বিস্মৃতির নদী লিদির জল পান করে ফেলেছে। হায় অর্ফিউস !

মনীশের নোটবুক

সর্বনাশ হয়েছে, সত্যি-ই অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি। একদা ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের প্রুস্ত সংক্রান্ত লেখায় পড়েছিলাম যে-স্মৃতি কাউকেই বলা যায় না, সেই স্মৃতি দু-দণ্ডের আলাপে ট্রেনে বলে দেয়া যায় এমন সহযাত্রীকে, যার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা, গ্রীসে, প্রাচীন সমাধিমন্দিরের ফলকের গায় যেসব অর্ফিক শোকগাথা খুঁজে পেয়েছেন তার একটি উল্লেখ করছি :

মৃত্যুপুরীর বাঁদিকে পাবে একটি ফোয়ারা
ঐ ফোয়ারার পাশেই আছে একটি শাদা সাইপ্রেস গাছ
এদের কাছাকাছি যেওনা

কিন্তু আরেকটি ফোয়ারা পাবে স্মৃতির হ্রদের পাশে
যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে শীতল জলধারা
তার সামনে আছে প্রহরীর দল
সেখানে গিয়ে বলো, আমি পৃথিবী ও নক্ষত্রলোকের সন্তান,
বলো : আমি মর্ত্য ও স্বর্গের সন্তান,
যদিও জাতির দিক থেকে আমি স্বর্গবাসী দেবসম্প্রদায়ের লোক
তৃষ্ণার্ত আমি
স্মৃতির হ্রদের পুণ্য জলধারা আমাকে দাও
তারা তখন তোমাকে সেই শীতল জলধারায় তৃষ্ণা মেটাতে দেবে

এই নেমোসাইনির জলধারা আমার চাই। কাল থেকে রাতের সমস্ত স্বপ্ন ভোরবেলায় উঠে চেষ্টা করব মনে করতে। কাল থেকে সকালে যেন কেউ আমায় না-ডাকে। আরতিকে বারণ করে দেব। একেবারে শৈশবের কিছু স্মৃতি খুঁজে দেখি, হাতড়ে দেখি, হয়ত তাহলে আমার পরিণাম বুঝতে পারব। বীজের মধ্যে যেমন গাছ, তেমনি শৈশবের স্মৃতির মধ্যে কোথাও হয়ত আমার পরিণাম লুকিয়ে আছে।

কিন্তু আশ্চর্য! বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষে রোহিণীর মৃত্যু ও গোবিন্দলালের অন্তর্ধানের পর যখন বারুণি পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করলেন তখন ভ্রমরের স্মৃতি-মন্দিরের আশেপাশে উইলো ও সাইপ্রেস গাছ পোঁতা হল। উইলোর উল্লেখমাত্র হ্যামলেটে ওফেলিয়ার কথা মনে পড়ে। বোধহয় উইলো গাছের নিচেই জলের ভিতর থেকে ভেসে উঠেছিল ওফেলিয়ার শব, আর সাইপ্রেস গাছ?

অর্ফিউস কিংবদন্তীর স্মৃতিচারণ, মৃত্যুপুরীর শোকচিহ্ন? কিন্তু স্মৃতি একসঙ্গে অবিকল ধরা পড়ে না। ছেঁড়াখোঁড়া, ছিন্নভিন্ন হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। দেখি তার কিছু টুকরো উদ্ধার করতে পারি কিনা।

লেখকের বক্তব্য

আমি জানি অবিকল স্মৃতিচারণ অসম্ভব। পরাজিত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা পুরস্কার দরকার হয়। ঠিক আছে মনীশ তা-ই নিয়ে খুশি থাক।

মনীশের নোটবুক

স্মৃতির কথা ভাবতে গিয়ে 'সময়' নিয়ে যেই ভাবছি, অমনি গণ্ডগোলে পড়ছি। একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকলে বোধহয় সুবিধে হয়। অতএব কিছু আনাড়ির মতোই ভাবার চেষ্টা করছি। শুনেছি বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার আগে অনন্ত বা কালহীন, থাকতে

পারে, কিন্তু 'সময়' ছিল কি ? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, না, সময় ছিল না বা তার আগে সময়ের কথা বলা নিরর্থক। তাই তাঁদের মতে বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার আগের মুহূর্তটি O-T বা শূন্য সময়। তবু কিছু নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা সময়ের আগে-ও সময়ের কথা ভাবেন। কেন ভাবেন ? কী ভাবে ভাবেন ? বিস্ফোরণের পর তার টুকরোগুলো যেমন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে তেমনই মহাবিশ্ব কেবলই চারদিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে, কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যদি বিশ্ব আদিতে একটি বিন্দু থেকে শুরু হয়। শোনা যায় আইনস্টাইন নাকি এরকমই ইঙ্গিত করেছিলেন, আর সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে দু-জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রোজার পেনরোজ ও স্টিফেন হকিং অংক দিয়ে প্রমাণ করলেন বিশ্ব শুরু হয়েছে একটি অতি সূক্ষ্ম বিন্দু থেকে যার ভিতর এখনকার বিশ্বের সমস্ত ভর (mass) ও শক্তি পোরা। ফলে এক অকল্পনীয় ব্যাপার, ওখানে নাকি বিজ্ঞানের কোনো নিয়মই খাটে না। স্থানকালের জ্যামিতি নাকি ওখানে অনন্ত বক্রতায় তচনচ হয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞানীরা আবার শুরু করলেন নতুন করে ভাবতে, এবার বিন্দুর জায়গায় এলো বুদ্বুদ বা বাবল ! হকিং নিজের তত্ত্ব নিজেই পরিত্যাগ করে বুদ্বুদ তত্ত্ব নিয়ে মাতলেন, কেননা এখানে বিজ্ঞানের নিয়ম খাটে। কিন্তু এ তত্ত্ব-ও ঠিকমতো দাঁড় করানো যাচ্ছে না। তবু শূন্য সময়ের আগে সময় থাকতে পারে আর তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে, এটা ভাবতেই মজা লাগে তবে এ সমস্যার নাকি এক অভিনব সমাধান হাজির করেছেন হকিং, বলছেন, আদিতে বিন্দুও ছিল না, বুদ্বুদও ছিল না, ছিল শুধু এক স্থান-কালের বর্তুল আভাস। ফলে বিশ্বের কোনো স্থান-কালের সীমান্ত নেই, কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে কাল্পনিক সময় মাপলে এ সমস্যার সমাধান হবে, যদিও বাস্তব সময়ে বিশ্বের শুরু ও শেষ আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা বেশি বাস্তব ? কাল্পনিক না বাস্তব সময় ? নাকি স্মৃতির সময়টা বেশি বাস্তব ? ফের বোদলেয়ারের কবিতা মনে পড়ছে,··· টেবিল ল্যাম্পের নিচে গ্লোব কত ছোটো, কিন্তু স্মৃতিতে, কল্পনায় কী বিশাল, যেন অন্তহীন,··· এখানেই স্মৃতির একটা ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করছি, বইয়ে দেখতে পাচ্ছি ঠিক এর উল্টো : টেবিল ল্যাম্পের নিচে মনে হয় পৃথিবী কী বিশাল, আর স্মৃতিতে মনে হয় কত ছোটো :

> How big the world by lamp light does appear
> How small the world is in our memory

সর্বনাশ ! ভুলে যাচ্ছি, অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি। কেন ভুলে যাচ্ছি। কেন প্রতারণা করছে স্মৃতি, স্মৃতি কি প্রতারক ? বিস্মৃতির অন্ধকার নদী লিদির সর্বনাশা টান বড় ভয়ংকর, ফের বোদলেয়ারের 'লিদি' কবিতায় দেখতে পাচ্ছি :

> I know of nowhere like your bed's abyss
> To swallow up my agony, now gone ;
> Upon your lips dwells great oblivion,

And Lethe flows on in your every kiss.

লিদি তাহলে নারী, যার শয্যার গহ্বরে আছে সমস্ত কষ্টের শেষ, ওষ্ঠে আছে মহাবিস্মরণ, আর চুম্বনের প্রবাহে আছে অন্ধকারের স্রোত।

In petticoats all fragrant with your scent
Bury my aching and uneasy head
And breathe in, like a flower long since dead
The musty sweetness of my love now spent

যার অন্তর্বাসের সুগন্ধে পীড়িত মাথা ডুবিয়ে রেখে বহুক্ষণ আগে মৃত বাসি ফুলের মিষ্টি গন্ধের মতো সদ্য খরচ হ'য়ে যাওয়া প্রেমের সুরভি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া যায়।

তবু নারী বিস্মরণ নয়। অন্তত লীলা তা ছিল না, রুনু-ও নয়। তবু একথাও ঠিক, নারী শরীরে যে অন্ধকার আছে, তাতে ডুবে যাওয়া যায়, ঘুম বিস্মরণ ও নৈঃশব্দের সর্বশেষ স্তর ছুঁয়ে বোঝা যায়, এ এক অনন্ত মৃত্যুর দরজা যা খুলে দিলে মাতৃগর্ভের আশ্রয় হয়ত-বা মেলে। ফলে মাতৃগর্ভের স্মৃতি কিছু আছে কিনা তা-ও ভেবে দেখতে হয়। কোনো কোনো মনোবৈজ্ঞানিক যেমন লেইং বলছেন, আছে। মাতৃগর্ভের স্মৃতি ধরা আছে উপকথায় কিংবদন্তীতে, আর স্বপ্নে। মোজেস বা কর্ণের জন্মবৃত্তান্তের মুলে আছে মাতৃগর্ভের স্মৃতি। কিন্তু সে কথা পরে, কেননা মাতৃগর্ভের-ও আগে, মৃত্যুর পরের কোনো স্মৃতি আছে কিনা, একথা-ও তাহলে ভেবে দেখতে হয়। মৃত্যুর পরের স্মৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন স্টানিস্লাভ গ্রাফ। সে-ও বড় অদ্ভুত। থাক সে কথা। আগে দেখা যাক শৈশবের সবচেয়ে আগেকার কোন স্মৃতি মনে করতে পারি…

খুব ঝাপশাভাবে মনে পড়ে ঠাকুমার কোলে চেপে কলকাতার একটি রাস্তা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ সাইরেন বাজল, রাস্তায় লোকজন ছুটছে, ঠাকুমাও দ্রুত হেঁটে, বোধহয় বাড়িতে। দোতলার খোলা ছাদ, সেখানে চেয়ারে বসা ফর্শা চেহারার হৃষ্টপুষ্ট একজন প্রৌঢ়। কে তিনি, মনে নেই। একটা ঝাঁকড়াচুলো ধূসরসাদা বড় বড় লোমেভরা আদুরে কুকুর, একজন অত্যন্ত ফর্শা চেহারার রূপবান তরুণ, বাবা? না কাকা? জানি না। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে সবুজ রঙের ছাদখোলা দোতলা বাস, আবার একতলা সবুজ রঙের প্রাইভেট বাসের জানালার ওপরের নীল বা সবুজ কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের চলমান রাস্তাঘাটের বেশ মায়াবী দৃশ্য, আবার একসময় কোথায় যেন দেখেছি রাস্তায় ট্যাঙ্ক… তারপর অনেকটা জুড়ে কিছু নেই, সিনেমার ফিল্ম ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়। ফের আরেকদিন, সন্ধ্যার বা রাতের ট্রেনে মার সঙ্গে অপরিচিত এক স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এগোতে থাকা কাঁচা রাস্তা ধরে। ঘোড়ার খুরের শব্দ, চাবুকের আওয়াজ, ধীরে ধীরে কিছু বাড়িঘরদোর ও রাস্তা ঘুরে একটা প্রায়ান্ধকার গলি, যার একপ্রান্তে জ্বলছে কেরোসিন ল্যাম্পপোস্টের আলো, তার সামনে সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটি বাড়ি,

তার গোল বারান্দা, তার একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত কাচের জানালার সার। এই বাড়িতেই ঢুকলাম। ঐ কাচের জানালার সারের কথা আজো মনে আছে। এইবার আরো অনেক কিছু পর পর মনে পড়বে, সেসব আমি বলে যেতে পারি, বলবও। কিন্তু আজ নয়। এত ছোটবেলার কথা বলতে ভালো লাগে না। কেবল আগেকার ঐ ঝাপশা স্মৃতি থেকে বুঝতে পারছি, বাবার মৃত্যুর পর মা, আমাকে নিয়ে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে মফঃস্বল শহরে মামাবাড়িতে ফিরে এলো। মার এখানেই মৃত্যু। রমণীমোহনদার গ্রামের বাড়িতে তিনদিন বেড়িয়ে আসার খেসারত। কীভাবে এই লোকটির সঙ্গে মার আলাপ তা বলার দরকার নেই ; ও আগেই এসেছিল, সম্ভবত মেজমাসীর টানে। তারপর বয়সে বড়, মার সঙ্গে আলাপ ও পরে ঘনিষ্ঠতা। ডাকত 'দিদি' বলে। ফলে যে ঘরে আমি কেরোসিন টেবিলল্যাম্পের আলোর সামনে বসে পড়ার বইয়ের নিচে লুকিয়ে রেমার্কের 'তিনবন্ধু' পড়ছি, সে ঘরেই আমার পেছনদিকের খাটে বসে দুজনের গল্পগুজব। মাঝে মাঝে নিচু গলার আলাপ, গাঢ় নিঃশ্বাস, এ সবকিছু কানে এলেও কিছু বুঝিনি। কিন্তু এরপর নাইট শো-তে দু-জনের সিনেমা দেখা, খুবই খারাপ লেগেছে। তবু তখনও নয়। বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম যখন বিকারের ঘোরে মার প্রলাপে দুজনের অন্তরঙ্গ দৃশ্যের কিছুটা ভেসে আসে। অমানুষিক কষ্টে, অপমানে মার দু-হাত বেঁধে রেখে মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাইতাম, কিন্তু পারতাম না, কেবল প্রাণপণ দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাতাম, কিন্তু দুচোখ ছাপিয়ে জল ভরে উঠত। হা ঈশ্বর !

আজ আর আমি সেই কষ্ট পেতে চাই না, অথচ ঐ একই কষ্ট লীলা আমায় দিয়েছে, রুনু দিচ্ছে। দুজনেই দ্বিতীয় সম্পর্ক তৈরি করেছে· অপর পুরুষের দিকে চলে গেছে। আমি পড়ে আছি, ডাস্টবিনে পরিত্যক্ত অবৈধ শিশুর মতো। বোধহয় বিনয়ের কবিতার একটি লাইন থেকে এই উপমা মনে পড়ল। বিনয়ের নিজের রহস্যলোক আছে, বোধহয় গণিত ও কবিতায়। আমার কিছু নেই, শেষ ট্রেন চলে যাওয়ার পর রাতের প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ভিখারির মতো আমি শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছি, কোনো আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কিছু নেই। কেবল ভিতর থেকে মাথা, অসাড় হয়ে আসছে। তাহলে বেঁচে আছি কী করে ? এখানেই একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। যখন সমস্ত হিসেবনিকেশ ভেঙে প'ড়ে মনও তচনচ হয়ে ভেঙে পড়ছে, যেন একটা দানবিক মেশিন ভেতর থেকে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তখনই সবকিছু ভেঙে যাওয়ার পর, সমস্ত আশা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর, হঠাৎ যেন ভেসে উঠছি জলের উপর, জানিনা কীভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটছে, আর তারই ধাক্কায় ভেসে চলেছি, খুব ছোট ছোট ঘটনা, যেন বলা যায় অতিপরমাণুর স্তরে কিছু একটা ঘটছে···

একটি অতিপরমাণুর স্থান-কালের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার পথ কে বলা হয় ওয়ার্লড লাইন বা বিশ্বরেখা। এরকম পর পর বা পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কণিকা

ভেসে চলেছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে আলো পেঁছতে পারলেই যোগাযোগ হবে, কিন্তু তাদের ভিতর যদি এতটাই দূরত্ব থাকে যেখানে আলোও পেঁছতে পারে না, বা অন্যভাবে বলা যায়, যাদের মধ্যে এমনই দূরত্ব যে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে খবর পাঠালে তবেই যোগাযোগ হবে,—সেখানে যদি দেখা যায় যোগাযোগ হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে পরমাণুরা পরস্পরের মধ্যে খবর পাঠাতে পারে, তারা 'অচেতন' নয়, তাদের 'চেতনা' আছে। একে কোয়ান্টামবলবিদ্যার ভাষায় বলা হয় পরমাণুর অনৈসর্গিক (বা অলৌকিক ?) যোগাযোগ (Non local connection)। সেরকম কোন ঘটনা কি ঘটছে কোথাও, সেরকম কি কোনো সুদূর এলাকা থেকে খবর আসছে ? জানিনা বুঝতে পারছি না, কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে খুব ছোটখাটো ঘটনার ওপর। কেন এই মুহূর্তে আমি এই লাইন বা এই বাক্য লিখছি, কেন অন্য সময়ে, এই একই জায়গা থেকে শুরু করলে অন্য বাক্য লিখতাম, তার নির্দেশ কোথায় আছে, তার সংকেত কোত্থেকে আসছে ? যখন আমি সঙ্গে থাকি না তখন রুনু কী করে, নবীনের সঙ্গে কোথায় যায়, কী কথা বলে, তা কি আমি জানি, তা কি আমি জানতে পারব ? জানা যেতো যদি আমি অবিরাম ওদের দুজনকে নজরে রাখতাম, কিন্তু তাহলে যা আমি দেখতাম, তা-ই জানতাম, কিন্তু যখন আমার দৃষ্টির বাইরে ওরা থাকত— কোনো না কোনো সময় তা তো থাকবেই— তখন কী ঘটতো, তা আমার চিরকালের জন্য জানার বাইরে। আর এখানেই গণ্ডগোল। পরমাণুর মতোই এ-ও কেবল 'দেখা'র সময় জানা যাবে 'আছে', কিন্তু দেখার আগে পর্যন্ত আছে কি নেই, থাকলে কোথায় আছে, কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, এই অনিশ্চয়তা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে, 'মন' থাকার খেসারত এই। এসব ফের ভাবতে হবে, আরো ভাবতে হবে।

লেখকের বক্তব্য

এত ফালতু ব্যাপার নিয়ে ভাবার যে কী দরকার, তা বুঝি না। অবশ্য আসল ব্যাপার হচ্ছে 'সন্দেহ', আর 'হিংসা'। মনীশের স্মৃতি যে প্রতারক তা বোদলেয়ারের কবিতা থেকে আগেই প্রমাণ হয়েছে। 'সময়' ও 'পরমাণু' সম্পর্কে ওর বাগাড়ম্বর হাস্যকর, পপুলার সায়েন্সের বই পড়ে কিছু চালু ধারণা এদিকওদিক লাগালেই তার ভিত্তি 'বৈজ্ঞানিক' হয় না। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি মনীশ অংক জানে না। আর অংক না জেনে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলা, বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল সব তত্ত্ব নিয়ে কথা বলা নেহাতই হাস্যকর। তারপর আবার আধুনিক বিজ্ঞানকে অধ্যাত্মবাদের পক্ষে দাঁড় করানোও একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার। এ চেষ্টা আগেও হয়েছে। তারপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কার থেকে দার্শনিক সিদ্ধান্তে পেঁছনোও খুব একটা নিরাপদ নয়। তবে মনীশকে আটকাবে কে ? সে আর যাই হোক দেবদূত নয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের

নন লোকাল কানেকশন নিয়েও দেখছি মনীশ কথা বলছে, যদিও এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, স্বয়ং আইনস্টাইন।

মনীশের নোটবুক

আমি গণিত জানি না। কিন্তু গণিত না জানলেই বিজ্ঞান সম্পর্কে বা আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কথা বলা যাবে না এমন নয়। বস্তুতপক্ষে ছবি আঁকা বা কবিতার মতোই গণিত একটি ভাষা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্তার মূল বা আদিম কোনো স্তর বা ভিত্তিভূমি আছে কিনা তা খুঁজে দেখা। গণিতের অজুহাতে যারা বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তাঁরা নিজেদের মনে করেন 'সত্যে'র একচেটিয়া কারবারী, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের মূল অনুসন্ধান কী তা জানেন না, বা জানলেও তা গোপন করতে চান। এঁরা এক ধরনের পুরোহিততন্ত্র কায়েম করতে চান। আর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা ধ্যানধারণায় পেঁছিন তো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের দর্শন বা ফিলসফি অফ সায়েন্স বলে একটি বিষয় আছে, তা কি সরোজ জানে না? এ ছাড়া বহু বৈজ্ঞানিকই প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁদের বৈজ্ঞানিক ভাবনা ব্যক্ত করে গেছেন। এতে দোষের কী আছে? আইনস্টাইন, জীন্স হাইজেনবার্গ, শ্রয়ডিংগার সকলেই। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গণিত না-জেনেও বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখেছেন, এতে অপরাধের কী আছে; এমনকি এ শতাব্দীর একজন সেরা বৈজ্ঞানিক ইলিয়া প্রিগোজিন তো আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করে বলেছেন আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশই রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানবের ধারণা কিংবা অংশগ্রহণকারী বিশ্বভাবনার দিকে এগিয়ে চলেছে অথচ রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। আইনস্টাইনের একটি অপরিবর্তনীয়, অনড়, কালহীন অনন্ত সত্তার ভাবনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিবর্তমান অংশ-গ্রহণকারী বিশ্বমানবের ধারণাই আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কাছাকাছি।

নীলস বোরের সঙ্গে আইনস্টাইনের ভীষণ ঝগড়া নিয়ে সেদিন কথা হচ্ছিল সরোজের সঙ্গে। আইনস্টাইনের মতে ননলোকাল কানেকশন (বা অনৈসর্গিক যোগাযোগ) সত্য হলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স সত্য, আর তাহলে টেলিপ্যাথিও সত্য। নীলস বোর বলেছিলেন যে-দুটি কণিকা বহুদূরে থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে খবর পাঠাচ্ছে, তারা একই 'সমগ্র'র অংশ। তাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সত্য। ১৯৮২ সালে প্যারিসের একটি গবেষণাগারেও এটা প্রমাণিত হলো যে আইনস্টাইনের আপত্তি ভুল। নীলস বোরের কথাই ঠিক। কিন্তু এ সব তো বহু পুরনো কথা। সকলেই জানে। তবু সরোজ মানে না কেন?

লেখকের বক্তব্য

খুব সোজা ব্যাপার। সকলেই এবিষয়ে এখনো একমত নয়, এই জন্যই যে ওসব মানতে গেলে, টেলিপ্যাথি, ভগবান ও ক্রমে ভূত বা 'অলৌকিক' মানতে হয়। ওসব ছাড়াই যখন বিজ্ঞান এগোতে পারে, তখন আরো গবেষণা দরকার। পরীক্ষায় যা-ই প্রমাণিত হ'ক, ওসব না-মেনেও দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান দিব্যি এগোচ্ছে। বরঞ্চ অন্য কোনো তত্ত্ব বা পরীক্ষা দিয়ে যদি ওসব পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে তাই ভালো।

ইলেকট্রনের চরিত্র কিছুটা অনিশ্চিত, কিন্তু তার মানে ভূত ও ভগবান আছে, এমন কথা মানতে গেলেতো মহামুশকিল!

মনীশের নোটবুক

যাক! সরোজ তাহলে অনিশ্চয়তা মানে। বোঝে কি? আমি কি হিংসুক, সন্দেহপ্রবণ? সেদিন রুনু আমাকে তাই বলল। ওর চোখে মুখে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর প্রত্যাখান। আমি আয়নায় রোজ মুখ দেখি, সেকথা রুনুকে বললাম, বললাম 'জানি আমি কুৎসিত হয়ে গেছি, বয়সের ছাপ, বার্ধক্যের ছাপ আমার চেহারায়'। রুনু ক্ষমাহীনভাবে বলে, 'হ্যাঁ, তোমার চামড়া কুঁচকে গেছে, তুমি তা-ও আমার পেছনে পড়ে আছো কেন? তোমার লজ্জা করে না?'

আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। রুনুকে আমি চিনতে পারি না। নবীন ওদের অফিসে কাজ করে। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে দহরম মহরম আছে, সম্ভবত ওঁদেরই আত্মীয়। সেলসের লোক। অনেক টাকা, দেদার ঘুষ খায়, কোম্পানীর মাল জালিয়াতি ক'রে বাজারে বিক্রি করে, মেয়েছেলে-ও সরবরাহ করে খদ্দেরদের। হোন্ডা মোটরসাইকেল চেপে ঘুরে বেড়ায়, পেছনে রুনুকে চাপায়, আমি তা দেখেছি বেশ কয়েকবার। ঠিক হিংসায় নয়, অবিশ্বাস ও ঘৃণায় আমি কালো হ'য়ে গেছি। রুনু এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছোটভাইয়ের জন্য, ওদের অফিসে স্টেশনারী মাল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করেছে; প্রথম চোটে তিনটে শাড়ি, বিন্দি, চুড়ি, এছাড়াও আরো অনেক 'গিফ্‌ট' যেমন ঘড়ি দিয়েছে রুনুকে, রুনু অম্লানবদনে সব নিয়েছে। আমি প্রথমে ধরতে পারিনি কী হচ্ছে। চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর আমার সব টাকা যখন মজুমদার নামে এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে খোয়া গেল, তখন আমি রুনুকে বললাম, চলে যেতে, রুনু বলল, 'বললেই কি যাওয়া যায়?' আমি ফের বললাম, 'তুমি চলে যাও রুনু একসঙ্গে দুজনেই ডুবে লাভ নেই, ডুবন্ত লোক সামনে যাকে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে, তাতে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে রুনু, তুমি পারবে না।' কিন্তু রুনুর সেই এককথা, 'যেতে বললেই কি যাওয়া যায়?'

এরপর আমি বীরেনের পাল্লায় পড়লাম। কারও পাল্লায় বলা ভুল আসলে আমি নিজেরই এক মারাত্মক ভুলের পাল্লায় পড়লাম, হঠাৎ-ই আমার মাথায় এলো, আচ্ছা

রেসের মাঠ থেকে টাকা তোলা যায় না ? অনেকেই তো দেখি গোছা গোছা টাকা আনে, যেমন বীরেন। যদি ওর কাছ থেকে কিছু শেখা যায়। বীরেন অবশ্য আমায় বোঝালো, 'রেসের মাঠেও 'অংক' আছে। যদি অংকটা ঠিকভাবে শেখা যায় মনীশ, তাহলে তুমি আমার মতোই পারবে। এই যেমন ধরো ঘোড়ার ট্র্যাক রেকর্ড, পেডিগ্রি, হ্যান্ডিক্যাপ, বিশেষত হ্যান্ডিক্যাপটা ভীষণ জরুরি...' আমি ঐ সব বোঝায় মন দিলাম। কিন্তু টাকা কোথায় ? আমার হাতে তো টাকা নেই। এখান ওখান থেকে টাকা চেয়ে আনি, ধার করি। রুনুর বাবার পেটে ক্যান্সার। টার্মিনাল কেস, তার ওষুধ কেনার জন্য রুনু আমাকে সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দেয়। আমি ওষুধের দোকানে টাকা বাকি রেখে রেসের মাঠে গেলাম। হ্যাঁ বীরেনের কথামতো খেলে প্রথম চোটে বেশ কিছু টাকা হাতে এলো। আমি ওষুধের দোকানের ধার শোধ দিলাম, রুনুকেও বললাম। রুনু বলল, 'ওমা তাই নাকি ? তাহলে সকলে যে বলে ওখানে সবাই ফতুর হয়ে আসে।'

আমি-সদ্য বিজয়ীর গর্বে বলি, 'দূর ওসব বাজে কথা।' রুনু বলে, 'তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে চলো না' আমি এবার একটু মুশকিলে পড়ে যাই। বলি, 'না এখন না রুনু, আগে একটু ব্যাপারটা দেখে নিই।'

কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে গিয়েই আমি গণ্ডগোলে পড়ি। বেশ কিছু হেরে যাই। অবশ্য রুনুর বাবার ওষুধ আসতে থাকে, কিন্তু দোকানে বেশ কিছু টাকা বাকি পড়ে যায়। রুনুর মুখে অবিশ্বাসের সামান্য আভাস দেখি। তখনও ঠিক বুঝতে পারি না। রুনু এবার বোনাস পায়। বোনাসের প্রায় সব টাকা আমি মাঠে লাগাই, তখন আমার রোখ চেপে গেছে। কিন্তু সবই হারি। রুনুর মুখ কালো হয়ে যায়। আমি তখনো ভাবছি, একটা সামান্য ভুলের জন্যই এটা হলো। তখনো বুঝতে পারছি না, আমার নেশা হয়ে গেছে। ঐ সামান্য ভুল সকলেই করতে থাকে দিনের পর দিন। তারপর সর্বস্বান্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু তার আগেই রুনু আমাকে চরমপত্র দিল। একদিন বলল, 'রোজ রোজ তোমাকে আমি কোত্থেকে টাকা দেব বলত ?'

আমি তখন রোজই, রুনুর কাছ থেকে কিছু না কিছু টাকা নিই। বাড়ির জন্য, নিজের জন্য, এমন কি কোনো কোনোদিন আমার কাছে চা-খাওয়ার পয়সা-ও থাকে না! রুনু তখন প্রায়ই দেরি করে আসে, আমি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়ি। প্রায় ৩০ মিনিট কখনো ৪৫ মিনিট দেরি করে এসে রুনু থপ্ করে আমার হাতে দু-পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, 'ইস্ অনেক দেরি হয়ে গেছে', বলে চটপট একটা ফিরতি বাসে উঠে যায়। ভালো করে কথাও হয় না। একদিন ভীষণ মরীয়া হয়ে ওকে আমি বলি, 'তোমার রোজ রোজ এত দেরি হয় কেন রুনু। অফিসে কি এতই কাজ ?'

রুনু এবার তার বাঁকানো ঠোঁটে রহস্য ঢেলে বলে, 'না, অফিস না, নবীন আমাকে রোজ মোটর সাইকেল করে পৌঁছে দেয় তো। ওর সঙ্গে তাই একটু বসতে হয়। নইলে অভদ্র ভাববে।'

'নবীন কে ?' আমি একটু অবাক হয়ে বলি।

'ও তুমি চিনবে না। আমাদের অফিসে কাজ করে। ভীষণ ভালো। সকলকে ধার দেয়। কিন্তু কারও কাছ থেকে ফেরত নেয় না। অনেক টাকা তো—'

'মাড়োয়ারি ?' আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলি।

'না, ওরা ইউ. পি.-র লোক।' রুনু বলে, 'ওর চেহারা, কথা, সঙ্গ, এসব আমার খুব ভালো লাগে। ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু ? কই আগে বলনি তো ?'

'এই তো বললাম। আচ্ছা আজ চলি—' ব'লে টুক করে একটা বাসে উঠে চলে যায় রুনু। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

লেখকের বক্তব্য

আমি কিছুই মন্তব্য করতে চাই না। মনীশ, রুনুর সঙ্গে যা করেছে, তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কিনা তা পাঠকই বিচার করবেন। তবে এরপর মনীশের রুনুকে সন্দেহ করার অধিকার আছে কিনা এ বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্নে উঠবে। আমি রুনুর জায়গায় থাকলে বহুদিন আগে আরো নির্দয়ভাবে মনীশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, মনীশের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত রুনু তার কাছে ছিল, যখন একে একে সকলেই মনীশকে ছেড়ে গেছে। হয়ত এ-ই প্রেম। কিংবা এও হ'তে পারে রুনু ঠিক সুস্থ নয়, এটা তার এক মনোবিকার। ঠিক কী তা আমি জানি না।

অর্ফিউস, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, প্রেমিকার টাকায় রেসের মাঠ, ভণ্ডামীর একটা সীমা থাকা উচিত !

মনীশের নোটবুক

ইতিমধ্যে পুজো এসে গেছে। তার আগেই রুনুর বাবা মারা গেলেন। নবীন আর রুনু রোজই হাসপাতালে গেছে। আমি যেতে চেয়েছিলাম, রুনু আমাকে বারণ করেছিল। অবশ্য তখনো রুনুর বাবা মারা যাননি, তখনো তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কিন্তু, কোমায় বেশ কয়েকদিন থাকার পর, রুনু আমাকে হঠাৎই বলে, 'তুমি একদিনও দেখতে গেলে না ?'

আমি হাসপাতালে গেলাম, গিয়ে দেখি রুনুর বাবা তখনো কোমার ভিতরই আছেন। রুনু ব'সে আছে। কিছুক্ষণ পরেই সে বলে, 'এখুনি ভাই, মা, নবীন সকলেই আসবে—।' আমি তার ইঙ্গিত বুঝে উঠে পড়ি।

পরের দিন রুনুর বাসস্টপে আসার কথা। গিয়ে দেখি রুনু আসেনি। অফিসে ফোন করে জানতে পারি, সেদিনই রুনুর বাবা মারা গেছেন।

দু-সপ্তাহ পরে রুনুকে ফোন করি। সে প্রথমেই বলে, 'বাড়িতে এলে না কেন ?'

'বাড়িতে ?' আমি বলি, 'তুমি যে যেতে বারণ করেছিলে।'

'তা বলে এই সময়ে নয়। যাকগে কেন ডাকছ ?'

'তুমি আসবে না ?'

'ঠিক আছে যাব।' রুনু ফোন ছেড়ে দেয়।

নির্দিষ্ট দিনে রুনু আসে। ইতিমধ্যে কিছু টাকা জোগাড় ক'রে আমি ওষুধের দোকানের টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হাতে আর টাকা নেই। সেদিন রুনু এসেই অভিযোগ করে আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য। বাড়িতে যেতে যে রুনুই বারণ করেছিল, কেননা বাড়ির লোক আমার চেহারা ও বয়স দেখে ভয়ানক অপছন্দ করবে, এটা ওকে মনে করিয়ে দিলেও ওর রাগ কমে না। 'এমন কি ঘোষও এসেছিল,' সে বলে।

'ঘোষ ?' আমি আঁৎকে উঠি।

'হ্যাঁ, ঘোষ। পাগল হ'ক, বদমাইস হ'ক এসেছিলতো।' রুনু ক্ষমাহীনভাবে আমার দিকে তাকায়। 'তাহলে না-গিয়ে ভালোই করেছি। ও তোমাকে একটা চাকরির জন্য সেই ওয়াটসন কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে শুতে বলেছিল না ?' আমি ওকে মনে করিয়ে দিই।

'তার জন্য তো ক্ষমা চেয়েছিল বাবার কাছে। তাছাড়া এসময়ে যে কেউ এসে দাঁড়াতে পারে। একমাত্র তুমিই এলে না। আর নবীন যা করেছে তার তুলনা হয় না। ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি থেকে শুরু করে টাকার যখন যা দরকার হয়েছে— সত্যিকারের বন্ধু বলতে যা বোঝায়।'

'তাহলে তো ওর ঋণ সত্যিই তুমি শোধ দিতে পারবে না।' আমি বলি।

'তা ঠিক।' অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ে রুনু। সেদিন যে ও ৩০ মিনিট দেরি করে এসেছে আমি আর তা মনে করিয়ে দিই না।

এইভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে যায়। রুনু বোনাসের টাকা পায়। আমিই নবীনের জন্য শার্ট ও প্যান্টলেংথ পছন্দ করি, বাড়িতে নেমতন্ন করতে বলি। ইতিমধ্যে নবীন যে ওর যথার্থই বন্ধু তা-ও আমি বিশ্বাস করেছি। এদিকে আমার বাড়িভাড়া পাঁচমাসের বাকি, মুদির দোকানে ধার, (আর আমি মাঠে যাই না। ওদিনে বুঝে ফেলেছি, আমার আর কোনোদিনই ওদিকে যাওয়া উচিত না) ইলেকট্রিকের বিলও বেশ কয়েকটা বাকি পড়েছে, ডিসকানেকশান নোটিশ দিয়েছে, আমি মরীয়া হয়ে একদিন রুনুকে বলি, 'নবীনের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা ধার এনে দাও না, আমি কিছুদিনের মধ্যে শোধ দিয়ে দেব।' বলি এই ভরসায় যে খবরের কাগজে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ফিচার লিখেছি, কিন্তু টাকা পেতে এখনো মাস দুয়েক দেরি।

কিন্তু আমার কথা শুনেই গম্ভীর হয়ে যায় রুনু, তার কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে, সে বলে, 'ওতো এখন বাইরে চলে যাবে। দেখি ফিরে এলে যদি—।' আমি আর

কিছুই বলি না। তবে মাঝখানে একদিন রুনুর কাছে একশোটাকা চাই। রুনু হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে বলে, 'কী ভেবেছো তুমি, আমি কি কল্পতরু? বাড়ির লোক থেকে শুরু করে তোমরা সকলেই শুধু আমার কাছে টাকা চাও?'

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে কালো হয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করি রুনুর মুখ ঘৃণায় কুঁচকে গেছে। আর কিছুই বলি না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এক শনিবার হঠাৎ রুনু বলে, 'না, আজ যেতে পারব না। নবীন লাঞ্চে নেমতন্ন করেছে।' 'সে কি! কোথায়?' আমি বলি। উত্তরে একটা কুখ্যাত পাড়ার বার-এর নাম করে রুনু। আমি ওকে বলি, 'না, ওখানে লাঞ্চে যেও না রুনু।' 'কেন যাব না?' রুনু টেলিফোনেই প্রশ্ন করে, 'তোমার সঙ্গে গেলেই শুধু চা খাওয়া আর কথা বলা। আমি 'ফেড্‌আপ', রুনুর মুখে 'ফেড্‌আপ' শুনে আমি সত্যিই স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওকে আসতে বলি। সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করি ওর কাছ থেকে একপয়সাও নেব না। যে করেই হ'ক আমাকে টাকা জোগাড় করতে হবে।

পরের বৃহস্পতিবার আমি টাকা ধার ক'রে ওকে সিনেমায় নিয়ে যাই। সেখানে রুনুই অন্ধকারে আমার হতে ধ'রে আমাকে আদর করতে বলে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে আমার হাত বুকে চেপে ধরে রাখে ও। কিন্তু তারপরই রাস্তায় বেরিয়ে এসে বাসে চাপার আগে বলে 'শনিবার ফোন ক'রে এসো।'

'কেন ফোন করার কী দরকার?'

'না ফোন ক'রে এসো।' ও জেদী গলায় বলে।

'না ফোন করব না।' আমিও জেদ ধরে বসি। ইতিমধ্যে বাস এসে যায়। রুনু চলে যায়। মাঝখানে ক'দিন আমি আর ফোন করি না। শনিবার নির্দিষ্ট বাসস্টপে যখন ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়েও রুনু আসে না, তখন বুঝি কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। আরো আধঘণ্টা দাঁড়াই, রুনু তবু আসে না। শেষে, রাত্রে ওদের বাড়ি চলে যাই। আটটার সময়ও রুনু আসে না। অথচ ওদের ছুটি হয়েছে আড়াইটায়। শেষকালে রুনু আসে, এসেই খাটে শুয়ে পড়ে। ওকে দেখেই আমার মনে হয় সামান্য মাতাল। 'রুনু', আমি বলি, 'এত দেরি হল যে, আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে যে—'

'আমাকে নিশ্চয়ই খারাপ মেয়ে ভাবছ', হঠাৎ রুনু ছলছল আরক্ত চোখে তাকায়, বলে, 'নবীন আর আমি আজ বেলাদিদের খেতে বলেছিলাম ব্লু মুন-এ'

'সেইজন্য আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে!'

'কী করব? উপায় ছিল না। আজই ছোটুর সাপ্লাই অর্ডারের সার্কুলার বেরিয়েছে অফিসে। ওর ব্যবসাটা হবে। নবীন করে দিয়েছে।' সে হাসে

'সাপ্লাই অর্ডার!' আমি স্তম্ভিত হ'য়ে বলি, 'জনঅরণ্য দেখনি? এসব অর্ডারের জন্য কী দিতে হয় তা জানো না?'

'কিছু না, কিছু না।' গায়ের আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে রুনু বলে, 'শুধু নবীনের

মোটরসাইকেলে চেপে ঘুরলে আর ওর সঙ্গে রেস্তরাঁয় খেলেই ও খুশি। তার চেয়ে বেশি কিছু ও চায় না। কিন্তু সত্যিই আমি দুঃখিত মনীশ। তোমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, ফোন করলে না কেন? তাহলেই গণ্ডগোল হ'ত না।

আমি এরপর বেরিয়ে আসি। অসহ্য অপমানে আমি তখন অসাড় হয়ে গেছি, গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলা যায় এখান থেকেই। কিন্তু কাকে দোষ দেব? সবচেয়ে বড় দোষী তো আমি-ই। হ্যাঁ, আমিই দোষী!

লেখকের বক্তব্য

যাক, মনীশ যে দোষ স্বীকার করেছে এতে তার অপরাধ না-কমলেও অন্তত নিজের কাছে কিছুটা হাল্কা বোধ সে করতে পারে। কিন্তু যার চরিত্রে এই ধরনের দোষ, এই ধরনের দায়িত্বহীন যে, তার জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করার অধিকার যে নেই, এটা পরিষ্কার। এবার বুঝতে পারছি, কেন কারও সম্পর্কেই তার কোনো অভিযোগ ছিল না। অভিযোগ করার যোগ্যতাই, মনীশের ছিল না।

মনীশের নোটবুক

আমার হাতে যে-পরিমাণ কাদা লেগে আছে, তাতে অন্যকে পরিষ্কার করতে চাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, অধিকারও নেই। নিজের ভেতর যে-অন্ধকার, যে-কাদা আমি লক্ষ্য করি, যা মাঝে মাঝে আমাকে পিষে থেঁৎলে ফেলতে চায়, তাকে আমি এড়িয়ে যেতে চাই না। আজ বুঝি পাপ ও দোষ কাকে বলে, রুনুর বিরুদ্ধে আজ আর তাই আমার কোনো অভিযোগ নেই। যদিও রুনুকে আমি ১লা বৈশাখের পরের দিন কাদায় ডুবিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেদিন আমি সত্যিই মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছি, ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছি সারাক্ষণ! কিন্তু তার আগে আরেকদিনের কথা বলে নিতে হবে যেদিন আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাবে ব'লে রুনু টাকা নিয়ে এসেছিল ধার ক'রে, আর সেটাকা আমি রেসের মাঠে লাগিয়ে হেরে যাই। কী ভয়ানক মর্মান্তিক লেগেছিল সেদিন রুনুর গলা 'তুমি যাবে না?' সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, আমি তার সঙ্গে সারাদিন একা একটা ঘরে না-থেকে চলে যাব রেসের মাঠে— একথা সে বিশ্বাস করবে কি ক'রে? আজ অবশ্য আমার নিজের কাছেই এটা অবিশ্বাস্য লাগে, কিন্তু সেদিন পেরেছিলাম। একবার নয়, বারদুয়েক। বোধহয় সেদিন থেকেই রুনু আমার কাছ থেকে স'রে যায়, ঘৃণা করতে শুরু করে আমাকে। স্বাভাবিক। এরপর রুনুর দেয়া সমস্ত অপমানই আমার প্রাপ্য। এরপর ১লা বৈশাখের কথা আমি বলতে পারি। সেদিন আমার যাওয়ার কথা ছিল না। তার আগের দিনই আমি রুনুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি। একটু রাত হ'য়ে গেছিল, রুনু আমাকে থেকেও যেতে বলেছিল রাত্রে, কিন্তু থাকিনি।

থাকিনি বলেই পরের দিন আবার গেলাম বেলা ৩টে নাগাদ। ওদের গলির মুখে পা দিতেই দেখি একটা নীল প্রাইভেট কার, নম্বর দেখে বুঝলাম রেন্টাল কার। গাড়ি থেকে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক নামল, তার একহাতে শাড়ির প্যাকেট, অন্যহাতে মিষ্টির প্যাকেট সেলোফেনে মোড়া। আমার কিছুটা আগে বেশ বড় বড় পা ফেলে হেঁটে গেল লোকটি। আমিও তার পেছনে হেঁটে রুনুদের বাড়িতে পেঁছে দেখি সে-ও ঢুকছে। এবার আমি বুঝলাম, এই নবীন। লোকটি ঢুকল সামনের বৈঠকখানায়, আমি পাশের ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই রুনু বেরিয়ে এল, পরনে হাউসকোট। আমাকে পাশের ঘরে বসতে বলে সে চলে গেল বৈঠকখানায়, একটু পরেই খুশির হুল্লোড়, ও তারপরেই কিছুটা নিচু গলার ফিশফিশ, টিভি ছেড়ে দিয়ে নিচু গলায় কথা বলার ধরণ শুনে বুঝতে পারলাম কিছু একটা পরামর্শ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে রুনুর ছোটভাই প্যাণ্টজামা পরে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে মনে হল লোকটিও বেরিয়ে গেল। আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল রুনু, তারপর বলল, 'নবীন বরানগর গেল ওর বন্ধুদের কাছে। বেশ চটে গেছে।'

'কেন?' আমি একটু কৌতূহলী হয়ে বলি।

'ভেবেছে আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম। অথচ আমি জানতামই না তুমি আজ আসবে।'

'আমি তো আসতেই পারি।'

'ঠিক আছে, মিষ্টি খাবে? এই যে নবীন এনেছে।'

'না, খাব না।' আমি বলি, 'তোমার জন্য শাড়ি এনেছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। আনলেই আজ পরব, এমন মানে নেই।'

'তুমি পয়লা বৈশাখে নতুন শাড়ি পর বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'কই আমাকে বলনিতো।'

'এ আর বলার কী আছে?' রুনু হাই তোলে। সে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর একটা প্লেটে গোটা দুয়েক রসগোল্লা এনে বলে, 'নাও খেয়ে নাও।' পয়লা বৈশাখের দিন মিষ্টিমুখ করাই নিয়ম।' আমি খাই। এরপর হঠাৎ আমার কাছ থেকে উঠে কিছুটা দূরে গিয়ে বসে রুনু, বাইরের দিকে ইংগিত করে বলে, 'মা ভীষণ চটে গেছে, তোমার কাছে বসেছিলাম বলে।'

'সে কী! মা চটবেন কেন?'

'ঐ রকমই। মার মেজাজ হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়।'

এবার রুনুর ছোটভাই বাইরে থেকে রুনুকে ডাকে। রুনু বেরিয়ে যায়, কথা বলে। তারপর ঘরের ভেতরে ফিরে এসে হঠাৎ বলে আমাকে 'নবীন ফিরে এসেছে। কিন্তু কিছুতেই এখানে আসতে চাইছে না মোড়ের চায়ের দোকানে বসে আছে, কী মুশকিল বলতো?'

'কেন কী হলো ?'

'বলছে তুমি থাকলে ও আসতে পারবে না।'

এবার হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসাড় হয়ে যায় আমার। আমি কোনমতে টলতে-টলতে উঠে পড়ি, মুহূর্তের মধ্যে রুনুকে আমার এক ঝানু বেশ্যা বলে মনে হয়, আমি আস্তে আস্তে বলি, 'আমি এখন না গেলে কি তোমার চাকরি কিংবা ভাইয়ের ব্যবসার ক্ষতি হবে ?'

'না চাকরির কিছু হবে না', রুনু ভাবলেশহীন মুখে বলে। 'কিন্তু ভাইয়ের ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।'

'আমি তাহলে চলি।'

প্রায় টলতে টলতেই বেরিয়ে আসি আমি। বলা যেতে পারে এক অমানুষিক আঘাতে তখন আমার হাঁটারও শক্তি প্রায় নেই। কোনোমতে পা টেনে টেনে, মাথা নিচু করে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় হাঁটতে থাকি আমি। আমার কেবলই মনে হয় বেশ্যার সঙ্গে প্রেম সম্ভব, কিন্তু প্রেমিকা যদি বেশ্যায় পাল্টে যায়, তাহলে কী হতে পারে, তা আমার জানা নেই। সেই মুহূর্তে আমি রুনুকে ঘৃণা করি, এমন অমানুষিক ঘৃণা আমি আর কাউকে কখনো করিনি।

যতবার এ ঘটনার পর আমি রুনুকে প্রশ্ন করেছি, সে দিন আমি চলে আসার পর সে কী করেছিল, ততবারই তার পরস্পরবিরোধী কিংবা ভাসাভাসা উত্তর দিয়েছে সে। ফলে আমি যা ভেবেছি তা সত্য হলে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। অথচ তা স্বাভাবিক ছিল। পরের দিন রুনুকে আমি বেশ্যা বলে গাল দিই, ক্ষমা চাই। আবার গাল দিই। ক্ষমা চাই। এরকমই এখন হয়ে আসছে অনেকদিন। দুবার আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম, পারিনি, দুবারই ফিরে এসেছি। তৃতীয় বারের জন্য এবার আমি হয়ত ভেতর ভেতর প্রস্তুত হচ্ছি। হয়ত আবার পারব না। অথচ আশ্চর্য রুনু এখনো আমাকে শারীরিকভাবে চায়। নবীনের সঙ্গে যে ওর কোন শারীরিক সম্পর্ক নেই, তা ও বারবার আমাকে বলেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, আজো করি না। এটাও ও জানে। আমি মাঝে মাঝে জঘন্য ভাষায় ওকে গালাগাল দিই। ও মাথা নিচু করে শোনে, কখনো কখনো কাঁদে, কখনো কখনো তীব্র ঝাঁঝালো উত্তর দেয়। আমাকে পরিষ্কারই বলেছে 'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার জন্যই আমি নবীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।'

'কিন্তু কেন ?'

'তুমি আমাকে ওর কাছ থেকে টাকা ধার করতে বলেছিলে—'

'আর ?'

'তুমি বাবার ওষুধের টাকা দিয়ে রেস খেলেছো।'

'আর ?'

'তুমি আমার বোনাসের সব টাকা দিয়ে রেস খেলেছো।'

'আর ?'

'ব্যাস্ এই', বলে সে হাসে। কিন্তু বলে না যে 'এই কি যথেষ্ট নয় ?'

আমি মাথা নিচু করে থাকি। আমার কিছুই বলার নেই। আমি যে মূর্তি বানিয়েছিলাম, সে মূর্তি নিজেই ভেঙেছি, এখন সে কদাকার হয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করলে কী হবে ? কেন আমার এখন এমন ক্ষমতা নেই ঈশ্বর, যে রুনুর সমস্ত দায়িত্ব আমি নিই ? সে তো তাই চায়, সে তো তা-ই চায়।

মৃত্যুর আগে ওকে আমি সুখী দেখতে চাই। আমি ওর ক্ষতি করেছি, যদি ওর ক্ষতি হয়ে থাকে, কিংবা বলা ভালো নিজের ক্ষতি করে ও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি-ই তার জন্য দায়ী। কিন্তু ও আমাকে এখনও ছেড়ে যায়নি।

আমি জানি না কী করব ! মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া মরণোন্মুখের আর কী করার আছে।

লেখকের বক্তব্য

মনীশের এই দীর্ঘ স্বীকারোক্তির পর তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়ত মুশকিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, তার চরিত্রের ভিতর এমন কিছু আছে কিনা, যা তাকে অনিবার্যভাবে এক ভুল থেকে আরেক ভুলের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। বলা যেতে পারে সমস্ত ভুল ও দোষের একেবারে তলায় গিয়ে ভেতর থেকে তাদের দেখার প্রবণতা যে লেখকের পক্ষে অনিবার্য তা আমি মনে করি না। সে যে অন্ধকারের জীব তাতো নয়, তবু টমাস মান যে লেখককে 'মানুষের' চেয়ে 'জীব' বলার বেশি পক্ষপাতী তা আমি জানি। মনীশকে ঠিক প্রতারক বলা যাবে কিনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু নিজের সম্পর্কে যে সে শেষপর্যন্ত কিছুটা নির্দয় হতে পেরেছে, এতে অন্তত আমি কিছুটা হাল্কা বোধ করছি। এরকম লোকের স্বপক্ষে বলার লোক নেই। কিন্তু সে যদি নিজেই নিজের বিপক্ষে বলে তাহলে অন্তত তার কাজের সঙ্গে কথার একটা সামঞ্জস্য থাকে। অতএব মনীশের আত্মবিরোধিতা যে তার নিজেরই নিজেকে দেখার একটা ধরণ, একথা আমি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে তাঁদের সতর্ক থাকতে বলব যেন তাঁরা অকারণ সহানুভূতির খপ্পরে না-পড়েন। তবু যদি তাদের কারও সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তাহলে তাঁদের লক্ষ্য করতে বলব, মনীশ ঠিক কোন জায়গায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব বা শূন্য করে দিয়ে সেখানে কী তৈরি করতে চেয়েছিল।

মনীশের নোটবুক

মানুষকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অথচ একের পর এক (শুধু রুনুর নয়) সম্পর্ক, লক্ষ্য করছি, হাতের মধ্য দিয়ে জল বা বালির মতো গড়িয়ে চলে যায়। শেষপর্যন্ত

থাকে না। কেবল চারপাশে যে গাছ, ঘাস, নুড়ি, পাথর, জল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বা বয়ে চলেছে, সেখান থেকে কোনো সংকেত আসছে কিনা লক্ষ্য করতে চাই। মনে হয় ঐ অসীম নৈঃশব্দ্যের জগতে এমন কোনো ভাষা আছে যা পড়তে পারছি না, একবার পড়তে পারলে, আমিও শিকড়ের মতো চলে যেতে পারব ভূগর্ভের অন্ধকারে, ফুলের বা ডালপালার মতো অগ্রাহ্য করতে পারব মহাকর্ষের টান, জলের মতো প্রতিমুহূর্তে নিজেকে পাল্টে ফেলে বয়ে যেতে পারব, হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারব ঝরা পাতার রাশি, আর ঝরা পাতার মতোই স্বেচ্ছায় ভেসে যেতে পারব নিজের পরিণাম লক্ষ্য করে হাওয়ায়।

শুধু একবার যদি ততদূর স্তব্ধ হয়ে যেতে পারি যতদূর হ'লে আমার ভিতর ফুটে উঠবে সেই ভাষা যা আমি নিজে, যা আমার সম্পূর্ণ জীবন অথচ যা বহুদিন ব্যবহার করিনি বলে এতদিন ভেবেছি ভুলে গেছি। □

কৃষ্ণগোপাল মল্লিক

গোলদীঘির এইখানটা

না-পাম, না-তাল, না-খেজুর তিনটে গাছ ঠিক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর— না, যেন বড়ো-মেজো-সেজো। আর এদের কোলেই গোলদীঘির এইখানটা, যার উত্তর সীমানার মার্কা BAPTIST MISSION-এর B, আর দক্ষিণ সীমানার মার্কা HEADMASTERS ASSOCIATION-এর N। একটা ব্যাডমিন্টন কোর্টের চেয়ে সামান্য বড়ো এইখানটার উত্তরে তিনটে গাছের পাহারা আর দক্ষিণে বাধার নিরেট প্রাচীর যাতে হাত আর কাস্তে হাতুড়ি পাশাপাশি বছরের পর বছর উঁচিয়ে থাকে।

অথচ এই পাহারা আর বাধার মাঝখানেই কি বিপুল মুক্তি, অসীম আনন্দ, অনন্ত উদ্ধার !

ধরা যাক গাছগুলো তাল ; তাহলে তাদের পাতা হলো তালপাতা ; আর এরা হলো এইখানটার তালপাতার পাঁজি— পাতায় পাতায় লেখা আছে এইখানটার কখন কী, কবে কী। এমন কি পাঁচ দশ বিশ বছর আগে এইখানটার কখন কী, কবে কী— তাও খুঁজে পাওয়া যাবে এই তালপাতার ইয়ার-বুকে। দেখতে চাও তো এসো পূর্ণিমার নিশুতি রাতে যখন মাথার ওপর আস্ত একখানা গোল চাঁদের আলোয়— রুপোর পাতের মতো চিকণ পাতায় পাতায় তুমি সমস্তই পড়তে পারবে। পাতা খোলো। কী বেরোলো ?

আষাঢ় মাস ? তখন দেখা যাচ্ছে এইখানটায় যতো রাজ্যের ঢিল ঢেলা রাবিশ জঞ্জাল, খোঁচা খোঁচা খাপছাড়া ঘাস আর মানুষ আর কুকুরের টাটকা-বাসি গুয়ের ডেলা, পুব আর দক্ষিণ দিক জুড়ে পেচ্ছাপের ডোবা। ভালো লাগছে না ? বেশ, আবার পাতা ওল্টাও।

কী বেরোলো ? চৈত্র মাস ? তবে তো উটপাখির মতো পিচ-গলানো গাড়ি আর কাতারে কাতারে পিচের ড্রাম। দশ-বিশটা নয়, দেড়শো-আড়াইশো। তার মধ্যে আবার তেরোটা ফুটো— কালো থকথকে পিচ রোদে তেতে গলে গদগদ করে গড়াচ্ছে— টের পাওয়া যাবে না এমন চুপি চুপি গড়ায় ওরা। দ্যাখো না, গড়াতে গড়াতে ধরেও ফেলেছে একটা অন্যমনস্ক শুয়ে থাকা খয়েরী রোঁয়াওলা মোটাসোটা নেড়ীকুত্তাকে। ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে দেখে উঠতে পারছে না, পিঠে কী যেন কামড়ে ধরেছে। জোর করে লেজ মাথা নেড়ে ঝাঁকিয়ে উঠতে গিয়ে কান আর লেজও আটকে গেল। তারপর ডিগবাজি খেয়ে উঠতে গিয়ে, ব্যাস, পা-ও জ্যাম। আর মওকা পেয়ে পিচ চার হাত বাড়িয়ে কুত্তাকে

আদরে সোহাগে ধরলে— কুত্তা যতোই চিল্লে মরুক, পিচ নাছোড়বান্দা। তারপর সে অ-নে-ক কান্ড— পিচের থেকে পাজি পাড়ার ছোঁড়ারা— সে আর কী শুনবে— দেখতেই তো পাচ্ছো মেডিকেল থেকে অ্যাসিডে ধোলাই হয়ে এসে কেমন দিব্যি ব্ল্যাক-অ্যান্ড-ব্রাউন ক্যালকেশিয়ানটি হয়ে পাঁঠার দোকানের সামনে কচিপাঁঠার শিং চিবোচ্ছে।

চলো, চলো, দেখবে চলো ছেলেটা কেমন খোলা পিচের ড্রামে একটা আধলা-ইঁট ফেলে একমনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে কতক্ষণে ইঁটটা পুরো ডুবে যায়। এ ছেলে নিশ্চয়ই পরে বৈজ্ঞানিক কিংবা কবি হবে। আর ঐ যে দেখছো মেয়েটা ভাঙা খুন্তি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পিচ মাটির সরায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে বাড়িতে ফুটো বালতি সারাবে বলে— ও বড়ো হয়ে নির্ঘাৎ চোর হবে।

যাঃ পিচের ড্রাম গেল কোথায় ?! সব ফাঁকা— বিলকুল। তবে, তাহলে ?

তাহলে আর কী! তালপাতার পুঁথির বারমাস্যায় দেখে নাও কবে আসবে বাঁশের তেকোণা মানুষ-সমান কেয়ারি যা তোমাদের ফুটপাথে ফুটপাথে বনমহোৎসবে লাগানো নিম-অশোক-কৃষ্ণচূড়ার চারাগুলোকে বাঁচাবে। 'আসবে' বলা ভুল হলো ; ওরা এখানেই জন্মাবে। প্রথমে আসবে ঠেলা-বোঝাই সবুজ নরম বাঁশ, তারপর দা-কুড়ুল হাতে কারিগর, তারপর তার পেরেক, তারপর জাল। সকাল দুপুর বিকেল ধরে চলবে দুটো কি তিনটে কারিগরের খুটখাট ঠুকঠাক। গাছের ছায়ায় বসে একটু একটু করে কাজ করবে আর পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে একটা একটা বিড়ি খাবে, আবার কাজ করবে, আবার বিড়ি খাবে। মনে হবে যেন এরা একমনে তাজমহল গড়ছে। হয়তো ওদের কাছে তাই-ই। তবে কদিন পরে দেখবে দুটো চারটে করে একসময় গোলদীঘির এইখানটায় সারি সারি দাঁড়িয়ে গেল ফর্সা ফর্সা টাটকা বাঁশের চকচকে জাল ঘেরা তেকোণা কেয়ারি। কালো কালো গোবদা গোবদা পিচের ড্রামগুলো যেমন বিতিকিচ্ছিরি, এগুলো তেমনি ফাইন— এতগুলো একজায়গায় ভিড় করে রয়েছে অথচ মনে হবে যেন কিছুই নেই।

তারপর সত্যিই একদিন কিছুই নেই। স-ব হাওয়া। কখন যে কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ি সাফসুতরো হয়ে এসে কেয়ারিগুলোকে গায়েব করলে টেরই পাওয়া গেল না।

গোলদীঘির এইখানটা আবার ফাঁকা। পড়ে রইলো শুধু বাঁশের কয়েকটা এবড়ো-খেবড়ো গাঁট আর মচকানো তলতার টুকরো।

কিন্তু ফাঁকা কদিনই বা! কালও বিকেলে বেড়াতে এসে তুমি ঐ ফাঁকায় সন্ধের ঝোঁকে হিসি করে গেছিলে না ? আজ দ্যাখো বালির পাহাড়। একটা নয়, তিন চারটে। আর সেই সংগে দুটো লাল লাল খোয়ার আর কালো কালো গিটির মালভূমি। মাঝে-মাঝে উপত্যকা। আর যে-যার কাজে লেগে গেছে। দশ-বারোরা পর্বতাভিযান শুরু করে দিয়েছে আর মালভূমি-টু-মালভূমি লংজাম্প। ঐ দ্যাখো ঐ দ্যাখো বালির পাহাড়ের নিচে বসে ক্ষুদে রাজা কেমন দিব্যি তার দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে। আর,

মেয়েদুটো দুদিক থেকে কেমন একটু একটু করে খুঁড়ে খুঁড়ে এগোচ্ছে টানেল বানাতে বানাতে— বোধহয় ওই টানেল দিয়ে ওদের দেশলাই বাক্সর রেলগাড়ি চলবে।

দাঁড়িয়ে পড়লে তো জলের দিকে পেছন করে রেলিং-এ পিঠ দিয়ে। দাঁড়াও দাঁড়াও ; দ্যাখো দ্যাখো। দেখতেই হবে তোমায় গোলদীঘির এইখানটা।

দেখতে দেখতে বর্ষা এসে পড়লো। গোলদীঘির সবচেয়ে উঁচু গাছদুটো— একটা পাম আরেকটা দেবদারু— পাল্লা দিয়ে মেঘ ধরতে বেড়ে চলেছে। মেঘও ধরা দিয়েছে। মেঘ একেবারে ঝুঁকে রয়েছে গাছের মাথায়, আর তিনদিন নাগাড়ে ঝমঝম ঝমঝম। পুকুর ভরলো, পাড় ডুবলো, রাস্তায় থৈ থৈ এক কোমর জল, বার-ভেতর সব একাকার, গোলদীঘির মাছ বঙ্কিম চ্যাটার্জী আর মির্জাপুর দিয়ে খেলে বেড়াতে লাগলো— আর, গোলদীঘির এইখানটা জলের তলায় জিরোতে লাগলো।··· বৃষ্টি ধরলো একসময়, জল নামলো, গু-মুত জঞ্জাল সব ধুয়ে সাফ ; প্রথমে চিটচিটে তারপর ঝকঝকে আঙিনা বেরিয়ে পড়লো।

কদিন পরই স্যান্সক্রট স্কুল থেকে গোলদীঘি দিয়ে দুপুরে টিফিন খেতে এসে নীচ থেকেই ভোঁদর চেঁচিয়ে উঠলো "বাপস্, বাপস্, খুঁটি এসে গ্যাছে। সত্যি গো, আমি দেখে এলুম খুঁটি এসে গেছে।" "খুঁটি এসে গেছে ?!" বলেই ছুটলুম ছাতে। হ্যাঁ সত্যিই তো, খুঁটি এসে গেছে। লরি থেকে একটা একটা শালকাঠের লম্বা লম্বা খুঁটি নামিয়ে রাখছে পুকুরের রেলিং-এর ধারে। তাহলে আর দেরি নেই !! ছুটে নেমে গেলুম একতলায় প্রেসে। গোপীবাবু কাবাস ঢুলতে ঢুলতে কম্পোজ করছিল, চেঁচিয়ে উঠলুম "অ গোপীবাবু, অ কাবাস, হাত চালাও, হাত চালাও, গোলদীঘিতে খুঁটি এসে গেল যে ! 'কৌরব'-এর এখনো যে ছ' ফর্মা বাকি, 'অভিমান'-এর চার ফর্মা ! খুঁটি এসে গেলো, আর পুজোসংখ্যাগুলো বের করবো কবে !" আবার দোতলায় ছুটে এসে বউকে বলি "ভাগি, অ ভাগি পুজোর আর কতো দেওয়া বাকি বলো তো ? তুমি তো বলেছিলে এবার পুজো খরচা আড়াই হাজার লাগবে। কতটা দিয়েছি তোমাকে ? অ্যাঁ, এখনও আটশো বাকি ! আর এদিকে খুঁটি এসে গেল !! উঃ কী করে যে ম্যানেজ করবো··· !" বিকেলে আর-জি-কর থেকে ক্লাশ করে হাজিরা দিতে আসতেই সিঁড়ির মুখেই ঘোষণা করি "ভুটান, খুঁটি এসে গেছে— আরে হ্যাঁ গোলদীঘির প্যান্ডেলের খুঁটি এসে গেছে।"

তারপর গোলদীঘির এইখানটা আস্তে আস্তে রবীন্দ্রসদন হয়ে গেলো কিংবা অকাল তখত্ স্বর্ণমন্দির। সদন ? হ্যাঁ সদনই তো— আনন্দ সদন। মন্দির ? হ্যাঁ মন্দিরই তো— দুর্গা মন্দির। একমাস ধরে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে রাত্তির কেউ না কেউ হাঁ করে মুখ উঁচু করে দাঁড়িয়ে দেখছে চাঁদোয়া কী চেহারা নিচ্ছে, ঝাড় কীভাবে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে ওপরে উঠবে।··· তারপর একদিন মাঝরাত্তির দুটো / তিনটের সময় হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে যে যার জায়গায় উঠে পড়লো রমেশ পালের মা-ছেলে-মেয়েরা।

তুমি তো গোলদীঘির এইখানটায় নিশ্চয়ই এসেছো। ভিড়ের ঠেলায় তুমি দাঁড়াবার ফুরসৎই পাওনি। হাত জোড় করে বুকের কাছে ধরাই ছিল, যথাস্থানে একবার ঠক্ করে কপালে ঠুকেও দিলে— কিন্তু ঢোকা থেকে বেরোনো পর্যন্ত তুমি হাঁ করে চোখ কপালে তুলে ঘাড় কাৎ করে দেখে গেলে কল্কার বাহার ঝাড়ের বাহার আয়নার ঝিকিমিকি। বেরিয়ে তোমার হুঁশ হলো ঠাকুর দেখাই হয়নি। পেছন ফিরে দেখতে গিয়েও তোমার দেখা হলো না— পেছনের চাপে তুমি দুর্গা থেকে দূরে আরও দূরে সরে যেতে লাগলে— কানে শুধু শুনতে পাচ্ছো মাইক চেঁচাচ্ছে "মণ্ডপের মধ্যে অযথা ঠেলাঠেলি করবেন না, অযথা দাঁড়িয়ে থাকবেন না, পিছনের অগণিত দর্শনার্থীদের মাতৃদর্শনের সুযোগ করে দিন…।

এইখানটা খালি করে একদিন তেনারা লরী আর ট্রলি চেপে চলে গেলেন। ঘরের মধ্যে ঘরে পেঁচা নিয়ে একরাত্তিরের জন্যে তিনি এলেন এবং পরদিন চলেও গেলেন— অবশ্য যদি না সেবারের মতো সত্যি পেঁচা এসে পড়ে।

মনে নেই তোমার! তুমি তো তখন তত ছোট নও যে মনে থাকবে না। এই তো ক'বছর আগের কথা। নবমীর দিন যেদিন প্যান্ডেল ধু ধু হলো অথচ প্রতিমার গায়ে একটু আঁচ লাগলো না, একফোঁটা জল লাগলো না—সেবার নয়। তারই লাগোয়া লাগোয়া একবার। মনে পড়ছে না— সেই যে কোজাগরীর সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ দেখা গেল এক লক্ষ্মীর দুই পেঁচা! কী ব্যাপার কী ব্যাপার! চোখে দেখার ভুল! দু-চারজন করে লোক জমতে লাগলো— সবাই দেখলে লক্ষ্মীর পেঁচার পাশে আর একটা পেঁচা। এবং একটু পরেই বোঝা গেল সেটা চোখ পিটপিট করছে আর হৈ চৈ বাড়লেই লক্ষ্মীঠাকুরের পেছনে ঘাপটি মারছে। ব্যাস, গ্রামে গ্রামে সেইবার্তা রটি গেল ক্রমে। পাড়া থেকে পাড়া, উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা, খবরের কাগজ মারফৎ জেলায় জেলায়। লক্ষ্মী প্যান্ডেলে অলটাইম রেকর্ড ভিড়, লক্ষ্মীমায়ের বাসি থাকার অলটাইম রেকর্ড! আলোটালো গোলদীঘির চারপাশ থেকে গাছপালা থেকে খোলা হয়ে গেছিল, আবার লাগানো হলো, মাইক সেই দুর্গা ভাসানের দিনই সরে গেছিল সেগুলো আবার ফিরে এল। সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে রাত শোনা যেতে লাগলো— "আস্তে…আস্তে…আপনারা আস্তে আস্তে এগোন…চেঁচামেচি করবেন না…খুব বেশি আঙুল দেখাবেন না— পেঁচা চমকে যাবে, পেঁচা পালিয়ে যাবে, পালিয়ে গেলে আপনার পিছনের অগণিত দর্শক এবং বাংলা তথা ভারতের দূর প্রান্ত থেকে যাঁরা রওনা হয়েও এখনও পৌঁছতে পারেননি তাঁরা পেঁচা দর্শনে বঞ্চিত হবেন। আপনারা ধীরে ধীরে পেঁচা দেখে চুপচাপ বেরিয়ে যান। সামনে এগোন, সামনে এগোন।"

সত্যিই অবাক করা কাণ্ড। ক'দিন নাগাড়ে সত্যি পেঁচা মাটির পেঁচার সংগে ভাব করার জন্যে তার গায়ে গা লাগিয়ে ঠায় বসে রইল। যেন পোষা পেঁচা। এমনকি পুরুতমশাই ভরসা করে যখন তার কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিলেন, সেও আহ্লাদে

গদগদ হয়ে টিপ পরে নিলে। মধ্যে মধ্যে সকলের মাথার ওপর দিয়ে হুশ করে উড়ে বেরিয়ে যেতো— অমনি গেল গেল রব, হুলুস্থুলু— কিন্তু আবার খানিকপরে সেইরকমই হুশ্ করে ঢুকে পড়ে আবার পেঁচার পাশে পেঁচা বসে পড়তো।

যতই তাক্ লাগুক, কালীপুজোওলাদের মাথায় হাত। প্যান্ডেল খোলা যাচ্ছে না অথচ দেওয়ালী গুটি গুটি এসে গেল বলে। যাই হোক সেবার যথাসময়েই যথাবিহিত কালীপুজো হয়েছিল।

কালীপুজো! এই কালীপুজো। সম্মিলিত সার্বজনীন শ্রীশ্রীকালীপুজা, কলেজ স্কোয়ার। অর্থাৎ আবার এলে গোলদীঘির এইখানটায় তুমি।

কোজাগরী থেকে দেওয়ালী মাত্র পনেরো দিন। চব্বিশ ঘণ্টা কাজ চলে স্বর্ণমন্দির নামানো হলো এবং আকাশবাণী ভবন উঠে দাঁড়ালো। পশ্চিমমুখো দশভূজা দক্ষিণমুখী শ্যামা হলেন যাঁর 'মাথার সোনার মুকুট ঠেকেছে গগনে'। রামকুমার শ্রীকুমারের সুরের নক্সা, সবিতাব্রতর বুক কাঁপানো ডাকের তুমি সাক্ষী রইলে, শিউরে উঠলো রাত দুটোয় যখন মাইকে গমগম করে উঠলো পার্বতীচরণের ওঁ হ্রীং খ্রীং দক্ষিণাকালীকায়ৈ নমঃ,…ওঁ হ্রীং খ্রীং…ওঁ হ্রীং খ্রীং। পরম সেই ওঙ্কারধ্বনি দীপাবলীর আলোয় আলোয় ঝলমলে আকাশে হাউই-রকেটের ফুল ফোটানোর পাশ দিয়ে দিয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো পাড়ার প্রতিটি বাড়ির প্রতিটি ঘরের প্রতিটি সংসারের নিদ্রিত-জাগ্রত মানুষের মাথায় মাথায় আশীর্বাদের ফুলঝুরি হয়ে। ভোর যখন হয় হয় তখন পুষ্পাঞ্জলি প্রণাম মন্ত্র জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী উচ্চারিত হলো ঠিক সেই-ই সময় যখন ঠিক একমাস আগে রেডিওয় 'বাজলো তোমার আলোর বেণু'।

দাঁড়াও। যেওনা গোলদীঘির এইখানটা থেকে। যদিও-বা যাও, পরের তিনদিন সন্ধ্যারতির সময় এসো। প্রথাসিদ্ধ ঘটবিসর্জন পরের দিন যথাযথ হলেও প্রতিমা এখনও কদিন থাকবেন। এসো সন্ধ্যারতিতে। দেখো, যখন ধুনোর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যাবে এইখানটা কানন আর দীপকের ধুনুচি নাচের তালে তালে, শ্যামল যখন দু'বাণ্ডিল ধূপ জ্বালিয়ে দু'হাত উঁচু আরও উঁচু করে তুলে ধরবে, রবি আর পার্থ যখন ঢাকির হাত থেকে কাঠি কেড়ে নিয়ে সঠিক পিটে যাবে জোড়া ঢাক, আর শংকর বাজাবে কাঁসি তখন— ঠিক তখনই কালো পাগল মানিক চোখে জল চওড়া পাঞ্জায় দু'হাতে তালি দিয়ে দিয়ে জয় মা জয় মা করে এগোবে আর পেছোবে তখন— ঠিক তখনই তুমি দেখো— দেখতে পাবে— সেই শব্দগন্ধময় কুহেলীর ভেতর এই মুহূর্তে কালীমুখ, এই মুহূর্তে দুর্গামুখ; এই দুর্গামুখ এই কালীমুখ। আশ্চর্য! হ্যাঁ এই আশ্চর্যই তুমি দেখতে পাবে গোলদীঘির এইখানটায়।

এ প্যান্ডেলও একদিন খোলা হয়ে যাবে। আঁধার হয়ে থাকবে গোলদীঘির এইখানটা। শুধু সেই না-পাম, না-তাল, না-খেজুর গাছে ঝুলতে থাকবে নতুন ঘট এক বছরের মেয়াদে।

না, মন খারাপ করার কিছু নেই। কদিন বাদেই মানে মাস দেড়েকের মধ্যেই দেখবে এখানেই ছোট মাপের সামিয়ানা খাটানো হলো আর শুরু হলো 'ফুলের-জলসা'। দেখতে চাও তো এসো কতো বড়ো বাঁধাকপি হতে পারে, বুড়ো বটগাছ কতো ছোট হতে পারে, কতদিন থাকতে পারে একটা ডালিয়া। বাচ্চাদের হাত ধরে ভেতরে ঘুরে ঘুরে দেখো কোন্ গোলাপ কোন্ চন্দ্রমল্লিকা কোন্ প্রাইজ পেলো। চার-পাঁচদিনের বেশী এ-জলসা চলবে না ; তার মধ্যেই এসো কিন্তু।

হ্যাঁ, আবার অন্ধকার। আবার ফাঁকা। আবার কুয়াশার কাঁথামুড়ি। আবার দেবদারুর ঝরা পাতার ওড়াউড়ি।

তারপর যখন উন্মনা ফাল্গুন এসে পড়বে, আবার বাঁধা হবে ছোট একটা প্যান্ডেল —খুব সাদাসিধে। সারা জমিটা জুড়ে পাতা হবে সতরঞ্চি। ডাকের সাজের সিংহাসনের সামনে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তিকে প্রণাম করে ব্রাহ্মমুহূর্তে বেহালার ছড়ের টানে, হারমোনিয়ামের চাবির চাপে, খঞ্জনীর টোকায় আর খোলের বোলে শুরু হবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বার একজপ 'হরে কৃষ্ণ··· হরে রাম···'। সেদিনটা অবশ্যই হতে হবে শিবরাত্রি। সারারাত ধরে পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে আস্ত একখানা আদি অকৃত্রিম বঙ্গদেশ এসে হাজির হবে গোলদীঘির এইখানটায়— নামগানে, উলুধ্বনিতে, মালা-চন্দনে। এমনকি ছেদহীন চব্বিশপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তনের দ্বিতীয় রাত্রে যখন শিবরাত্রির জাগরণক্লান্ত বেশিরভাগ শ্রোতা নারীপুরুষই নিজের নিজের বাড়িতে ঘুমোবে, মাত্র কয়েকজন বুড়ি বিধবা আর বুড়ো আর উদ্যোক্তাদের দু'চারজন খোঁড়ার নাচ দেখতে দেখতে নাম শুনতে শুনতে ঢুলে ঢুলে নিজের অজান্তেই সতরঞ্চির ওপর এলিয়ে পড়বে, যখন সেই গহন রাতে বাসন্তী হাওয়ার টানে বাঁশি আর বেহালা একসুরে কৃ-ষ্ণ অ-অ-অ বলে কেঁদে উঠবে তখন কী মনে হয় জানো— তখন মনে হয় কোন্ সুদূর অতীত থেকে অনাদি অনন্ত বাঙালীর প্রাণের ডাক শহর গ্রাম নদী মাঠ জলা জঙ্গল ভাসিয়ে বয়ে যাচ্ছে কোথা থেকে কোথা। আর সেই অনাদি অনন্তর মাঝখানে তুচ্ছ আমাকে তোলপাড় করছে 'সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে··· জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী ·· হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে'। সর্বএক— সব একাকার--- সব এক।

জানো তুমি, কিছুদিন আগে আমি 'ভারততীর্থ' বলে একটা তীর্থ দর্শনের গাইড বুক কিনেছি। ভারতের সমস্ত তীর্থ সম্বন্ধে নানান খুঁটিনাটি তাতে দেওয়া আছে। খুব ভালো বইটা। সেই বইটার শেষ পাতায় আমি কলম দিয়ে ছোট ছোট করে লিখে নিয়েছি : আমার জন্ম-জন্মান্তরের তীর্থ গোলদীঘির এইখানটা। □

মানুষের সীমানা

দিবাকর ঘরের ভেতরে বসে বাইরের খোলা আকাশে সূর্যোদয় দেখছে।

এতদিন চারপাশে অসূয়া ঘিরে ছিল, ক্ষোভ জমে ছিল গভীরে, অনেকদিন তাই সূর্যালোক দ্যাখেনি, নিজের ঘরে নির্জিত ছিল দীর্ঘকাল। সহসাই কোথা থেকে উড়ে এসেছে তিনটি বাক্যে গাঁথা কথামালা। সাবধানবাণীর মত, তারপর উদ্বোধনে।

কথাটা কে বলল!

এই যে সামনে বসে আছে মুকুল, দিবাকরের স্ত্রী। তার পাশের চেয়ারে প্রভাস, একদা মুকুলের সহপাঠী, একটু আগে দিবাকরের সঙ্গে প্রভাসের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, এখন প্রভাস বসে আছে দিবাকরের মুখোমুখি। এদের মধ্যে কেউ কথাটা বলল! অথবা কেউ হয়ত বলেছিল কখনো। যারা মাঝে মাঝে এই বাড়িতে আসে, যাদের সঙ্গে রাস্তায় পার্কে মাঠে দ্যাখা হয়ে যায়, যেমন অর্পিতা, মুকুল আসার আগে যার কথা সবসময় ভাবত, মুকুল আসার পরেও কখনো কখনো, যার কথা কোনোদিন মুকুলকে বলে নি অথচ না বলতে পারার জন্যে অপরাধবোধও না, কেন নয়, এটা ভাবতে ভাবতে অবাক হয়ে যায় দিবাকর। অর্পিতা এ বাড়িতে অনেকবার এসেছে, রাস্তায় পার্কে মাঠেও দ্যাখা হয়েছে, এরই মধ্যে হয়ত কোনো সময় কথাটা বলে থাকবে।

বিমানও হতে পারে। এ বাড়িতে বিমান কোনোদিন আসেনি কিন্তু এই বাড়ির কথা জানে। দিবাকরের মুখোমুখি হলেই কথার পিঠে কথা, কথার পিঠে কথা, কথার পিঠে—

ক্রমাগত একের পর এক বৃত্ত ঘিরে ফেলছে আমাদের। আমরা যখন বৃত্ত থেকে বেরোতে চাইছি, তুমি খুঁজছ উৎসভূমি!

বৃত্তের রহস্য জানতে চাই বিমান, তাই—

তুমি নিজেও রহস্য হয়ে উঠছ দিবাকর। তোমার রহস্যভূমিতে আমার আকর্ষণ নেই।

শেষবার বিমানের সঙ্গে কোথায় দ্যাখা হয়েছিল! ময়দানে, ঘোড়দৌড়ের মাঠের উল্টোদিকে অনেকক্ষণ বসে গল্প করেছিল ওরা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ রিভলবার বার করে তারপর পকেটে ঢুকিয়ে রেখে বলেছিল, এটাই শেষ আশ্রয়। বৃত্তের ভেতরে কাউকে বিশ্বাস করি না, বৃত্ত আমায় জড়িয়ে পিষে ফেলছে। মুক্তি পেতে হলে,

শত্রুব্যূহের ভেতরে এই আমার একমাত্র বন্ধু। আগামীকাল আমি চলে যাচ্ছি দিবাকর।

কোথায় ?

জানি না।

ফিরছিস কবে ?

তাও জানি না। এরপর বিমান হারিয়ে গিয়েছিল।

কিংবা মনীশ। বিজ্ঞানের ছাত্র, তবু দর্শন ওর প্রিয় বিষয়। মনীশ অনেকবার দিবাকরের বাড়িতে এসেছে। ও এলে মুকুল খুশী হয়, নানা বিষয় আলোচনা করতে করতে ওরা ঝগড়া করে। দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে থাকে মনীশ, দর্শনের শরীর থেকে বিজ্ঞান কীভাবে নেমে এসে সাবালক হল, কেন অর্জন করল শুধু জেদ, লক্ষ্য-অভিমুখ নয়, কীভাবে বিজ্ঞান লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে, মানুষকে বিপরীতমুখী করেছে,— এইসব আলোচনা করতে করতে প্রায়ই বলে ওঠে, নিজের সীমাবদ্ধতা যে জানে না বস্তুত খর্ব করে নিজেকে। সীমা জানা থাকলে তবেই অসীমের হদিস। ভাবনার জগতে বিজ্ঞান বামন বিশেষ, চওড়া হয়ে যাচ্ছে, লম্বায় বাড়ছে না।

মাঝে মাঝে ওরা তিনজন পারস্পরিক বাক্যবিনিময় করে এইরকম—

মনীশ— দর্শনের অবাধ্য সন্তান হল বিজ্ঞান।

মুকুল— তা হোক, তবু সত্য কথা বলে।

মনীশ— সত্য নয়, অহংকারের কথা বলে। অহংকার সত্যকে জানতে দেয় না।

দিবাকর— আমরা তো বিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করেই জীবনযাপন করি।

মনীশ— তা করি কিন্তু খেয়াল রাখি না, সীমাবদ্ধতা ক্রমশ গ্রাস করছে আমাদের।

এইভাবে মনীশ বরাবর আমাদের চিন্তার বিপরীতে চলে যায়।

দীপংকরও কথাটা বলে থাকতে পারে। জব্বলপুর থাকার সময় অথবা দিল্লিতে যখন ছিল। এরপর নিউ জার্সীতে চলে গেছে, আর ফেরেনি। মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। যখনই জায়গা বদল করে যেন একধাপ অতিক্রম করেছে। তার চিঠিতে প্রতিবার নতুন করে সীমা অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা, অতীতকে উপহাস, বর্তমানের সীমাবদ্ধতা, ভবিষ্যতে পৌঁছবার জন্যে এরা নেহাৎই উৎক্ষেপক কেন্দ্র ইত্যাদি। দিবাকরকে উদ্দেশ্য করে লেখে, তোরা কেবল বৃত্তের ভেতরে ঘুরপাক আর ঘুরপাক, কেন্দ্র খুঁজে পেলি না, স্পর্শকেরও খোঁজ করলি না। একদিন বেলুনের মত ফেঁসে যাবে বৃত্ত। এমন অকিঞ্চিৎকর জীবনের কথা ভাবলে দীপংকরের দুঃখ হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দীপংকরের চিঠিতে সবসময় না হলেও কখনো কখনো বিষণ্ণ হয়েছে দিবাকর। নিজের ঘরে নির্বাপিত থেকে বিষণ্ণতা গাঢ় হয়েছে। নিজের সীমাবদ্ধতা দিবাকর জানে। ঘরের কথা জানে, বৃত্তের কথাও জানে, ঘর যে সবসময় বৃত্তের কেন্দ্র থাকে না তা-ও জানে। দীপংকরের কথায় গাঢ়তা নেই, এসব জেনেও কখনো কখনো সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে, কেন বিষণ্ণ হয় জানে না।

ধরা যাক, মুকুল বা প্রভাস এদের মধ্যে কেউ কথাটা বলল। অথবা অর্পিতা, বিমান, মনীশ বা দীপংকর এরা কেউ কোনো সূত্রে কথাটা বলেছিল। দিবাকর বুঝতে পারছে, কথাটা ক্রমে গাঢ় হয়ে তাকে উদ্বোধিত করেছে, সে নির্জিত ঘরে নেই, সূর্যোদয় দ্যাখার কথা ভেবেছে, এমন কি ঘর উন্মুক্ত করে সূর্যোদয় দেখছে এখন।

হয়ত বা এমন ঘটেছে, কারো খেয়ালে গুজব রটনা হয়েছিল, পরম্পরায় প্রসারিত হয়ে প্রবাদে পরিণত, প্রবাদ চলমান হয়ে, যেমন ঘড়ির দোলক, নিত্য দোলনে নির্দিষ্ট সময় অন্তর আঘাত করে শব্দ উৎপন্ন করে, মানুষের মনে সময়-চেতনা উদ্বোধিত করে। এই প্রবাদও নির্দিষ্ট সময়ে দিবাকরের মনে আঘাত করে তাকে উদ্বোধিত করছে, নির্জিত অবস্থা থেকে উদ্ধার করেছে।

অবশ্য এই সূত্রগুলি নির্দিষ্ট হয়ে দিবাকরের সামনে উপস্থিত হতে পারেনি। সে এখনো গভীর সংশয়ের ভেতরে। সম্ভবত কোনোটাই এককভাবে স্পষ্ট কারণ নয়, তার মনে ওদের যৌথ উদ্যোগ এই কথামালা জাগিয়ে দিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে এতদিন পরে প্রভাসের এই বাড়িতে আসা, প্রভাসকে ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, এটা কোনো তাৎপর্য বহন করছে! এত বছর দাম্পত্যজীবনের পর কেন এখন পুরনো স্মৃতি নিয়ে প্রভাসের হঠাৎ বৃত্তে ঢুকে পড়া, সংসার বৃত্তের বাইরে থেকে প্রভাস এসেছে কিন্তু মুকুলের প্রত্যয় এমন যেন এই বৃত্তের ওপর কোনো অভিঘাতই নয়, দিবাকর নিঃসংশয় হতে পারেনি। তার মধ্যে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় কি সহসা এই কথামালা!

বিমান এ বাড়িতে আসবে না, এটা স্বাভাবিক। সে বৃত্তের সীমা জেনেছে, অতিক্রম করার জন্য ওর মরণপণ সংগ্রাম। ওর বিপরীতে দিবাকর সীমা অতিক্রম করতে চায় না, কেন্দ্রে উৎসভূমি খুঁজছে অতএব এই বিপরীত দিবাকরকে বিমান অবজ্ঞা করবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু মনীশ কী বোঝাতে চায়! মুকুল ওর কথা মন দিয়ে শোনে, ঝগড়া করে, ঝগড়া করে আনন্দ পায়, মনীশের প্রতি না হলেও মনীশের কথার প্রতি মুকুল অবশ্যই আকর্ষণ বোধ করে। মনীশ বলতে চায়, বিজ্ঞান পৌনঃপুনিক, বৃত্তময়। কিন্তু বিজ্ঞান তো পৌনঃপুনিক নয়, অভিমুখ আছে, বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া আছে। মনীশ অবশ্য বলে, এটা সর্পিল পৌনঃপুনিকতা। মনীশ আরো বলে, বিজ্ঞানের ধারণা, সত্যকে ও জানবে কিন্তু বেচারা জানে না, ঠিক ঠিক দেখতে পায় না, ঠিক ঠিক শুনতেও পায় না। বরং যদি কল্পনা করতে পারত, বৃত্ত ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া থাকলে বুঝত, কল্পনার ভেতরেই সত্য জেগে থাকে।

দিবাকর ও মুকুল দুজনেরই মনে হয়েছে, মনীশ অন্য কিছু বোঝাতে চায়। আসলে ওদের এই জীবন, দাম্পত্য, এই স্বাভাবিকতাকে ও আঘাত করে। ওর কথাবার্তা, ঝগড়া, মুকুলের সঙ্গে চাপান উতোর, এসবও বৃত্তময় তা ও জানে না? হয়ত বৃত্তময় জীবনের ওপর বৃত্তময় অভিঘাত, সীমা ছাড়িয়ে অসীমের দিকে ওদের যদি নিয়ে যেতে পারে, মনীশের ভাষায়, সত্য তার আশ্রয়ে যাবার জন্যে উদ্যত। এই ভাষা কি ওদের

দাম্পত্যের প্রতি কোনো সংকেত বহন করে আনছে !

অর্পিতা মাঝেমাঝেই কেন বাড়িতে সরাসরি চলে আসে, দিবাকরের সন্দেহ হয়। ইতিহাস নিয়ে দিবাকরের চর্চা আছে, ইতিহাস বিষয়ে অর্পিতারও গভীর উৎসাহ, নানা কৌতূহল নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করে। মুকুলের সঙ্গে ভাব জমায়, জোর করে চা খায়, মাঝে মাঝে মিষ্টি, চ্যানাচুর নিয়ে আসে ! মুকুল তবু অন্তরঙ্গ হয় না, খারাপ ব্যবহারও করে না, দূরত্ব রাখে বোঝা যায়। অর্পিতার আচরণে প্রগলভতা থাকলেও স্বাতন্ত্র বজায় রাখে। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকে তবু বোঝা যায় অর্পিতা ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র আঁটছে। মুকুলকে হয়ত উসকে দিতে চায়, সংসারের সীমারেখার ভেতরে হঠাৎ ঢুকে পড়ে হঠাৎ বেরিয়ে গিয়ে, দুজনকেই নাড়িয়ে দিয়ে, আবার দুজনকে মুখোমুখি করে, দিবাকর স্পষ্টই বুঝতে পারে অর্পিতা কিছু একটা বলছে কিন্তু নির্দিষ্ট উচ্চারণে কখনো সেই বলা জেগে ওঠে না।

অথচ নিয়মিত উচ্চারণে দীপংকর স্মরণ করিয়ে দেয় দিবাকরের সীমাবদ্ধতার কথা। দিবাকরের আকাশ ছোট হয়, অন্তর্বর্তী এবং তার সীমারেখায় কোনো সম্পর্ক থাকে না, ওদের মধ্যে কোনো প্রতিযোগিতা নেই। তবু এটা ঘটনা, এমন নিরেট উচ্চারণ, এমন পরম্পরাহীন বাক্য আর কেউ উচ্চারণ করেনি যা স্থায়ীভাবে না হলেও চকিতে তার মর্মমূল বিদ্ধ করেছে কখনো কখনো।

এইসব চরিত্র, চরিত্র পরম্পরায় নানা ঘটনা, ঘটনারা কখনো স্মৃতি, কখনো ঘটমান, কখনো বা কল্পনা, ক্রমে পরিণত বিচিত্র আবহে। সেখানে খচিত অসহ্য ইঙ্গিত, ব্যাপ্ত গভীর আশংকা, মধ্যবর্তী কুয়াশায় অসংখ্য অসূয়া, কতকাল সূর্যোদয় দ্যাখেনি দিবাকর। এমন অন্ধ সময়ে গভীরে গড়ে উঠতে থাকা প্রবাদবাক্যটি অথবা কারো কথায় বা ইঙ্গিতে জেগে উঠে গাঢ়তা পেয়েছে সেই বাণী, ভেসে এসেছে বহুদূর থেকে,— তোমার ঘর তোমার কেন্দ্রবিন্দুকে ঘিরে ফেলেছে বৃত্ত, যে রজ্জুতে বাঁধা পড়ছ দিবাকর, তোমাকে গ্রাস করছে। জেগে ওঠ, অতিক্রমী হও।

তাই জেগে উঠছে সে, সূর্যোদয় দেখবে বলে। দিবাকর লক্ষ্য করেছে, বাণীর ভেতরে দুটি মূল শব্দ— রজ্জু ও বৃত্ত। অতএব রজ্জুর তথ্য ও তত্ত্বে তাকে মনোনিবেশ করতে হচ্ছে।

জানালাগুলো খুলে দিতে এই যে সূর্যকিরণে উজ্জ্বল চতুর্দিক, বৃত হয়েছে সবকিছু, এরা কি সূর্যকিরণে বাঁধা পড়েছে ! সূর্য থেকে নির্গত রশ্মিগুচ্ছ বিকিরণে এতটা পথ, পৃথিবীকে ছুঁয়ে বলয়ের মত ঘিরে ধরেছে, সূর্যরশ্মিই তবে রজ্জু ! কিন্তু গ্রাস করেছে পৃথিবীর সবকিছু, শুধুমাত্র দিবাকর, তার কেন্দ্রবিন্দু ঘর নয়। সূর্যরশ্মি কোনো বিভ্রমও নয়, তাকে অতিক্রম করার প্রশ্ন ওঠে না কেননা সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে মহাজাগতিক কোনো অবস্থানে দিবাকরের যাওয়া, অথবা সেখান থেকে কোনো বাণী ছিটকে এসে এখানে, কিংবা এখানেই গড়ে ওঠা কোনো প্রবাদ তার সীমা অতিক্রম করে

অতটা দূরবর্তী, দিবাকর কোনো কিছুতেই নির্দিষ্ট হতে পারছে না।

রজ্জু সম্পর্কে কিছু তথ্য ও তত্ত্ব তার জানা আছে। রজ্জু দুরকম। উদ্ভিজ্জ ও খনিজ। দৃশ্যময়তা থেকে যুক্তি ও বিশ্লেষণে, তারপর বোধের অনুশীলনে এবং কখনো কখনো স্বপ্ন সম্মোহনে নির্ভর করে দিবাকর সিদ্ধান্তে আসে যে, মানুষ ও উদ্ভিদ পারস্পরিক সহযোগিতায়, নির্ভরতায় একে অপরকে আচ্ছন্ন করে আছে। মানুষ অপেক্ষাকৃত হীন কিন্তু উদ্ভিদ মাতৃসমা। মানুষ অবহেলায়, কদাচিৎ যত্নে তার প্রতি বর্জ্য নিক্ষেপ করলেও প্রতিদানে উদ্ভিদ তাকে দেয় তার সুস্বাদু প্রজন্ম, সুবাতাস, সবুজ স্নেহ, গাঢ় আচ্ছাদন। মানুষের চারপাশে এই নিবিড়তা মানুষ বুঝতে পারে না, কেননা তার অহংকার চোখ ঢেকে রাখে, এই উদ্ভিজ্জ রজ্জুর কথা মানুষ তাই জানতে পারে না। দিবাকরের এই সহসা অনুভব তাকে চিনিয়ে দিল রৌদ্রে স্নান করতে থাকা চারপাশের বনস্থলী, দীর্ঘঋজু সন্ন্যাসী বৃক্ষরাজি, স্রোতঃস্বিনীর মত বহমান ঊর্মিমুখর শস্যকণা। দিবাকর ভাবল, এই যদি প্রবাদকথিত রজ্জু, যদি দিবাকরকে গ্রাস করছে, অতিক্রমের কথা ওঠে কেন! অতিক্রমী হলে যে ঊষর প্রান্তর, দিকচিহ্নহীন মরুভূমি, তা কি সহনীয়, কখনো প্রার্থিত হতে পারে!

অবশ্য খনিজ রজ্জুর সঙ্গে এমন সহবৎ গড়ে ওঠে না, দিবাকর জানে। পৃথিবীর জঠরেই নিহিত থাকে। মানুষ আগ্রাসী হলে, পৃথিবীর জঠর উৎপাটিত করতে চাইলে কী করা যাবে! যাদের ব্যবহার করতে চাইল মানুষ, ব্যবহৃত হতে হতে মানুষকে অভ্যস্ত করতে করতে তাকেই গ্রাস করতে উদ্যত এখন। এই খনিজ রজ্জুর বেষ্টনী অনুভব করছে দিবাকর, একে অতিক্রম করতে হয়ত পারবে সে, বরং খনিজ রজ্জুর চেয়ে উদ্ভিজ্জ রজ্জুর কাছে আত্মসমর্পণ ভালো, যে স্নেহ মোক্ষণ করবে, খনিজের মত হৃদয়চর্বন করবে না। অবশেষে খনিজ রজ্জুর অস্তিত্ব গাঢ় অনুভবের ভেতরে এনে, তার নিঃস্পন্দ প্রাণকে উপেক্ষা করে উৎক্রামী হতে পারল।

বরং মানব-সম্পর্ক ও মানব-পরম্পরায় নিজেকে বেশি গ্রস্ত বোধ হচ্ছে। এই সম্পর্ক উদ্ভিজ্জের মত সহনশীল নয়, বরং প্রতিযোগী, ঈর্ষাসঞ্চারী। এই ঘরের ভেতরে এতকাল সূর্যালোকহীন দিবাকর, এখন উন্মুক্তির সামনে, স্পষ্ট অনুভব করছে, তাকে কেন্দ্র করে, তার এই ঘর উপেক্ষা করে মানব-বেষ্টনী সাজানো আছে। মুকুল, মুকুলের এপাশে প্রভাস। তাদের পেছনে বৃত্তাকারে বিমান, মনীশ, দীপংকর, অর্পিতা। তাদের পেছনে আরো অস্পষ্ট বৃত্তাকারে সুশৃংখল মানব-বেষ্টনী বৃত্তের পর বৃত্তে সাজানো। এদের অতিক্রম করে কীভাবে যাবে দিবাকর! খনিজ বা উদ্ভিজ্জ রজ্জুগুলি অতিক্রম করা না-করায় কিছু এসে যায় না, এদের ভেতরে এদের নিয়েই ওতোপ্রোত হয়ে আছে। কিন্তু মানব-রজ্জুতে গ্রস্ত দিবাকর থমকে দাঁড়িয়ে আছে মধ্যবর্তী এই ঘরের কেন্দ্রবিন্দুতে।

মানব-রজ্জুর কেন্দ্রস্থলে গ্রস্ত দিবাকর, তার একাকীত্ব, সেখানে মুকুল থাকে না।

কখনো কখনো সেখানে ঢুকে পড়ে, একাকীত্ব থেকে মুক্তি দেয়। বন্ধনের ভেতরেও এই সহযোগ, দিবাকর সহজে নিঃশ্বাস নিতে পারে। এই যে বিছানায় শুয়ে আছে মুকুল, কখন থেকে শুয়ে আছে! প্রভাস কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে, এই অবকাশে জানালা খোলার উন্মুক্তি, সূর্যোদয় দেখতে থাকা, এর মাঝামাঝি কোনো এক সময় মুকুল ঘুমিয়েছে। প্রবাদকথিত রজ্জুর বস্তুগত অবস্থান চিনে নেয়া যখন একান্ত জরুরি, সহযোগী যখন একমাত্র মুকুল, এই সময় তার এভাবে ঘুমিয়ে থাকার কী অর্থ হতে পারে! মুকুলকে এখন দরকার, এই কেন্দ্রবিন্দু থেকে উৎক্রামী হতে হবে, সেই বহু কথিত বাণী অনুসরণ করে রজ্জুর সন্ধানে, যা ক্রমশ গ্রাস করছে তাকে। অতএব সূর্যকিরণ থাকতে থাকতেই রজ্জুর বেষ্টনী অতিক্রম করে যেতে হবে।

মুকুলকে দু-একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে তার শরীর নাড়িয়ে দিল। মুকুল চমকে উঠে বসল, কী হয়েছে!

চল বেরিয়ে পড়ি।

কোথায়!

আপাতত ঘরের বাইরে।

তারপর?

বৃত্তরজ্জুর দিকে।

বৃত্তরজ্জু!

যা আমাদের গ্রস্ত করছে, কে যেন বলল, অথবা কেউ বলেছিল, কিংবা সেই প্রবাদ-কথিত সাবধানবাণী। অতিক্রম করে যেতে হবে, আমরা আর দেরী করতে পারি না।

অতিক্রম করে কোথায় যাব?

জানি না, আপাতত ঘরের বাইরে।

মুকুল দিবাকরের সহযোগী, দুজনে একসঙ্গে ঘরের বাইরে গেল।

কেন্দ্রের বাইরে এসে সবকিছু বদলে গেছে। সূর্যালোকে ম্লান ছায়া! পেছন ফিরে দেখল দিবাকর, চারপাশে ছড়ানো অসংখ্য কেন্দ্রের ভেতরে নিজের কেন্দ্র খুঁজে পাচ্ছে না। দিবাকর নিজেও বদলে গেছে। গম্ভীর মুকুল কিছু ভাবছে।

কী ভাবছ মুকুল?

এখনই আলো ম্লান হল কেন?

ছড়ানো এত কেন্দ্রের ভেতরে আমাদের কেন্দ্র কোথায়?

আমি চিনতে পারছি।

আমি পারছি না কেন?

আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

ঐ দ্যাখ মুকুল, ঐ যে—

দিবাকর দেখছে, অসংখ্য কেন্দ্রবিন্দুগুলি সংহত হচ্ছে, চারিদিকে বৃত্তাকারে গড়ে

উঠছে পরিধি। বিচিত্র গড়নে পাক খেতে খেতে রজ্জু ঘিরে আছে বৃত্তাকারে। খনিজ, উদ্ভিজ্জ, মানবসূত্রে গঠিত এই রজ্জু দেখতে দেখতে, দিবাকরের পা নড়ে যাচ্ছে, আশ্চর্য প্লবতায় ভেসে উঠেছে সে, ভেসে থাকছে। তার হাত ধরতে গিয়ে বারবার পিছলে যাচ্ছে মুকুলের হাত। দিবাকর ওকে ধরে তুলতে চাইছে, বারবার ডুবে যাচ্ছে মুকুল।

কী হল মুকুল, উঠে এস। আমরা সাঁতার কেটে রজ্জুর দিকে যাব।

পারছি না দিবাকর। চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

আমরা বেরিয়েছি অতিক্রম করার জন্যে, ফিরে যাবার কথা বলছ কেন!

অতিক্রম করে গেলে আর ফিরতে পারব না। দেখছ না, সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সূর্যাস্তকে সূর্যোদয় ভেবে ভুল করেছি। এখনো সময় আছে।

তাই তো!

অবাক হয়ে আছে দিবাকর। আকাশে অলৌকিক আলো, তার মধ্যে একাকী পিঙ্গলবর্ণে সজ্জিত, দাঁড়িয়ে আছে সে। কখন যেন মুকুল হারিয়ে গেছে। চারপাশে কেউ নেই, কেন্দ্রগুলি মুছে গেছে। একাকী এই অলৌকিক মহিমা নিয়ে কেন দাঁড়িয়ে আছে দিবাকর!

ক্রমে আকাশের অলৌকিক আলো, পিঙ্গলবর্ণ ঝরে যাচ্ছে, অদৃশ্য হচ্ছে পৃথিবীর ভূমিগত বন্ধন। চারপাশে ছড়ানো আছে পাকে পাকে জড়ানো রজ্জু। উজ্জ্বল, ঘূর্ণ্যমান রজ্জু। কখনো উদ্ভিদ, বয়ে যাচ্ছে শস্যশ্যামল, আদিম বনস্থলী, পাহাড় ঘেরা অরণ্যসোপান। কখনো খনিজ, তুলে আনছে প্রাগৈতিহাসিক, ভাস্কর্য স্থাপত্য, সভ্যতার উজ্জ্বল বর্ণমালা। কখনো মানব-সংকুল জনপদ, দীপংকরের হাত তুলে রাখা, অর্পিতার চোখ, প্রভাসের চকিত মুখ, মনীশের দুহাত ছড়িয়ে রাখা, মুকুলের অবিরাম সাঁতার কাটা। ঘূর্ণ্যমান রজ্জু কখনো জ্বলে উঠছে, কখনো হারিয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রীভূত দিবাকর, তার সামনে একমাত্র অস্তি এখন পৃথিবীর দিগন্ত ব্যেপে অলৌকিক রজ্জুর ক্রমাগত ঘুরে যাওয়া।

কী করবে দিবাকর! এই যে ক্রমাগত পরিধি ছোট হয়ে আসছে, রজ্জুর কাছে ন্যস্ত হয়ে যাবে কিংবা ঋজু পদপাতে অতিক্রম করবে তাকে?

সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি, দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাচ্ছে সে, এগিয়ে আসছে তার মুখোমুখি অদ্ভুতবর্ণ ঐ রজ্জুর ঘেরাটোপ। দিবাকর শুনছে, অর্পিতা দীপংকরদের ব্যাকুল আশ্বাস, দেখতে পাচ্ছে দীর্ঘায়িত বনস্থলীর সুদূর হাতছানি, তার স্বাদের ভেতরে উন্নত সভ্যতার বর্ণময় ভ্রূবিলাস। রজ্জুর ওপারে সমস্ত রঙ, সমস্ত আলো জমা হচ্ছে। সূর্যোদয় তবে ওখানে!

দিবাকর কোথায় এখন! সর্বদিক সর্বশূন্য। রজ্জুর চিহ্ন নেই, আলো নেই, রঙ নেই। সে কি অতিক্রম করেছে সব, অলৌকিক রজ্জু, ভূমণ্ডল, যাবতীয় রঙ, আলো। কী এখানে! দিবাকর, সর্বস্ব শুধু দিবাকর। কোথাও দর্পণ নেই। □

সিদ্ধার্থ সেন

আশ্চর্য দৃশ্যমালা

এক। আপনার মুখ আপনি দেখ

প্রায় এক যুগ পরে নিশুতি রাতে মিতা আসে। বহুদিন বাদে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, অথচ ওর স্মৃতি আমাকে তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছিল না অনেকদিন ধরেই। তবে কেন এই স্বপ্ন? স্বপ্নটা খুব অদ্ভুত: স্থান ডালহৌসি কিম্বা কোন অফিসপাড়া। সদ্য আলো জ্বালা মোহিনী রাত সবে প্রসাধনপটিয়সী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অথচ এমন একটা মন খারাপ করা সন্ধ্যা আর ডিপ্রেসিং আবহাওয়া, কি বলব। শহরে বড় ধরনের কোন গণ্ডগোল হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় লোকজন কম। বাসটাস নেই বললেই চলে— তার মধ্যে হিমেল হাওয়া আর গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। হঠাৎ মনে হল একটা অদ্ভুত সুসজ্জিত গোলমতন গুদামঘরের ভেতর বসে আছি— কোনখানে কোন জানালা নেই তাতে। অবশ্য দেয়ালে সাঁটা ওয়ালপোস্টার আছে— একটায় ঘন জঙ্গল, আরেকটায় নীল আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে একঝাঁক সাদা পাখী উড়ে যাচ্ছে— এইসব। মনে পড়ে গেল, সেইদিনই সকালে কি একটা ঘটনায় আমি হঠাৎ নবাব বনে গেছি। (হয় লটারী, নয় কোন বিদেশী কোম্পানীতে একেবারে বড়সাহেবের চাকরী যেখানে ডলারে মাইনে হয় কিম্বা হয়তো সিনেমার জন্যে লেখা আমার স্ক্রিপ্টটা ধুলোয় ভর্তি হয়ে আছে তার জন্যেই এন. এফ. ডি. সি.-র কল্যাণে আমার ভাগ্যে বিশ পঁচিশ লাখ টাকার শিকে ছিঁড়ে গেছে।)

এমন সময় উর্দিপরা একজন আর্দালীমতন লোক আমাকে সেলাম দিয়ে গেল "হুজুর মেমসাহেব এসে গেছেন"। আমি খুব নির্লিপ্ত গলায় হুকুম করলাম তাকে নিয়ে আসতে অথচ কোন মেমসাহেবেরই তো আসার কথা ছিল না। বলতে না বলতেই মিতা এল— পরনে একটা আগুন রঙের ছোট হাতা স্কার্ট, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঝুল, তাতে সাদা, বড় বড় পোল্‌কা ডট্‌। (আসলে সাজপোশাকে ও বরাবরই খুব কনজারভেটিভ লম্বা ব্লাউজের হাতা, শাড়ি পরে আমার ফুলমাসীর মতন তাতে এতটুকু শরীর দেখা যায় না। আশংকা করি আজো ওর এমন বেশবাসই অক্ষয় হয়ে আছে— কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম আগুনরঙা স্কার্ট!) ওর চেহারা সেই প্রথম দেখার মতন— রূপ যেন ভয়ংকর ঝলসানো আগুন হয়ে জ্বলছে। আগের চেয়েও অনেক সুন্দর, আশ্চর্য শরীর। লম্বাটে তীক্ষ্ন

মুখে অদ্ভুত সুন্দর চোখ, ধনুকের মতন জোড়া ভুরুর তলায় প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সেই প্রখর নাক আর ঈষৎ পুরু গোলাপী ঠোঁট। ও ঠিক সেইরকম করে ঠোঁট ওলটালো যেমন করে ওলটাতো প্রথম দেখার সময়ে (আর কি সুন্দর লাগত এই ঠোঁট বেঁকান, তাই যখন তখন খ্যাপাতাম ইচ্ছে করে)।

হঠাৎ মনে হল কখন বাইরের রাস্তায় চলে এসেছি— দুজনে হাঁটতে শুরু করেছি একসাথে। যেন কালই দেখা হয়েছিল, তারপর আজকের এই মোলাকাৎ। মাঝখানের একটা যুগ বিস্মৃতির অতল খাদে তলিয়ে গেছে। ভীষণ ঠাণ্ডা গলায় আমাদের কথা হচ্ছিল নারীপুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে— খুব থিওরিটিকাল লেভেলে।

ওর বক্তব্য বলতে বলতে দারুণ তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছিল মুখে চোখে :

(১) জীবনে প্রেম ট্রেম বলে কিছু নেই— সব ফিজিক্যাল ব্যাপার। নারীপুরুষ সব সমান এ ব্যাপারে— কিন্তু পুরুষদের মাতব্বরি আর মর‍্যালাইজিং অসহনীয়।

(২) পুরুষরা আসলে বেসিকালি ভণ্ড এবং ইমপোটেন্ট অথবা কাপুরুষ।

(৩) পুরুষদের এই মেকানিক্যাল ব্যাপার যাকে ন্যাকামি করে 'প্রেম' বলা হয় তাকে এক্সপ্লয়েট করতে না পারলে মেয়েদের ডিগনিটি নিয়ে বাঁচা অসম্ভব ইত্যাদি।

বলতে বলতে একটা রহস্যময় গলির সামনে এসে দাঁড়ায়— সেখানে আলকাতরার মতন অন্ধকার— কিছু দেখা যায় না। এক মিনিট নিঃশব্দে অলপাতার সেপাই-এর মতন দাঁড়িয়ে আছি— দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিতা আবার ঠোঁট ওলটায়— 'কি হল ভাল ছেলে, এবার বাড়ী যাও।' আমি নড়তে পারি না। ও আবার কড়া গলায় হুকুম করে 'কি হল, কথা কানে যাচ্ছে না।' বলতে বলতে চোখে ঝলসে ওঠে শাসনের দৃষ্টি। আমি কিছুতেই নড়তে পারছি না দেখে বোধহয় দয়া হয়। 'তুমি না⋯বড্ড মুশকিল করলে। জান, তোমাকে তো আমি কিছু দিতে পারব না। এক কাজ করতে পার⋯ তুমি রোজ এইসময়ে, আজ যেখানে দেখা হল⋯ ওইখানে এস। আমার সঙ্গে তুমি এইটুকু রাস্তা হাঁটতে পার রোজ।' বলতে না বলতেই সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।⋯

বার্গম্যানের কাঁচা সংস্করণ— সতুর বক্তব্য,

সিনেমাটিক্যালি দারুণ— ভাস্কর বলল। স্বপ্নটা রঘুকে বলতে হবে। সতু এবং কয়েকজনের মতে যতই ম্যাজোকিস্ট হই না কেন, আসলে আমি একটা মেল শভিনিস্ট। আমাকে বাদ দিয়ে মিতার সুখী জীবনযাপন আমি দু-চক্ষে সইতে পারি না। আসলে তো দেশে ফেরার পর ১ স্বামী ২ সন্তান ও ১ এ্যাম্বাসাডার গাড়ী (তখনো মারুতি আসেনি) সহযোগে ও বেজায় সুখেই আছে। সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন, শোভে গ্রামোফোন, শোভে গ্রামো— ।

অথচ গতরাতেই কালীর পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ মিতার মঙ্গলকামনা করলাম

(হায়, আশৈশব আমি মার্কসিস্ট বলে সবাই জানে। রেগে গেলে বাবা বলত 'মার্কশিট') তবে কেন শিয়রে রাখা কালীর ছবিটা সরাতে পারলাম না।) দি টেরিবল মাদার, তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমি তো কোন ছার। মানিক বাড়ুজ্যে আর ঋত্বিক ঘটকও তাই করত। বাঃ মানিক আর ঋত্বিক। বেশ কনভিনিয়েন্ট উদাহরণ তো। আর সেই পারা ওঠা ঠাকুর্দার আমলের গোল আয়নাটা— তাকেও সরানো গেল না। সেখানে আমার বিচিত্র মুখের চেহারা আমাকে ভেঙাতে থাকে প্রায়শই। আমি চোখ বুঁজি, দেখতে চাই না। তবু চোখ বুঁজলেও দেখতে পাই নিঃসীম শূন্যের এক গোল গর্ত, পারা ওঠা সেই গর্ত চকচক করে উঠে দেখিয়ে দিচ্ছে— এই দ্যাখ্ তোর মুখ, এইটা. এইটা তোর নাক, এইখানে একটা আঁচিল আছে আমি চীৎকার করে উঠি ঘুমের ভেতরে না না এটা আমার মুখ না, চোখ না, আমার ছবি না।

In the crossways of kisses
Years pass too quickly—
Shattered memory
Beware, beware, beware.

দুই। ডাইরী অফ এ জিনিয়াস

আসলে আমি একজন আদ্যন্ত ম্যাজোকিস্ট— এমন ধরনের সেই অনেস্ট ম্যাজোকিজম্ যা জনান্তিকে, ফিসফিস গোপনীয়তার শিহরণে তারিয়ে তারিয়ে গা শিরশিরিয়ে উপলব্ধি করার ভেতরে একটা বিকট মজা আছে— এমন সেই মজা যা তাবড় তাবড় পুরুষসিংহরাও মস্তিষ্কের কোন গোপন অন্ধকারের তাড়নায় মন্দ রেলিশ করে না— কিন্তু প্রকাশ্যে ? ধরণী দ্বিধা হও ! কানের ভেতরে যেন গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছে কেউ অথবা ফুটন্ত আলকাতরায় চোখ অন্ধ হয়ে গেলে যেমন হয় তেমন— যেমন লজ্জা হয়েছিল একবার ছোটবেলায়, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে আর লজ্জার বিষয়বস্তু কিন্তু আমি নয়— আমার বাবা। আমাদের পুরনো ভাড়াবাড়িটার পেছন দিকে একটা খোলা বারান্দা ছিল— টানা। পেছনেই খুব উঁচু পাঁচিল আর ওধারে বিশাল খেলার মাঠ। সেখানে বল পেটাপেটি হত সারাক্ষণ আর প্রায়ই ফুটবল এসে পড়ত আমাদের বারান্দায়, বাবার শখের টবের ফুলগাছ তছনছ করে দিত। আমি তখন খুব ছোট আর তখনকার ছেলেছোকরারাও এত মস্তান বা বাঁদর হয়নি এখনকার মতন। বল ফেরত পাবার জন্য প্রায়ই দেখা যেত পাঁচিলের ওপর লাইন করে বসা ছেলেছোকরার দল আর রক্তচক্ষু বাবা তাদের ভীষণ ধমকে যাচ্ছে অনর্গল।

একদিন বল লেগে জানালার কাচ খানখান আর তাই শুরু হয়েছে প্রায় লংকাকাণ্ড। কাঁচুমাচু ছেলের দল পাঁচিলের ওপরে বসা কোলাব্যাঙের মতন, বাবা ভয়ংকর

গলায় ধমকে চলেছে আর এককোণে আমি ইয়ো ইয়ো খেলছি আপনমনে।

হঠাৎ বাবা লাঠি নিয়ে খাট থেকে লাফিয়ে উঠতেই এক ঝাঁকুনিতে লুঙ্গি খুলে মাটিতে লুটোপুটি, ভেতরে কিচ্ছু পরা ছিল না, একদম। এক সেকেন্ড নীরবতার পরেই প্রচণ্ড আকাশ ফাটানো সমবেত অট্টহাসি আর ধুপধাপ করে হনুমানের লাফ "দাদু ল্যাং ল্যাং দাদু ল্যাং ল্যাং"। কেন জানি না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম খাটের বাজু ধরে। অনেকদিন বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরুলে চোখমুখ শিঁটিয়ে বুজে থাকতাম— ওরা যদি কেউ ধারে কাছে লুকিয়ে থাকে। সেইরকম লজ্জা ছিল অনেক পরে, যদি আমার হলদেটে, একান্ত নির্জন, নিষিদ্ধ ডাইরীটার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। অথচ তখন আমার, যাকে বলে ফর্ম্যাটিভ স্টেজ। রোল অফ্ লেবার ইন দি ট্র্যান্সমিশন ফ্রম এপ টু ম্যান পড়া হয়ে গেছে বার চারেক। স্টেট এ্যান্ড রেভোলিউশন আর অরিজিন অফ ফ্যামিলি ইত্যাদি নিয়ে হাতাহাতি চলছে সকাল বিকেল। 'হারানের নাতজামাই'-এর স্ট্রীট ড্রামায় আমাদের হাততালি জুটছে মন্দ না। এই সময়েই একদিন সুধীরদার মুখ বেজায় কাচুমাচু। সদ্য বিয়ে করেছে অল্প বয়সে পার্টির মেয়েকেই। ফলে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবার পর কোন এক মেসে জুটেছে তারা অবশ্যই অন্য সব দাদাদের (অর্থাৎ বড় কমরেডদের) সাহায্যেই। শিগগীরই বাচ্চা হবে সুধীরদার বৌ-এর। কিন্তু কি সর্বনাশ ডেট দিয়েছে নাকি দোসরা অক্টোবরেই— গান্ধীজয়ন্তীতে। ভাবা যায়, সুধীরদার ছেলে (কমরেডরাও 'বাচ্চা হবে' বলত না, বলত — এখনো বলে কিনা জানি না— 'ছেলে হবে'— তবে এখন অবশ্য শোনা যায়, সেক্সের ক্লাশ ক্যারেটকার নিয়ে অনেক কাজকর্ম হচ্ছে)— সুধীরদার মতন বিপ্লবী, তার ছেলে হবে কিনা ওই গান্ধীর জন্মদিনে। তার ওপর 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও গান্ধী' নিয়ে সুধীরদার লেখা দারুণ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল তখন। সতু মুখ টিপে খ্যাক খ্যাক করে হাসে। আরে দোসরা অক্টোবরে আরো একটা দিন আছে। চীন বিপ্লবের তারিখ সব ভুলে মেরে দিলে? আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু আমার আতংক থেকে যায়। ভাগ্যিস দোসরা অক্টোবরে। যদি মুসোলিনির জন্মদিনে ব্যাপারটা হত? আচ্ছা সুধীরদার বৌ শুনতে পেলে কি ভাববে? আমাকে তেড়ে মারতে আসবে না এইসব ইয়ার্কি শুনে? ভাবতেই কেমন গা শিউরে ওঠে। অদ্ভুত সেই আতংক আর কোথায় সেই আতংকের ভেতর একটা গোপন সুখের শিহরণ আছে কেননা সুধীরদার বৌকে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় ইস্কুলের অপর্ণাদি— কি অদ্ভুত মিল হাঁটাচলায়, শরীরের গড়নে। ···অনেক পরে আমার ডাইরীর অংশবিশেষ সিনেমার স্ক্রিপ্ট করেছিলাম। আমার কাকাবাবু— বিশ্ববিখ্যাত পরিচালক— ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন। নিজের জুলপিতে মোলায়েম করে আঙুল ঘষতে ঘষতে (ওটা তাঁর একটা ম্যানারিজম্ ছিল) চোখ বুঁজে বলেছিলেন "বেশ একটা ধাঁচা আছে কিন্তু··· অন্যরকম। ভেবে দেখ, দারুণ সুররিয়ালিস্ট ছবি হতে পারত কিন্তু। তবে কি জান, এদেশে ম্যাজোকিজম ইজ নট ইন ফ্যাশন। খাবে না··· খাবে না।"

আসলে ওটা আমার একটা রোগ, একটা যন্ত্রণা যা কুরে কুরে খায়। হায়, আমার মনোবিকলনের তীব্র যন্ত্রণা লাঘব করতে চাইলেও কোন ডাক্তার দেখাতে পারি না কেন? সুধীরদা (সব খুলে বলিনি অবশ্য সুধীরদাকে— পাগল?) অবশ্য একজন নামকরা মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়েছিল। দোরগোড়া থেকে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, কেননা আবিষ্কার করেছিলাম, উনি আমাদের কেমন কেমন যেন আত্মীয় অথবা বাবার বন্ধুর বন্ধু— পাগল, আর যায় কেউ ওখানে? শিশির অবশ্য আমাকে বড়ুয়াদার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। নির্জন চেম্বারে অনেকক্ষণ তিনি সব শুনেছিলেন। ফীস্ নেননি— দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, "কি মুশকিল জান, ওটাতো তোমার রোগ নয় ওটা যে তোমার স্বভাব।" সেদিন নিশুতি রাতে আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। হলদেটে নিষিদ্ধ ডাইরীটা অনেককাল বাদে অলঙ্ঘ্য কোন নির্দেশে খুলে বসতে হয়। নির্জন, একান্ত কথা, শুধু কথার আঁচড়, আঁচড়ে কামড়ে অতিষ্ঠ করে দিতে দিতে স্পষ্ট হয় অনেকদিনের পুরনো সেপিয়া কালারের বিবর্ণ ছবির মুখ। সেই প্রতিমার মতন লম্বাটে ভরাট মুখ। মহিষাসুরমর্দিনীর মতন তেজী, ঋজু শরীরের বাঁধন। ধনুকের মত জোড়া ভুরুর তলায় বিশাল একজোড়া চোখ অসম্ভব কালো— অন্ধকারেও যেন ধক্‌ধক করে জ্বলে। তীক্ষ্ণ ঈগলপাখীর মতন নাকে ডালিমরঙের টুকটুকে নাকছাবি আলো করে আছে। ঈষৎ পুরু ঠোঁট পানখাওয়া লাল। একটু ঠোঁট খুললেই ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক লাগায়।

এ মা গায়ের রঙ কি কুচকুচে হয়ে উঠেছে। আর কি যেন মাখা মুখে, গর্জনতেলের মতন, তাতে মাখনের মত গলে গলে পড়ছে কালো রঙের মহিমা। শেষ বিকেলের পড়ন্ত আভা এসে পড়ছে মুখে। আমাদের বিশাল ছাতের সবুজ শ্যাওলাধরা ক্রিকেট পিচের আলো রোদ গড়িয়ে শেষ বিকেল পেরিয়ে নিবু নিবু করছে। একটা দমকা হাওয়া উঠে আমার খোলা পিঠে সুড়সুড়ি ধরিয়ে দেয়— কি গুমোট গরম গেছে দিনটার। সুড়সুড়ি ধরানো হাওয়ায় অজানা আতংকের ইঙ্গিত যেন শিউরে শিউরে ওঠে আমার সারা শরীরে। পালকছাড়ানো মুরগির মতন নিরালম্ব, তীব্র আতংকের অনুভূতি হয়। আজ ঠিক দেখে ফেলেছে, দেখে ফেলেছে··· এতদিনের ভয়ংকর কেলেংকারী। ছাতের চিলেকোঠার পেছনে অনেক বছরের পুরনো সব মূর্তি— কোনটা নাকভাঙা, রঙচটা কোনটার হাড়গোড় বেরিয়ে আছে। যাই যাই করেও টিকে আছে তারা— খেয়াল করে আর বারোয়ারী পুজোর ভাসানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না কোনবারই। বাড়ীর পুজোর মূর্তিই সব। কোনটা লক্ষ্মী কোনটা সরস্বতী। পুরনো নিয়ম অনুযায়ী কারুরই বিসর্জন হওয়ার কথা নয়। আমার সবচেয়ে আদরের সরস্বতী প্রতিমা, গত বছরের আগের বছর এসেছিল, প্রায় আমার বুক সমান উঁচু। এখনো কি তার জেল্লা। সবে ক্লাশ নাইন চলছে— অর্থাৎ তখনকার হায়ার সেকেন্ডারীর প্রথম ধাপ। তাই সরস্বতীর প্রতি আনুগত্য সবচেয়ে বেশী হবার কথা। তার ওপর সায়েন্স স্ট্রীমের প্রথম চালু হওয়া বিকট বিকট অংকের

আতংক। প্রথম যেবার মাটিছোঁয়া প্রণামে আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম ওই সরস্বতীর কাছে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম অসম্ভব ফর্সা পায়ের নীলচে শিরা নিঃশ্বাসের মতন ওঠানামা করছে। সেই দৃশ্য দেখে ঘুমোতে পারিনি সারারাত, প্রবল উত্তেজনায়। পুজো শেষ হয়ে যাবার অনেক পরেও যতবার ছাতের ওই সরস্বতীর কাছে গেছি ততবারই অস্পষ্ট অনুভব করেছি অপসৃয়মান কোন পমেটমের গন্ধ, লুপ্ত মাথাঘষার সৌরভ। কিংবা সুগন্ধি নিঃশ্বাসের হাওয়া। আশ্চর্য চোখ দুটো যেন হাসছে। কখনো আবার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কম্পিত হয় তার ভুরু, প্রবল শাসনেই দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে চোখে। আমি সইতে পারি না, আভূমি আনুগত্য স্বীকার করি, জন্মজন্মান্তরের দাসত্ব প্রার্থনা করি সঙ্গে সঙ্গে। আরো কাছে আরো কাছে এগিয়ে এলে অদ্ভুত রহস্য রোমাঞ্চ হয়। আতংকের আর কোন গোপন সুখের তীব্র অনুভূতি আমাকে ফালা ফালা করে দেয়। আমি তার গালের কাছে আসতেই বীণা ধরা হাতের উদ্ধত বাহু তীব্র শাসনের হুকুমজারী করতে থাকে। আর তক্ষুনি আবার খিলখিলে হাসি শুনতে পাই "কি বোকা তুই, কি ভীতু, ভীতুর ডিম।" আমি সাহস করে এগিয়ে যেতে যেতেই লজ্জায় ভেঙে পড়ি ছিঃ ছিঃ কি পাপ, আমার পাষণ্ড আচরণে সরস্বতীর ঠোঁটের চটা খুলে খুলে পড়ছে। আর তক্ষুনি, আমাদের চিলেকোঠার ভাড়াটে মালকিন, পাড়ার ইস্কুলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমিসট্রেস অপর্ণাদির সদ্য বিকেলের গা ধোওয়ার পরে তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল আছড়ানোর শব্দ আসে। আমি মরমে মরে যাই। দিদিমণি ঠিক দেখতে পায়। শেষ বিকেলের নিবু নিবু আলোয়, অসম্ভব সাদা অর্থাৎ শ্বেতশুভ্র আমার রূপসী দেবীর ব্যাকগ্রাউন্ডে এ কি দৃশ্য! কালো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন মহিষাসুরমর্দিনী। খোলা চুল, চুড়ো করে বাঁধা হল টানটান— অসম্ভব টাইট। এত টাইট যে টনটনে হয়ে ওঠে গলার রগ, কানের লতি। ভিজে দু-একগাছা চুল কানের পাশ দিয়ে লতিয়ে আছে — সেখানে মুক্তোর মতন টলটল করছে একবিন্দু জল। কান দুটোই যা বিশ্রী দিদিমণির। বিশাল, পুরু আর ভারী, উল্টানো খণ্ডতর মতন— গায়ের রং কুচকুচে হয়ে উঠেছে কানের প্যাঁচের গভীরে— কেমন নিষ্ঠুর লাগে ওই জায়গাটায়। গালের কালো তিলটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে টের পাই আরো কাছে আরো কাছে চলে আসছি দিদিমণির। লাল কল্কা পাড় তাঁতের শাড়ীটা পরে আছে আর দুধসাদা ছোট হাতা ব্লাউজ টানটান করে ফুটে উঠছে উদ্ধত বাহু— বাহুমূলের অন্ধকার রেশমী কোমলতার কল্পনাতেও কেমন শিউরে উঠতে হয়। কাছে আসতেই খুব চেনা সেই গন্ধটা নাকে আসে পাউডার আর জর্দা পানের গন্ধ, লালনীল পেন্সিলের গুঁড়োর গন্ধ আর বাটার জুতোর ছাপ দেওয়া চক্‌চকে হলদে স্কেলের সোঁদা গন্ধ— আদরের গন্ধ, শাসনের গন্ধ, শাস্তির গন্ধ।

ঈষৎ পুরু, অল্প খোলা ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠতেই স্পষ্ট হয় ঝকঝকে গজদাঁত। আমার কান্না পায়— লজ্জায়, ভয়ে।

দিদিমণি ভারী ভিজে ফিসফিসে পুরুষালী গলায় ধমক লাগায় "ইস্ খুব যে ভক্তি সরস্বতীর আর ওদিকে যে সেকেন্ড টার্মিনালে অংকে পাঁচ পাওয়া পরীক্ষার খাতাটা আমার চালের ফোকরে লুকিয়ে রেখেছিস সে কথা কেউ জানে ?" আমি চমকে উঠি। আমার দেবী, আমার সরস্বতী দূরে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে। "কেমন, এখন কেমন ?"

আমি ক্রীতদাসের মতন দিদিমণির মুখের দিকে তাকাই। অনেক কষ্টে হাসি চাপা ঠোঁট দেখতে পাই। শাস্তির হুকুম পাবার আগেই সম্মোহিতের মতন দিদিমণির পায়ের কাছে নীলডাউন হই। ততক্ষণে কালো পায়ে অদৃশ্য আলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেইখানে মুখ রেখে হু হু করে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। দিদিমণি আলতো হাতে কান মুলে দেয়। সেই সন্ধ্যা থেকেই বশ্যতাস্বীকার করতে হয়েছিল অপর্ণাদির শাসনের সাম্রাজ্যে। সারা সন্ধ্যে অংক পরীক্ষা নিয়েছিল দিদিমণি। তারপর রাতের খাওয়া শেষ হলে চিলেকোঠায় আবার ডাক পড়েছিল। তখনো কেন জানি না ইস্কুলের দিদিমণির মতনই সাজ পরা ছিল। সেই তাঁতের শাড়ী কল্কা পাড়, সাদা ব্লাউজ আর কাঁধে ব্রুচ আর উঁচু চুড়ো খোঁপা। হাল্কা সেন্টের গন্ধ, ঘেরা দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলো আর ডালিমরঙা নাকছাবির ঝলসানিতে অদ্ভুত লাগছিল। আমি আমার শ্বেতশুভ্রা দেবীর নাম জপ করতে করতে আবার নীলডাউন হয়েছিলাম। আমার কি শাস্তি হয়েছিল তা অনেক কষ্ট করেও স্মৃতির স্টুডিও থেকে আর উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু ওই শারীরিক শাস্তির চাইতেও আজো দগদগে হয়ে আছে আমার নীলডাউন হওয়া ছবি, দিদিমণির কোলের ভেতর গোঁজা থুতনি। আঁর একটা আদরের হাত আমার সারা শরীর বুলিয়ে দিচ্ছে, আমার মুখ চেপে ধরেছে দিদিমণির কোল, আমার নাক ছুঁয়ে যাচ্ছে ভেলভেটের মতন নরম পেটের ভাঁজ আর এই প্রথম— আমার দু-গাল জোর করে চেপে ধরে আমার ঠোঁটে, আমার কান্নাঝরা ঠোঁটে··· । উঃ কি ভয়ংকর সেই শিহরণ, যেন গরম সীঁসে ঢেলে দেয় কেউ, অন্ধ আলকাতরায় চোখ অন্ধ হয়ে যায়। হায় আমার শ্বেতশুভ্রা, এই ছিল তোমার মনে ?

তিন। আশ্চর্য তারা

"এই শোন না, পঁচাত্তর বছর পরে সেই আশ্চর্য তারাটা নাকি দেখা যাচ্ছে রোজ শেষরাতে···শোনই না— তুমি তো ভারী বেরসিক দেখছি !

আমরা দেখতে পাব না ? চল না ওখানে যাই।"

"ওখানে ? ওখানে বোধহয় যাওয়া যায় না সশরীরে। লুই আর্মস্ট্রং গিয়েছিল একবার, তবে সেটাতো আরো অনেক কাছাকাছি।"

"মহাপাজী দেখছি। ওখানে যেতে বলেছি নাকি ? বলেছি, চল না কোথাও যাই

শেষরাতের আকাশ দেখবার জন্য।"

মিতা এবার আমার হাঁটুতে সজোরে ধাক্কা লাগায়। আমার অন্যমনস্কতায় বিরক্ত হয়ে এমন একটা আলটিমেটাম লাগায়…।

"দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি তোমার পার্টির বড় কমরেডদের, তোমার ঘরে শিয়রের কাছে একটা বড় কালীর ফটো আছে এখনো।"

আমি শিউরে উঠি এই অভিনব বদমায়েসীতে। মিতা আবার ঠোঁট ওলটায়— সেই গোলাপী ঠোঁট, ভারী মজা লাগে। "আসলে কি জান তো, যেতে ইচ্ছে করে অনেক দূরে। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্লাউড। নির্জন সমুদ্রের তীরে, কোন বালিয়াড়ির ওপর কিম্বা—।" আমার হাসি পায়। আমার কিছু ভাল লাগে না এখন। বরং কফি হাউসের ভ্যানভ্যানে ভীড়েই একা একা বেশ নির্জন লাগে— সেই নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করতে বেশ লাগে। আর ওই ভীড়ের গুনগুন গুনগুন আওয়াজ বাড়তে বাড়তে কখনো মনে হয় যেন সমুদ্রের ধারেই আছি। আবার কখন বিকট আওয়াজের আছড়ে পড়া ঢেউ, আছড়ে পড়েই হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কফি হাউসের এই মজাটা আমি আর মিতা প্রায়ই গুণে গুণে দেখেছি। খুব শর্ট ইন্টারভ্যালের জন্য কখনো কখনো হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায় সবাই, অথচ সবাই সবার সাথে সাঁট করে, ড্রিল করার মতন একযোগে পা ফেলে এক সেকেন্ড নীরবতা পালন করাচ্ছে এমন মনে হয় না। তবে গৃংটেটা মহাপাজী। যেদিন টেবিলে থাকে এই শব্দজল্পনা সব মাটি করে দেয়। ক্যালকুলেট করতে বসে হঠাৎ এই চুপ মেরে যাবার প্রোবাবিলিটি কত। একদিন পাজীটা উইলিয়াম ফেলারের বই পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল আঁক কষে দেখবার জন্য, বাইনোমিয়াল ডিসট্রিবিউশন এক্ষেত্রে খাটে কিনা! কথা নয়, শব্দের আওয়াজের স্রোত। এই শব্দপ্রপাত শুনতে শুনতে এত মুগ্ধ লাগে যে আর কিছু কানে যায় না। মিতা ভারী রাগ করে ধুপধাপ করে উঠে চলে যায় কোনদিন।

প্রসূন বলছিল, আসলে এই ভাল লাগাটা একটা ধোঁয়াটেবাদের লক্ষণ— যতসব বুর্জোয়া স্পিরিচুয়ালিস্ট বিকৃতি। আমার তর্ক করতে ইচ্ছে হয় না— অবশ্য তর্কের গনগনে আঁচের মধ্যে একটা আনন্দও আছে, একটা খেলা, একটা মজার শব্দজব্দ, এত ইনভিন্সিব্‌ল এই শব্দের মহিমা না। অথচ চারদিকে নানাবিধ শব্দ আসছে ক্রমাগত। থিকথিক করছে পিউপা, লার্ভারা— কেউ বিপ্লবের, কেউ সংস্কৃতির, কেউ বিজ্ঞানের। দিকে দিকে মশাল জ্বলছে— এককোণে গ্রাম্‌সি, একটেবিল কডওয়েল, দু-চেয়ার ভালবাসা (শক্তি চাটুজ্যের সহযোগিতায়) মাঝখানের চার টেবিলে জোড়া দেওয়া "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" কিম্বা "গণফৌজে নাম লেখান" নাম লেখান, নাম লেখান, বিশাল বড় রাবার স্ট্যাম্পের সাইজের চেয়ারম্যানের মাথা, মাওয়ের মাথা। গ্র্যানমাতে ফিডেল কি বলেছে জানো? আরে মারিখেলার ব্যাপারটা কিন্তু খুব গোলমেলে। আমি চুপ করে থাকি। জানি আমার একটা বিকট গোলমাল হয়ে আছে।

ছোটবেলা থেকে বোধহয় পুরুষানুক্রমিক রক্তের ধারায় থেকে গেছে এই গোলমালের বীজ। বিকট দৃষ্টিভোগের এক ইন্দ্রিয় সুখ আমার যুক্তি বুদ্ধি কিম্বা শব্দ শৃংখল ছারখার করে দিতে চায়। আশ্চর্য সব দৃশ্যমালা, ইমেজ কিম্বা চিত্রকল্প আমার শরীর আর মনের ওপর সর্বব্যাপী যে প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে, সময়ে তা সারে না— সেই আমার আজন্ম অসুখ। কবে দেখেছিলাম আশ্চর্য রূপসী আমার দেবীপ্রতিমা, শ্বেতশুভ্র, ভীষণ ফর্সা পায়ের নীলচে শিরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতন ওঠানামা করছে। কিম্বা এক মহিষাসুরমর্দিনী, কালো গ্রানাইটের খোদাই কিম্বা ব্রোঞ্জের মূর্তি। নীচে সবুজ শ্যাওলাধরা ছাদ আর অনেক ওপরের আকাশে শাদা পাখীর ঝাঁক ঘরে ফিরে যাচ্ছে। নিবু নিবু আলোয় ঝলসে ওঠা ডালিম রঙা নাকছাবির সর্বনাশা ঝিলিক। ঈষৎ স্ফীত তীক্ষ্ণ নাকের পাটা কিম্বা বিশাল কান, উল্টনো খণ্ডতর মতন পুরু আর ভারী আর লতিয়ে ওঠা একগুচ্ছ চুলের গোড়ায় মুক্তোর মতন টলটলে একবিন্দু জল। আমার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে, অদৃশ্য পায়ের ওপর মুখ রেখে হু হু করে কান্নার অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা ভয়ানক হয়ে ওঠে। তেমনি গায়ে কাঁটা দেয় স্মৃতিতে আঁকা কিম্বা ছবিতে দেখা কোন নিসর্গ দৃশ্য কিম্বা জলোচ্ছ্বাস। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওই জলোচ্ছ্বাসের মতন ভেঙে গড়িয়ে পড়া আমার রূপসী সরস্বতীর অলৌকিক হাসি। সবুজ ঘন জঙ্গলের গা ছমছম দৃশ্য কেন মনে করিয়ে দেয় ছোটবেলার সবুজ শ্যাওলা ধরা ছাদ কিম্বা ছাদের সেই মালকিনের গা ছমছম শাসনের সান্নিধ্য, আদরের শাসন কিম্বা শাসনের প্রতারণা? তেমনি কোন ভীষণ নাড়া দেওয়া ফিল্ম বা চিত্রকলা অথবা গল্পকবিতার শব্দ বা অর্থ আমার মগজে ঢোকে না কস্মিনকালে। যা আমার মনের ভেতর গেঁথে থাকে, আমাকে জ্বালিয়ে মারে তা হল ওই ছবি কিম্বা গল্পকবিতা থেকে উঠে আসা বিশেষ বিশেষ আশ্চর্য সব দৃশ্যমালা— মনে হয় এক্ষুনি ঘটে যাচ্ছে সব— তার অলৌকিক দৃষ্টিভোগের ইন্দ্রিয় সুখের আমি ক্রীতদাস হয়ে থাকি আজন্ম-আমৃত্যু।

মিতা আমার কলার ধরে টানে— এই কি হল ঘুমোচ্ছ নাকি? আসলে আমি মোটেই ঘুমোইনি কিন্তু পুরনো কলেজবাড়ীর পরিত্যক্ত ক্লাশরুমের বেঞ্চিতে মিতার কোলে মাথা রেখে ঘুমের ভান করতে আমার দারুণ লাগে। আমার মাথার চুল টেনে দেয় আস্তে আস্তে। আমার মুখ ঘন হয়ে ডুবে যায় ওর কোলের ভেতর বিশেষ করে যেদিন সিল্কের শাড়ী পরে থাকে— রেশমের একটা এঁকটা আলাদা ওম আছে। আমার একটা হাত, ভরা গড়ানো কলসীর মতন ওর নিতম্ব ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এই পর্যন্তই। কোনদিন ঠোঁটে ঠোঁট মেলাতে দেয়নি— আর আদর করেনি। কতদিন কবিতা মুখস্থ করে বলেছিলাম "স্তন তার করুণ শঙ্খের মতন" কিন্তু ছুঁয়ে দেখবার পারমিশন পর্যন্ত দেয়নি। রেশমের আলগা গরমে মুখ ঘষতে ঘষতে শিউরে উঠতে হয়। ছোটবেলায় সিল্কের জামা নিয়ে অমনি খেলা খেলতাম, সিল্কে আচমকা নখের ঘষায় কেমন শিহরণ লাগে না? (গুঁটে থাকলে অবশ্য বলত স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি।) তবু

সেই শিউরে ওঠার মধ্যে অজানা আতংকের কল্পনাও ছিল। কখনো কখনো মনে হত নাঃ শুধু সিল্কের শাড়ী নয় আসলে ভেলভেট। অমনি বিদ্যুৎচমকানির মতন মনে পড়ে যেত ভেলভেটের মতন সেই অলৌকিক পেটের খাঁজে আমার নাক ছুঁয়ে আছে—দিদিমণির কোলের ভেতর আমার মুখ। একটা হাতে আমার কান মুলে ধরে আছে আর ছোটহাতা জামার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে শাস্তিরত হাতের বাহুমূলের অন্ধকার রেশমী কোমলতা। আমি ছিটকে পড়ে যাই মিতার কোল থেকে। মিতা চমকায় আর ধমক লাগায় "উঃ কি সব সীন কর না। অন্যমনস্কতা কি তোমার বিলাস।"

সুধীরদা বলত, "না না ইমেজ না থাকলে মানুষ বাঁচে কি করে? এর ভেতরে মার্কসবাদবিরোধী কোন ব্যাপারই নেই। ভেবে দেখ মার্কসবাদ কিম্বা বিপ্লব— যুক্তি-বুদ্ধি পরম্পরায় গড়ে ওঠা মডেল— কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠছে জনগণের প্রত্যক্ষ পার্টিসিপেশনে ততক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসের গতিতে তার কোন দাগ থেকে যেতে পারে না। ভেবে দেখ— অ-এ অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে। শিশুর কাছে 'অ আ' তো হরিবুলি এ্যাবসার্ড কনসেপ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শরীরী একটা চেহারা ফুটে উঠছে আর সেই শরীরী চেহারার ভেতর থেকে, ক্রমাগত সেই ইমেজ চর্চার ভেতর দিয়ে তার এসেন্স নিংড়ে নেওয়া যাচ্ছে···। চীনের পার্টি একটা সুন্দর উপমা দিয়েছে আমাদের জন্যে— জান তো। ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। দেখ, 'আকাশ', 'বসন্ত', 'বজ্রপাত' এগুলো তো চিরন্তন সব ইমেজ— কিন্তু ওই ইমেজ ছাড়া কি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত আমাদের এই সময়?"

আমি বোকার মতন চেয়ে থাকি। আধো অন্ধকারে মিতার ফিসফিস গলা শোনা যায় তারা আসছে একটা—শেষরাতের আকাশে, অনেক বছরের পর। আমি স্বপ্নে দেখি সেই জ্বলজ্বলে অলৌকিক তারা। আকাশে বসন্ত নির্ঘোষের পর আরো উজ্জ্বল, আরো প্রখর হয়ে উঠছে সেই তারা। আর সেই তারার দিকনির্দেশ অনুযায়ী, তারার দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে অনেক মানুষ— নির্জন মরুভূমি কিম্বা বরফের পাহাড় পেরিয়ে একা একা তারা হেঁটে আসছে, হেঁটে আসছে।

চার। ভূমিকম্পের আগে

পিঁপড়েরা কি করে যেন টের পেয়ে যায় বিশাল একটা ওলোটপালট ঘটতে চলেছে মাটির গর্ভে, তাই তারা পিলপিল করে বেরিয়ে আসে— লক্ষ লক্ষ। চীনে তো অনেক-দিনের রীতি আছে বাড়ীতে মাগুর মাছ পোষা আর পোষা মাছের ছটফটানি লক্ষ্য করা। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে থেকেই নাকি অস্বাভাবিক ছটফটানি শুরু হয় তাদের। আসামের বিখ্যাত ভূমিকম্পের আগেও নাকি, অনেকেই লক্ষ্য করেছে, পোষা কুকুর বেড়ালের আচার আচরণ বদলে যায় আচমকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে এই শারীরিক

বিপর্যয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা জানা যায়নি। অন্তত নতুন তারার পুনরাগমনে এইরকম বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে কিনা তারো কোন ব্যাখ্যা নেই। অনেক-দিন বাদে প্রায় সমুদ্রের হাওয়ার মতন লেকের হাওয়ায় উথালপাথাল, ওই লেকতীরবর্তী অনেক উঁচু মিনারের মত ফ্ল্যাটে শরীর জুড়োতে জুড়োতে সুরক্ষিত চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাসুদেব কিম্বা গৌতমের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলাপ করতে করতে কেমন মৌতাত অনুভব করেছি। জিওলজিস্ট হিসেবে দুজনেরই নামধাম প্রায়ই দেখতে পাই এখানে সেখানে— বাল্যবন্ধু হিসেবে গর্ব হবার মতন। কিন্তু তবুও অন্ধকার নেমে এলে, আমুদে, নিরাপদ, লোকজমজমাট রাস্তা দিয়ে লেকের হাওয়া খেতে খেতে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সূক্ষ্ম একটা আতংক গায়ে কাঁটা ধরিয়ে দেয় কেন ? একদা নির্জন, গা ছমছমে লেকের পাড়া তো এখন বেজায় জমজমাট। সামান্য আইসক্রীম খাওয়ার জন্যেও ফুলের মেলা বসে গেছে যেন, ক্রিমসন রঙের স্কার্টপরা আইসক্রীম চোষা মেয়েটার মুখ ভ্যাঙচানোও কি সুন্দর। সালোয়ার কুর্তা কিম্বা জিন্‌স পরা কিশোরী বালিকার ভিড়ে শাড়ী পরা হঠাৎ গম্ভীর মেয়েটাকে ভারী বেমানান লাগে। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের সময়ে বোধহয় এক পার্সেন্ট মেয়ে সালোয়ার কুর্তা কিম্বা জিন্‌স পরত আর ওই সংখ্যালঘু সুন্দরীদেরই সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে দেখত। আর আজ ? এক পার্সেন্টও শাড়ী পরে কিনা সন্দেহ। আর তাদেরই অবাক হয়ে দেখে সবাই। ওই তো মেফেয়ার রেস্তোরাঁ, চীনে খাবারের মশলার চাটনী চাটনী গন্ধ নাকে আসছে আর বাইরের শোকেসে, এ্যাকোয়ারিয়ামে জলের তলায় অরণ্যদেবের বিকট বাহু উঠছে আর নামছে আর তালে তালে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ছে ক্রমাগত। কিন্তু তবু কেন শিউরে শিউরে উঠি, বেজায় শীতে এখনো কেন কপালে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু জলরেখা, বিশেষ করে যখন, আজকে যেখানে মুক্তমঞ্চ, তার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে। ওখানেই তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তিমিরের শরীর। অষ্টমীর রাতে ভ্যান থেকে নামিয়ে রাস্তার ধারেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে। ভ্যানটা টাটা করে পেছন ফিরতেই একঝাঁক অন্ধকার কানামাছির মতন তার চোখ লেপ্টে ধরেছিল, বুকের কোণে একখামচে যন্ত্রণার তীব্র ছটফটানি আর মুখ দিয়ে অনেক রক্ত। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গিয়েছিল মৃগী রোগ ছিল নাকি অনেক পুরনো— তার থেকেই··· সেরিব্রাল সিজার ! কিম্বা যেখানে ফুলের মেলা বসে গেছে আইসক্রীম বাক্স ঘিরে, প্রণবকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখনো তার আঠেরো পেরোয়নি তাই সতেরোটা পেরেক ঠুকে যীশুখ্রীষ্ট বানানো হয়েছিল তাকে। এবার অবশ্য পোস্টমর্টেমে মৃগী পাওয়া যায়নি। যাবে কি করে ? মৃগীতে তো আর পেরেক পাওয়া যায় না খুলিতে। এনকাউন্টার, আতংক, অত্যাচার বিজ্ঞান , রক্ত আর বসা ··। মিতা একদিন করুণ গলায় বলেছিল— "জানো, আজ থেকে বছরখানেক বাদে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেখবে, অনেক পাগল ঘুরছে যাদের বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। জানো, ওদের নাকি নিয়মিত সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টেনে

নেওয়া হচ্ছে শরীর থেকে। সব জেলেই এসব হচ্ছে।" বলতে বলতে ছলছল করে ওঠে চোখ। (আমি তখনো জানতাম না, ওর মেজদার বন্ধু, যার সাথে মিতার বিয়ে প্রায় পাকা হয়ে উঠেছিল ওই রক্তাল্পতাতেই শেষ পর্যন্ত মারা যায় ছাড়া পাবার ক মাসের মধ্যেই।) বলতে বলতে সত্যিই ওর হাত-পা বোধহয় হিম হয়ে যেত। ওর বিবর্ণ মুখে ফুটে উঠত ভয়। "দেখ, দেখ আমার হাতটা কি ঠাণ্ডা।" সেই প্রথম ওর হাত ধরা। আরেকদিন, জমাট শীত পড়েছিল সেবার। আমিও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম "দেখ, দেখ আমার হাতটা আরো ঠাণ্ডা।" ও সাগ্রহে আমার হাত দু-হাত দিয়ে চেপে জড়িয়ে ধরেছিল।

কেন জানিনা ওর দীপ্ত মুখে যেন হাজার পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠেছিল, সেই মাত্র একবারের জন্যেই বোধহয় আমি 'পরিপূর্ণতা' অনুভব করেছিলাম।

কিন্তু আমি কেন আজন্ম শূন্যতার অসুখে ভুগে আসছি? আমার তো কোন বিকট অভাব ছিল না খাওয়া পরার, বা সাধ-আহ্লাদের? (সুধীরদা বার বার মনে করিয়ে দিত। "মনে রাখিস আমরা পার্টিতে পেটের জ্বালায় আসিনি এসেছি বুদ্ধির জ্বালায়। আসলে আমাদের মতন কমরেডদের দায়িত্ব অনেক।") তবু আজীবন এক শূন্য থেকে আরেক শূন্যে আমার লাফিয়ে চলা। কখনো কখনো শূন্য থাকে না— ভরে ওঠে প্রবল আতংকে, যেন ওই আতংকই দূর করে দিতে পারে সব শূন্যতা। কতদিন বাদেও রক্তের মধ্যে বয়ে চলে আমার আজন্ম ভয়ের শিহরণ— অজানা, অবাস্তব তবু অসম্ভবের ভয়। কতদিন আমার ঘরে কোন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে যাবার পর বন্ধুকে পাড়ার ট্যাক্সিতেই তুলে দিয়েছি— তবু হেঁটে হেঁটে পাড়ার ভেতর দিয়ে বাড়ী ফেরবার সময়ে অসম্ভবের আতংকে শিউরে উঠেছি— বোধহয় ফেরার পথেই ট্যাক্সি সমেত লোপাট হয়ে যাবে বন্ধু। ভাঙাচোরা এক স্তূপের মধ্যে গেঁথে থাকবে তার বিকৃত শরীর— আর উল্টে আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে খুনের ষড়যন্ত্রের জন্যে। স্বপ্নে দেখি, আমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে টলস্টয়ের গল্পের মতন— যাকে আঠারো বছর দুঃসহ কারাবাসে কাটাতে হয়েছিল, কেননা খুন করার পর, সরাইখানায় খুনীর রক্তাক্ত ছুরিটা বদমায়েশী করে তার ব্যাগে পুরে দেওয়া হয়েছিল। মিতার বিমর্ষ ঠোঁট আধো অন্ধকারে ফিসফিস করে ওঠে "চল আমরা পালিয়ে যাই। অনেক দূরে। কানাডায়। দাদার বন্ধুরা কেউ কেউ ওখানে সেট্‌ল করেছে। বিপ্লব কি শুধু দেশেই নাকি? ওখানেও অনেক কাজ করবার আছে। ইপানা বলে একটা কি হয়েছে জান? কেন কামগাতামারু থেকে যারা কানাডায় গেছে— সব বিট্রেয়ার নাকি?" আমি হাসতে পারি না, ঠোঁটের লাগামে বিষফোঁড়া উঠেছে একটা দাড়ি কাটতে গিয়ে। সুধীরদা শাসায়, "খুব সাবধান। ডোন্ট এক্সপোজ ইয়োরসেল্ফ। তোকেই গ্রামে যেতে হবে। শহরের এ্যানার্কি তোমার জন্য নয়। অল্পস্বল্প কুরিয়ারের কাজ করতে পার, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মাছ যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে তেমনি তোমাকেও মিশে থাকতে হবে জনগণের ভেতর। মনে রাখবে রাইফেল যদিও শক্তির উৎস আসলে জনগণই মহান,

সর্বশক্তিমান যা তোমাকে লুকিয়ে রাখবে— ধরতে ছুঁতে পারবে না কেউ।"

আমার অস্বস্তি লাগে। এইজন্য শুধু নয় যে এইসব আশ্চর্য শব্দমালা, বোধ-বুদ্ধি বা ইতিহাসচেতনার পরাকাষ্ঠা এই শব্দের জাদু আমার মনের গভীরে কোন ঝংকার তোলে না (অথচ প্রণবরা প্রবল আনন্দ পায় এই শব্দসমৃদ্ধির, মতাদর্শের তক্কোবাজীতে, গুঁটে বলে এক ধরনের 'ওর‍্যাল সেক্স') এইজন্যেও বটে যে শব্দমালার চাইতেও আশ্চর্য দৃশ্য-মালাতেই আমার বশ্যতাস্বীকার। 'জনগণ মহান সর্বশক্তিমান'— এইসব এ্যাডজেকটিভে আমার রক্তের ভেতরে কেন বেজে ওঠে না সেইরকম ছলাৎ ছলাৎ যা অন্য অন্য লড়াকু জনতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে থাকে দুবেলা? কেন আমার ইচ্ছে করে 'মহান সর্ব-শক্তিমান' এইসব শব্দের লিঙ্গপরিবর্তনে— মহিয়সী, সর্বশক্তিময়ী এক আশ্চর্য নারীমূর্তি নিবু নিবু আলোয় প্রখর হয়ে ওঠে। অসম্ভব ফর্সা পায়ে নীলচে শিরা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতন ওঠানামা করে··· কিম্বা গ্রানাইটের খোদাই কালো পায়ের অদৃশ্য আলতা। ওই পায়ের ওপর মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে···হায় আমার ভালবাসা, আমার বিপ্লব, আমার দেবী।

পাঁচ। একটি ইস্তেহার অথবা প্রেমপত্রের খসড়া

শোন মিতা, আমার প্রথম এবং শেষ প্রেমপত্র, যা কোনদিন লেখা হয়নি, তোমাকে শোনাতেই হবে। এই আমার এক অসুখ, শয়নে স্বপনে আমাকে উত্যক্ত করে মারে, যেন তোমাকে না শোনাতে পারলে শরীরের ভেতরের এই তীব্র অসুখ কোনদিন সারতে পারবে না। জানি তুমি খুব বোর হবে, প্রায় আমারি মতন— কিন্তু উপায় নেই, রঘু আর বিনয় নামে দুজন লেখা শিকারী আমাকে ঘাড়ে ধরে কবুল করিয়ে নিয়েছে। কিছুতেই পরিত্রাণ নেই, কাগজ ভরাট না হলে— কেননা এক ফর্মা বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়নি অথচ কাগজ কেনা হয়ে গেছে অতএব ভরাট না হলে আমার মুক্তি নেই।

তাহলে শোন মিতা, সবাই জানে বিপ্লবের জন্য, গ্রামে যাওয়ার জন্য আমি তোমার সব সম্পর্ক ছেদ করে ছুটে চলে গিয়েছিলাম অলংঘণীয় অজ্ঞাতবাসে।

কিন্তু তুমি তার চেয়েও ভাল জান যে একজন ম্যাজোকিস্ট এবং বেসিক্যালি একজন ইমপোটেন্ট-এর সঙ্গে কুমীরডাঙ্গা, স্ট্যাচু-স্ট্যাচু কিম্বা বড়জোর ঘোড়াঘোড়াও খেলা যায় খুব বড়জোর এক বছর কিন্তু তারপর চকলেটের পরিত্যক্ত বাক্স কিম্বা ব্যবহৃত লিপস্টিকের বর্জনীয় পরিশিষ্টের বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে কি? তাছাড়া তোমার দাদারা ততদিনে, গনগনে আগুন নিয়ে খেলার শেষে (যদিও এরা আমার খুবই শ্রদ্ধেয়—বিশেষত মেজদার সেই বন্ধু যিনি ছাড়া পাবার কিছু পরেই রক্তাল্পতায় মারা গেলেন) কানাডায় সেট্‌ল করতে ব্যস্ত। এবং সন্দীপকে দিয়ে তুমিই আসলে খবর পাঠিয়েছিলে— ও তারা তারা চোখে বলেছিল "জানিস দারুণ খবর আছে একটা। আমি জানি না কিভাবে তুই

নিব— ভাবা যায় না···মানে আমাদের মিতা···না না বিয়ে কিনা জানি না তবে কানাডায় যাচ্ছে হয়তো পি এইচ ডি করতে।" তোমার ভিসার জন্য এত ব্যস্ততা ছিল যে আমার সঙ্গে দেখা করবার অবকাশ হয়নি তাই বিলায়েৎ খাঁর দরবারী কানাড়ার এল পি রেকর্ডটা, যা আমার কাছ থেকে অনেকদিন হল কেড়ে নিয়েছিলে গভীর রাতে শুনবে বলে সেটাও সন্দীপের হাত দিয়েই ফেরত পাঠিয়েছিলে। আমার মুড়ির টিনের মতন রেলগাড়ীটা যখন অত্যন্ত অজ একটা ফ্ল্যাগ স্টেশনে আমাকে একা একা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল এবং আমার নতুন হোস্ট নিবারণদা যখন স্টেশন থেকে আমাকে আমার মালপত্রশুদ্ধ সাইকেল রিক্সাতে চাপিয়ে দিল তখন কেন জানি না বিমল করের 'শূন্য' বলে গল্পটা মনে পড়ছিল। আমার স্মৃতি-স্বপ্নের পরম্পরায় একটা অংশ কি কেউ চাকলা করে কেটে ফেলে দিল? তাই তোমার জন্য কোন কষ্ট, যন্ত্রণা এসব কখনো উঁকি দেয়নি। বরং আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এক ধু ধু প্রান্তরের নিস্তব্ধতায়। কতদূরে ধানের আলের বক্ররেখা আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। ভাবা যায় এইখানেই আশীভাগ জনগণের চারণভূমি? (আশী না নব্বই এইসব নিয়ে অনেক তক্ক যা যা শুনেছিলাম সব যেন হু হু হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সংখ্যা নিয়ে গোলযোগের ব্যাপারে সন্দীপ মজা করে বলত—এটা বোধহয় সেই 'আমরা বাঙালী' আর 'বাঙালী আমরা'-র ঝগড়ার মতন। এ বলত 'নব্বই ভাগ বাঙালীর চাকরী চাই' ও বলত 'একশ ভাগ বাঙালীর'— তার মানে অবশ্য একশ ভাগ খাঁটি বাঙালী আর মিশেল দেওয়া নব্বই ভাগ দোআঁশলা বাঙালীও হতে পারে)।

নিস্তব্ধতার যে একটা আশ্চর্য শব্দ আছে সেটা গ্রামে না গেলে বুঝতে পারতাম না। অনেকক্ষণ কানপেতে থাকলে শোনা যাবে সেই শব্দ— একটা অদ্ভুত গমগমে নিস্তব্ধতার আওয়াজ। এতই সর্বব্যাপী অশ্রুত সেই গমগম নিস্তব্ধতা যে কিছুক্ষণ পরে যদি হঠাৎ কোন পাখী ডেকে ওঠে কিম্বা শুরু হয় ঝিঁঝিঁর ঐকতান তাহলে সেই আওয়াজ শোনা যায় হঠাৎ বেজে ওঠা তীক্ষ্ণ কোন যন্ত্রসঙ্গীতের ভাঙা টুকরোর মতন।

অনেক মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল নিবারণদা··· মেহনতী মানুষ যদিও লড়াকু জনতা, সংগ্রামী জনগণ তখনো হয়নি (কিন্তু হওয়ানোর জন্যই তো আমাদের পাঠানো)। তাদের অভাব অভিযোগ দৈনন্দিন দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে কোথায় গুঁজে দেওয়া যায় সেই টাইমবোমা, ঠিক সময়ে যার বিস্ফোরণ তুলকালাম করে দিতে পারে এই অন্ধসমাজের অস্তিত্বে?

শহরের খবর আসত অনেকদিন বাদে বাদে, সাধারণ নিশুতি রাতে, বাজারের থলিতে করে পার্টির নিষিদ্ধ কাগজ সমেত।

শহরে ততদিনে গা-সওয়া হয়ে গেছে নর্দমায় ভাসা লাশ। হাজতবন্দীদের কলজে-ফাটা চিৎকারে (চারহাতপায়ে উপুড় করে শুইয়ে, হাত আর পায়ের পাতার ওপর ভারী বর্মাটিক টেবিলের চারপায়া চাপিয়ে টেবিলের ওপর নাকি নৃত্য করত সেপাইরা) রাত্তিরে অনেক পাড়াতেই ঘুম হত না। এই সময়েই ঘরকুনো অনেক বাঙালীই দলে দলে

বাইরে যেতে বাধ্য হয়। ড্রপ আউটরা শুধু মেস্‌রা, পিশানী বা শিমলাতেই নয় ইউরোপ, এ্যামেরিকার ইউনিভার্সিটিতেও ভীড় জমায় (কে না জানে তাজমহলের জন্য আগ্রা আর আই. কিউ.-র জন্য কলকাতা বিখ্যাত)। এসব খবর নিশ্চয়ই তোমরা বি. বি. সি. মারফৎ শুনতে (তখন ভাগ্যিস সি. এন. এন. আসেনি)।

কুম্বিং অর্থাৎ চিরুনীতল্লাশী চালিয়ে গোরু ভ্যাড়ার মতন যখন তখন বারো থেকে পঁয়ত্রিশদের পাইকারী হারে তখন তুলে নেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রণাবিজ্ঞানের খুব বাড়বাড়ন্ত তখন। এইসব খবর আসত খুব ভাসাভাসা, পাছে আমাদের মর‍্যাল ভেঙে যায়। নিবারণদা প্রায়ই খোঁচাত। আমাকে নাকি বড্ড ভালবেসে ফেলেছে গাঁয়ের মানুষজন। শুধু প্রাইমারী স্কুল আর বয়স্ক শিক্ষার মাস্টার হিসেবেই নয় বিপদে আপদে শলাপরামর্শ নিতেও ডাকতে আসে রাতবিরেতে। এইতো সুযোগ মানুষের দৈনন্দিন অসন্তোষের বারুদে দেশলাইকাঠি জেবলে দেওয়ার। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি না কিছুই। আমার লক্ষ্যে আসে দিনরাতের আশ্চর্য শব্দ পরিবর্তন। নিস্তব্ধতার দ্বিপ্রাহরিক গমগমে শব্দ কখন রাতের নির্জনতার অন্যতর শব্দে বদলে যায়। আর সন্ধ্যের আকাশে কখনো কখনো খুঁজতে ভাল লাগে সেই আশ্চর্য তারা, জবলজবলে তারা যার খোঁজে তুমি যেতে চেয়েছিলে নির্জন কোন সমুদ্রে অথবা বালিয়াড়িতে।

ধু ধু প্রান্তরের আশ্চর্য নিস্তব্ধতার মতই গাঁয়ের মানুষদের অদ্ভুত মুখে কুলুপ আঁটা নিস্তব্ধতা। শোনা যায় তাদের জমিদার নাকি অন্য গাঁয়ে থাকে। যখন তখন তাদের খাজনা আদায়ের নামে ডেকে পাঠায় আর বিকট প্রহারের কালশিটে সারা শরীরে মেখে তারা ফেরত আসে এ ওর ঘাড়ে করে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না কেউ। কেন্দ্র থেকে এত্তেলা আসে প্রায় প্রায়ই। আর কত দেরী কত বাকী! চারদিকে আগুন জবলছে শুধু নিবারণদার গ্রাম যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, আগুনের রিং-এর মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে থাকার বিকট সার্কাস দেখাচ্ছে।

গভীর রাতে জেগে উঠে বসে থাকি। নিবারণদা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। অদ্ভুত গল্প শোনায় একটা যা ওর বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে শুনে এসেছে বংশ-পরম্পরায়। তখন ভারী জঙ্গল ছিল এই দিকটায়। দিনের বেলাতেও বাঘ বেরুত। অনেক দিনের কথা সেসব। কোম্পানীর আমলটামল হবে। ইংরেজদের সঙ্গে কি একটা ভীষণ লড়াই তখন লাগো লাগো। এমনি একদিন জঙ্গলে খেলতে খেলতে নিবারণদার ঠাকুর্দার বাবা (অথবা ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা) রাস্তা হারিয়ে ফেলে। ওদিকে সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। গাছের পাতায় পাতায় গা-ছমছমে শিরশিরে হাওয়ার শব্দে কান্না পেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জঙ্গলের মাঝখানে একটা পরিষ্কার মতন জায়গায় খানিকটা উঁচু চাতালের পেছনে উঁকি মেরে বসে একটা বহুদিনের পুরনো জীর্ণ কুঠি, আর কি আশ্চর্য তাতে গ্যাসবাতি জবলছে ভেতরে। পুরনো ভারী পর্দার ঘোমটা হাওয়ায় উঠে উঠে একঝলকে দেখিয়ে দিচ্ছে ভেতরকার ভারী পুরনো কাঠের আসবাবপত্র আর জৌলুশ। ছেলেটা (অর্থাৎ

ঠাকুন্দা) এক দৌড়ে চাতাল পেরিয়ে ভেতরের বৈঠকখানায় ঢুকতেই অবাক। একটা হলঘরের মতন বিশাল জায়গা, কেমন দরবার দরবার ঢঙে সাজানো। পুরনো গালচে সিঁড়ি থেকে পাতা সোজা চলে গেছে ঘরের শেষপ্রান্তে উঁচু মতন একটা সিংহাসনের তলায়। সিংহাসনের ওপর ঘর আলো করে বসে আছে মুকুটপরা বনের রানী। রং যেন দুধে-আলতার মতন, আলতাপরা পা এত ফর্সা যে ভেতরের নীল শিরা পর্যন্ত স্বচ্ছ জলের ভেতরকার মাছের খেলার মতন দেখা যায়। প্রতিমার মতন ভরাট লম্বাটে মুখ ভারী সুন্দর, তীক্ষ্ন নাক, বিশাল কান— তাতে নীল হীরের দুল ঝলসে ঝলসে ওঠে। কিন্তু চোখ দুটোই যা ভয়ংকর— এত নির্মম ক্রূর দৃষ্টি হতে পারে কারোর…। কুচকুচে দুটো ভুরু মর্মান্তিক কোন শাস্তির ইঙ্গিতে কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। বাঘের ছালের শাড়ীর ভেতর দিয়ে আগুনের শিখার মতন শরীর দেখা যাচ্ছে। আরেকটা বাঘের ছালের ওপর দু-পা আর দু-পাশে বাঘের মতই দুটো ডালকুত্তা— তাদের ঝোলা জিভ আর লালা গড়ানো হিংস্র মুখ ভীষণ হয়ে উঠছে। অন্ধকারে নিবারণদার ফিসফিসে গলা জড়িয়ে জড়িয়ে আসে আর স্পষ্ট দেখতে পাই যেন আমিই নিবারণদার সেই ঠাকুন্দার ঠাকুন্দা, পুরনো গালচের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে কোন অলঙ্ঘ্য নির্দেশে ওই বনবিবির পায়ের কাছে এসে পড়েছি! হিংস্র বাঘের মতন ডালকুত্তার দুটো থাবা উদ্যত হয়ে উঠতেই বনবিবি প্রচণ্ড ধমক লাগায় আর কুত্তা দুটো ঘেউ করে উঠেই থমকে যায়। বাজ পড়ার মতন চিৎকার শোনা গেল একটা "সাহস বড় কম নয় তো! এখানে আমার শাস্তি কি জানিস ?" বলতে বলতে আমার গায়ে গরম গরম লালাঝরানো নিঃশ্বাস পড়ে ডালকুত্তা দুটোর। বনবিবির পায়ের তলায় হাঁটুগেড়ে বসা আমার শরীর। দারুণ আতংকে চোখ বুজতেই হুকুম শোনা যায় 'চোখ খোল'। চোখ খুলতেই গা শিউরে ওঠে — বনবিবির হাতে লকলক করে উঠছে বিশাল সাপের মতন প্যাঁচানো চাবুক, তার মুখটা সাপের ফণা ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। আবার আতংকে চোখ বুজতেই আকাশ ফাটানো হাসি শোনা যায়।

আসলে আমার ওপর খুব দয়া হয়েছিল বনবিবির। তাই অবাধ্যতা করলে কি পরিণাম হতে পারে তার অভিনয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিল! আর কিছু বলেনি। একবছর বনবিবির অকপট দাসত্ব স্বীকার করে নিলে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফেরার বন্দোবস্ত করে দেবে এইরকম শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল অবশেষে। আর প্রথমদিনই ভয়ংকর শাসানি দিয়ে রেখেছিল ভুলেও যেন দরবারের পাশের তালাবন্ধ ঘরটার চাবির ফুটো দিয়ে কিছু দেখতে না চাই। দেখলেই ভয়ংকর বিপদ।

আমার রাজসিক খাওয়া পরার কোন অভাব রাখেনি জঙ্গলের রানী। দিনেরবেলায় প্রায় দেখাই হত না কেননা মাঝদুপুরের আগে রানীর ঘুম ভাঙত না। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলেই শুরু হয়ে যেত সাজগোজ পর্ব। ভীষণ কেতাদুরস্ত না হয়ে থাকলে বেজায় বিরক্ত হত রানী। রাত্তিরের ডিনার হত, এক টেবিলে আমি আর রানী আর

পায়ের কাছে দুটো ডালকুত্তা। কিন্তু আমি ঠিক জানতাম পাশের ঘরের রহস্য আমাকে ভাঙতেই হবে, ভাঙতেই হবে। তারপর একদিন নিশুতি রাতে আমার ঘরের তালাবন্ধ করতে সেদিন ভুলে গেছে, পা টিপে টিপে হাজির হই দরবার হলে, চোখ রাখি পাশের দরজায় চাবির ফুটোয়। দেখি এক বিকট দৃশ্য। দেয়ালের আংটায় আংটায় মশাল জ্বলছে অনেক। ঘরের একপাশে সারসার পাথরের মূর্তি। আগুনরঙা জামায় বনবিবিকে দেখাচ্ছে লকলকে শিখার মতন। তার এক হাতে ধরা বিশাল সাপের ফণাওয়ালা সেই চাবুক নির্মম গতিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ওই মূর্তিগুলোর পিঠে, বুকে, সারাশরীরে, একটা অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ, ঘুঘু পাখীর গুমরে ওঠার মতন, মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ডালকুত্তা দুটো মুখে কামড়ে ডজন ডজন চাবুক এনে রানীর পায়ের কাছে ফেলছে আর ভয়ংকর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শ্লিক্ শ্লিক্ শ্লিক্ আর ততই বীভৎস হয়ে উঠছে রানীর হিংস্র দৃষ্টি। সব শেষ হয়ে এলে ঘরের একপাশের পর্দা ঠেলে দেয় রানী। সেখানে গোপন দেরাজ থেকে বেরিয়ে আসে একটা সোনার কৌটো। কৌটো খুলতেই একটা রঙীন প্রজাপতি গুনগুন করতে করতে রানীর খোঁপায় এসে বসে। কৌটোর একটা ডালায় ছোট্ট আয়না···সেখানে ফুটে উঠেছে অনুপম এক সদ্যকিশোরী মুখ, সেখানে কোন পাপ নেই, হিংসা নেই, নিষ্ঠুরতা নেই। অনেকক্ষণ প্রসাধন করে রানী মন দিয়ে তারপরই গুনগুন করতে করতে প্রজাপতিটা ঢুকে পড়ে সোনার কৌটোয়। হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস আমার শরীরে পড়তেই বাজ পড়ার মতন আওয়াজ হয়, বন্ধ দরজা বিকট আওয়াজে খুলে যায়। রানীর চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি হিংস্রতম হয়ে ওঠে আর প্রবল বাজ-পড়ার মধ্যে বুঝতে পারি আমিও একটা পাথুরে মূর্তি হয়ে যাচ্ছি, আমার হাত পা অসাড়, পা দুটো কেউ মেঝের সঙ্গে আটকে দিয়েছে।

অন্ধকারে নিবারণদার গলা আরো জড়িয়ে আসে। বুঝলি ওই মূর্তিগুলি ছিল আসলে রানীর ক্রীতদাস। রানীর চোখের শাসনেই ভয়ে পাথর হয়ে যেত তারা। টিকটিকি যেমন করে সম্মোহিত করে তার শিকার, কেমন পাথর হয়ে যায় টিকটিকির দৃষ্টিতে, আত্মসমর্পণ করে শিকারীর কাছে তেমনি ওই ক্রীতদাসেরাও সম্মোহিত আত্মসমর্পণ করত রানীর চাবুকের কাছে। অথচ ওই রানীটার মৃত্যু ছিল কত সহজ, একেবারে হাতের কাছে ওই দেওয়ালের পর্দার আড়ালে। অথচ কেউ জানত না, জানার চেষ্টাও করেনি— তাই এত আতংক। যা না জানা তাইতো ভয়?

আরো অনেক পরে একদিন ভোরবেলায় একপাল ছেলেমেয়ে কানামাছি খেলতে খেলতে ঢুকে পড়েছিল রানীর ওই গুহায়। খেলতে খেলতে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই তারা পর্দায় হাত বাড়ায়। পর্দা খুলে আত্মপ্রকাশ করে সেই দেরাজ আর দেরাজের ভেতর সোনার কৌটো। টানাটানিতে সোনার কৌটো খুলে যায় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে, বেরিয়ে আসে সেই প্রজাপতিটা। অমনি বিকট আওয়াজে রানীর ঘুম ভেঙে যায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে দেখা যায় সেই প্রজাপতির পাখা মেলা, ছেলের দলের দৌড়

আর রানীর ক্লান্ত দৌড় পেছন পেছন। যত দৌড়য় ততই হাঁপ ধরে রানীর। বিচ্ছিরি বিকট হয়ে ওঠে তার শরীর। হাড়গোড় বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এক লোলচর্ম ডাইনী। অবশেষে এক গুলতির আঘাতে প্রজাপতিটা ডানা ভেঙে পড়ে যেতেই হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ে রানী অথবা লোলচর্ম সেই ডাইনী, কোথায় সেই রূপ আর জৌলুশ, বীভৎস হাড়জিড়জিড়ে এক ডাইনীর মৃতদেহ অনেকক্ষণ পড়ে থাকে সেই জঙ্গলের মাটিতে আর সমস্ত পাথরের দল মানুষ হয়ে ঘরে ফেরৎ আসে।

অন্ধকারে নিবারণদার নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু আমার ঘুম আসে না। পর পর অনেকগুলো বাজ পড়ে যেন আর বিকট বিদ্যুতের ঝিলিকে আমার সেই গোপনতম স্বপ্ন অথবা বাস্তবেরই একটুকরো প্রজাপতির মতন পাখা মেলে আত্মপ্রকাশ করে। কাউকে বলিনি এতদিন··· কাউকে না।

আমার সেটাই ছিল বাল্যকালের শেষ বছর। সামনেই টেস্ট পরীক্ষা তারপরেই হায়ার সেকেন্ডারী (ক্লাস ইলেভেন তখন)। ছাতের ইস্কুলে তখন অপর্ণাদির শাসনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে আর সেই সাম্রাজ্যের একনম্বর উপনিবেশ আমি। ফার্স্ট টার্মিনালে বাজে নম্বর হলেও হাফইয়ার্লিতে আমার নম্বর বেজায় ইম্প্রুভ করেছে।

কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসে না— অদ্ভুত এক ক্লান্তিতে ছেয়ে থাকে আমার শরীর। সেই ক্লান্তির ভেতরে কোথাও একটুকরো গোপন আতংকের সুখ, বীভৎস সেই সুখ অন্তর্লীন হয়ে থাকে। রোজ সন্ধ্যেবেলা খেলার শেষে আমি আর সন্দীপ মাঠের শেষ প্রান্তের পড়ো দেয়ালটার সামনে হাজির হই। দেয়ালের ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে সেই অদ্ভুত ছবির এ্যালবামটা। বোধহয় বিলেত থেকে আনানো— এত সুন্দর তার ঝকঝকে ছবি আর ছাপার কাগজ। ছবি··· ছবি অনেক ছবি। অদ্ভুত সেই মেয়েদের ছবি তাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উদ্ভট সব ব্যাপার। কোনটায় জামা গায়ে দেওয়া, কোনটায় নেই। যেগুলোর জামা গায়ে দেওয়া সেগুলো আরো মোহময়ী, আরো বিচিত্র। সেই এ্যালবামটা এক সপ্তাহের জন্যে ধার চেয়ে প্যান্টের পকেটের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। কখনো মোটা লাল বাঁধানো স্কলার খাতাটা, কখনো বা বিশাল জ্যামিতি বই-এর ভেতরে তার বাস। নিশুতি রাতেও পড়ার নাম করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসতে হয় জ্যামিতি বইটা সঙ্গে নিয়ে, সামনে খোলা থাকে আঁক কষার এক্সারসাইজ খাতা। সাদাই থেকে যায় পাতার পর পাতা। দিদিমণি খুশীও হয় আবার বোধহয় সন্দেহের মেঘও জমতে থাকে মনের ভেতরে যার হদিশ পাওয়া যায় না বাইরে থেকে। এত যদি পড়ার ধুম তবে হোমটাস্কের এইসব সিলি মিস্টেক আসে কোথ থেকে ? আমি উত্তর দিতে পারি না। মুখ নীচু করে থাকি, আর অভ্যেসমতন নীলডাউন হয়ে দিদিমণির হাতে কানমলা খাই। আমার পাহারা আরো কড়া হয়। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে জল খাবার নাম করে স্কলার খাতাটা হাতড়ে নেবো ভাবতে না ভাবতেই চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দেয় দিদিমণির হাত। কখন উঠে এসে লক্ষ্য করছে আমাকে। "কিরে ঘুম হচ্ছে না বুঝি।

এত রাতে আর লেখাপড়া করে শরীর খারাপ করতে হবে না। নে তোর মাথায় একটু আরাম করে দিচ্ছি— ঘুমিয়ে পড়।" আমার খুব অপরাধী-অপরাধী লাগে। পরদিন দুপুরে টেনে ঘুম লাগাই। সারা সকাল বিদঘুটে অংকের হোমটাস্ক করে খাতা জমা দিয়ে দিয়েছি দিদিমণির হাতে। চোখ কচ্‌লে উঠতে উঠতে দেখি দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল, আলো নিবু নিবু হয়ে আসছে।

সদ্য গা ধোওয়ার পর অপর্ণাদি কেন যে হর্সটেল করে টানটান বেঁধে ফেলে চুল কে জানে। কিন্তু এই শেষ বিকেলের আলোয় কোমল স্নেহবতী মুখ আরো কোমল হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তার বদলে প্রখর হয়ে উঠছে গ্রীক প্রতিমার মতন লম্বাটে মুখ। কি যেন মাখা মুখে তাতে কালো রঙের মহিমা গলে গলে পড়ছে। কুচকুচে কালো চোখের তারা আর ভুরু প্রখরতম হয়ে উঠতেই মনে হয় কি কঠিন, কি নিষ্ঠুর। হোমটাস্কের খাতাটা ফটাস্ করে আমার বিছানায় ফেলে দিয়ে কঠিন নিঃশ্বাস ফেলে— "এই তোমার হোমটাস্ক।" আমার একটা কান পেঁচিয়ে ধরে আবার প্রচণ্ড সেই নিঃশ্বাস — তাতে জর্দা পানের গন্ধ, লালনীল পেন্সিলের গন্ধ, অদ্ভুত সুন্দর একটা আতরের গন্ধ···। আবার সেই নিজেকে ছালছাড়ানো মুরগির মতন মনে হতে থাকে, একটা অশরীরী অনির্দেশ্য, তীব্রতর যন্ত্রণার মতন— যেমন মনে হয়েছিল অনেক কাল আগে শ্যাওলাধরা সবুজ ছাতের ওপর সরস্বতীর গলা জড়িয়ে ধরে ধরা পড়ে যাওয়ার সময়ে। (কিন্তু সেদিন তো শাস্তি দেয়নি, আদরই করেছিল অবশেষে।) আতংকে শিউরে উঠতে উঠতে আবিষ্কার করি হোমটাস্কের আসল খাতাটার বদলে সেই লাল স্কলার খাতাটা কি করে ভুলে সাবমিট হয়ে গেছে। স্কলার খাতার জামা খুলে বেরিয়ে পড়েছে ছবির এ্যালবাম আর এ্যালবাম জুড়ে খ্যালখ্যাল করে হেসে চলেছে স্বল্পবাস নিষ্ঠুর সেই সুন্দরীর দল। আমার দুর্দশায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে তারা, কেউ খুলে ফেলছে জামার বোতাম, কেউ তার নিপুণ বাহু উদ্যত করে— কি ভয়ংকর সেই বাহুমূল, মসৃণ রেশমের মত তার নিষ্ঠুর কোমলতা— স্বল্পবাস বক্ষবন্ধনীর পেছনের ফিতে খুলতে ব্যস্ত। দেওয়ালজোড়া আয়নার সামনে আমি নীলডাউন হয়ে দেখতে পাই দিদিমণির হাতে লালটুকটুকে একটা লকলকে বেত যা সপাং সপাং করে আমার পিঠে আছড়ে পড়তেই গোটা দেওয়াল আয়না জুড়ে, সাপখেলানো সুর কিম্বা ডুগডুগির আওয়াজ অথবা পিয়ানোর আশ্চর্য ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলেছে এ্যালবামের সেই নিষ্ঠুর সুন্দরীর দল। সেদিন আমি সারারাত বিছানায় উপুড় হয়ে কেঁদেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে এমনি পাথর হয়েছিলাম যে অপর্ণাদি অনেক অনুনয়বিনয় করেও খাওয়াতে পারেনি। নিশুতি রাতে অনুভব করেছিলাম আমার খাটের পাশে অপর্ণাদি পাথরের দেবীপ্রতিমার মতন বসে, হাত দিয়ে দুচোখ ঢাকা আর অস্পষ্ট ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ, যেন ঘুঘুপাখীর আওয়াজের মতন গুমরে গুমরে উঠছিল। সেই আশ্চর্য দেবী-প্রতিমার পায়ের কাছে বসে আমি কোলে মুখ চেপে দিতেই শিউরে উঠেছিলাম

ভেলভেটের মতন নরম পেটের খাঁজের স্পর্শে, আমার নাকের ভেতর চেপে বসেছিল দুই স্তন, অস্পষ্ট বোতাম খোলার আওয়াজ টের পেয়েছিলাম। কি প্রবল প্রভুত্বপরায়ণ, কি অসম্ভব মোহময়ী সেই স্তন। আমার ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে গলে গলে পড়ছিল প্রবল নিষ্পেষণে— যেন বিশাল এক জলপ্রপাত আছড়ে আছড়ে পড়ছে পাথরের মতন — প্রচণ্ড সেই প্রপাতে পাথর কেটে কেটে ভেঙে পড়ছে— যেন প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, ঝড় উঠেছে ভীষণ। সত্যিই প্রবল ঝড় এসেছিল। জানলা ভেঙে পর্দা খুলে একাকার। আমি চোখ কচলে নিবারণদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলাম কেননা বাইরে প্রবল ঝড় উপেক্ষা করে আকাশের গায়ে গায়ে মশাল জ্বলে উঠেছে— অনেক আশ্চর্য তারা কি করে উঠল ঝড়ের রাতে ? আসলে তারা নয় মানুষ, অনেক মানুষ যাদের যুগযুগান্তরের ক্রোধ মশাল হয়ে জ্বলে উঠছে। তাহলে কি সত্যিই বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। বাইরে বাজ পড়ার আওয়াজ। জল আর বন্যা··· আর মানুষের বন্যা। সত্যিই জেগে উঠছে ঘুম পাড়ানী গ্রাম।

ফলে অনেক রক্তের বন্যা বয়ে যায়। অনেক লাশ। অনেক ঘাম কান্না আর রক্ত। এসব তো তোমরা খবরের কাগজে দেখেছ। কিম্বা এ্যামেরিকার র‍্যাডিকাল কাগজপত্রে অথবা চ্যানেল সিক্স-এ। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসেব অনুযায়ী কত রাজনৈতিক বন্দী ছিল তখন সারা পৃথিবীতে? পঁচিশ লাখ? তার থেকে কয়েকশো বেশী হলে কি ক্ষতি? একদিনে চব্বিশ ঘণ্টায় কত মিনিট কত সেকেণ্ড? কিন্তু থিওরি অফ রিলেটিভিটি কি বলে। জেলের একদিনেও কি অত ঘণ্টা অত মিনিট?

ছয়। আই হ্যাভ এ ড্রীম

শাশার দোকানে রাজস্থান থেকে খাঁটি কারিগরের দল বসে থাকে তাদের এথ্‌নিক সাজপোষাক পরে— কেউ বুনতে থাকে জামাকাপড় কেউ হাতের কাজ করে যায় নিপুণ-গতিতে। দেখাদেখি সরকারী মেলাতেও ময়দানের প্যাভিলিয়নে দেখানো হয় একইরকম দৃশ্য। অথেনটিসিটির একটা ব্যাপার আছে তো। চারদিকে এত জৌলুশ আর এত উঁচু উঁচু বাড়ী উঠেছে— বিপ্লবের সময়ে ছিল না। অনেক কমরেডরা যারা জেল থেকে বেরিয়ে উঁচু বাড়ী তৈরী করার ঠিকেদারী করে দিনগুজরান শুরু করেছিল তারা কেউ কেউ এখন কোটিপতি কনসালট্যান্ট-আর্কিটেক্ট। প্রগতিশীল বাম সরকার আসার পর আমূল বদলে গেছে শহরের চেহারা। সংস্কৃতির দারুণ উন্নতি হয়েছে— রেসের মাঠ নিকটবর্তী এলাকা এখন এমন এক দারুণ কালচারাল কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ যা সারা দেশে কোথাও নেই— সেখানে কখনো আলো যায় না। এত মোটরবাইক আর স্কুটার চারদিকে — তারপর মেট্রোরেলে যাতায়াতের সুরাহা হয়েছে অনেক বেশী। অবশ্য নিন্দুকের অভাব কখনোই ঘটে না কোন দেশে। যারা কিছু পায়নি তারা ভ্যাঙায়, 'ধান্দামূলক

বস্তুবাদের' কল্যাণে নাকি দেশ ছেয়ে গেছে 'ডেমোক্র্যাসি অফ করাপশন'। কিন্তু এটা ঠিক, অনেক লোকের হাতে অনেক বেশী পয়সা এসেছে, অনেক নতুন নতুন রোজগারের ধান্দা বেড়েছে যেমন মিনিবাস, জমিবাড়ী, টিভি সিরিয়াল, যেখানে সেখানে বর্ষার ফনফনে লাউডগার মতন বেড়ে ওঠা নানারকম খবরকাগজ আর কাগুজে ধান্দা কিম্বা একটু সাবঅলটার্ন লেভেলে গেলে— অলিতে গলিতে রোলের দোকান— ফার্স্ট ফুড কিংবা জাংক বাইট।

'জনগণ'-এর কি হয়েছে না হয়েছে ভেবে যারা খাবি খেত তারাও বুঝতে শিখেছে 'জনগণ' আসলে একটা এ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট। কিন্তু এমনকি 'জনগণও' যখন আসে সরকারী তাঁতমেলায় বা শাশার দোকানে অথেনটিসিটি বৃদ্ধির জন্য— তখনো কিন্তু মনে হয় না তারা সেইরকমের না খেতে পাওয়া খেটে খাওয়া জনতা যাদের বাচ্চাদের মাথাসরু পেটমোটা ছবি 'হু'-র পোস্টারে শোভাবর্ধন করতে দেওয়া যায় কিম্বা যাদের কংকাল চেহারা নিয়ে 'দুর্ভিক্ষ সিরিজ'-এর একজিবিশন হতে পারে এ্যাকাডেমিতে। আর শোনা যায় না রাস্তায় রাস্তায় হারমোনিয়াম সহযোগে "মেদিনীপুরে মা বন্যা এসেছে"…। আসলে 'শ্রেণী' বা 'ক্লাস'-এর ধারণা তো— ফর এ্যানালিটিক্যাল কনভিনিয়েন্স। বিপ্লবের সময় যারা ছিল অত্যন্ত হরিজন অর্থাৎ যাদের খুনে কিম্বা সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এখন সেটাই তাদের গর্বের কারণ— কে না জানে হরিজনদের দেশ ভারতবর্ষে এস-সি, এস-টি-দের আলাদা আদর। আর তাদের মধ্যে, যারা শুক্কুরবার শুক্কুরবার বের হওয়া গ্লসি খবরকাগজের ভাষায় 'ক্রিম দ্য লা ক্রিম' তাদের সাগ্রহে টেনে নেয় এ্যামেরিকা-কানাডা কিম্বা জার্মানি। মাও পর্যন্ত বলেছিলেন মাস প্রোডাকশন এবং টেকনোলজি যদি শিখতে চাও এ্যামেরিকার দিকে তাকাও। তারা জানে কি করে গুণীর আদর করতে হয়। সেই সময় নিয়ে যেসব গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে চারদিকে স্বনামধন্য লেখকদের কলমে, বিশ্বখ্যাত পরিচালকদের ক্যামেরায়— ভাবতে গর্ব হয় তার নায়ক নায়িকারা অনেকেই আমার ছোটবেলার বন্ধু। বিশেষ করে ফিল্মের ব্যাপারে যে 'বুম' হয়েছে, অবাক করে দেওয়ার মতন।

আগে অলিতে গলিতে চায়ের আড্ডায় পকেটে ঘুরত মাও-এর লাল বই এখন ঘোরে ছবির স্ক্রিপ্ট। আমিও লিখে ফেলেছিলাম ওইরকম স্ক্রিপ্ট কিন্তু লাইন করতে পারিনি। কেউ কেউ বলছিল এইসব প্যারালেল ফিল্ম নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ হলে মন্দ হয় না— সেখানে এই বিকল্পছবির বা বিকলাঙ্গছবির ফেরিওয়ালাদের মুখোশ একটানে খুলে দেওয়া যায়। যারা বলছিল তারা অবশ্য কেউ টাকা পায়নি ছবির জন্য। তবে এইসব ওয়ার্কশপটপের একটা বেনিফিট হচ্ছে, ঠিকমতন ধোলাই লাগাতে পারলে ধোলাইকারীদের আপ্‌সে আপ খাতির করতে শুরু করবে এন. এফ. ডি. সি. কিম্বা টিভি। অবশ্য অন্য নানা ধরনের ওয়ার্কশপ বা সেমিনারে আমারো ডাক পড়তে শুরু করে অথেনটিসিটি বৃদ্ধির জন্য। ওই শাশার দোকানের এথ্‌নিক লোকজনের

মতন আর কি। এমনি একদিন একটা জমজমাট সংস্কৃতিমেলার শেষে ভোজনসভায় অকস্মাৎই দেখা হয়ে যায় মিতার সাথে। আরো সুন্দর লাগছে আগের চেয়ে। সেই প্রখর চোখ আর গোলাপী ঠোঁট— একাগ্র হয়ে চেয়ে দেখছিল আমাকে। ও হাসে "কি চিনতেই পারছ না যে একেবারে।" আমিও হাসলাম এই যেন কালকেই দেখা হয়েছিল এইরকম ভাবে। ভয়ে ভয়ে অবশ্য একবার চারদিকে চেয়ে নি। এটা সেই ডালহৌসির গোল গুদামঘরটা নয় তো! কোথাও তো ওয়াল পোস্টার নেই ঘন সবুজ জঙ্গলের কিম্বা নীলআকাশের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সাদা পাখীর। ঠিক আগের মতনই শাড়ী পরা পেঁচিয়ে। এতটুকু শরীর দেখা যায় না। ক্যানাডা থেকে ফিরে কি আরো কনজারভেটিভ হয়ে গেছে। "ওঃ আমার কর্তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই" (আঃ 'কর্তা' আবার কি কথা? শুনলে 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদিকা ধরে ধোলাই দেবে না… ওই তো কাছে-পিঠেই আছে)। "যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে, লাহিড়ীর কাছে আপনার কত গল্প শুনেছি।" কাগজে ছবি ওঠা চেনা চেহারার স্মার্ট ভদ্রলোকটি আমার দিকে হাত বাড়ায়। আমার অস্বস্তি লাগে। দেশে ফিরে বোধহয় আই.আই. এম. টেম-এ জয়েন করেছে। কোথা থেকে সন্দীপ এসে হাজির হয়— চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যায় আমাকে। কতদিন পরে দেখা— কতদিনের কথা— কতদিনের স্মৃতি যে জমা হয়ে গেছে। আমাকে রাশিয়ান ভোদ্‌কা খাওয়ায়। কি ভয়ংকর কড়া। আমার খুশী খুশী লাগে। আবছা হয়ে আসছে আলোর জৌলুশ। ওই তো আসছে সবাই আমার স্মৃতির এ্যালবাম থেকে। কেউ মাথায় চাঁটি লাগিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা আদর করে পিঠ থাবড়ে যাচ্ছে কেউ। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে পুরনো বন্ধুরা তাদের ছেলেমেয়েদের। আমি কি সাদা বাঘ নাকি? এসো এসো মা এদিকে আসছ না কেন? ক্রীমসন রং-এর স্কার্টপরা মেয়েটা— সন্দীপের আন্ডারে সোসিওলজি নিয়ে রিসার্চ করছে, কি সুন্দর। আমাদের সময়কার মেয়েদের মতন ভারিক্কি গম্ভীর গম্ভীর ভাব নয় দেখো এখনো কত কচি হয়ে আছে, কত ছোট্ট কত সুন্দর। সৌন্দর্যের ঢল নেমেছে যেন চারদিকে। তুমি তো বেজায় ভোঁদা হে! মানুষ কি দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে আমরণ বেঁচে থাকে নাকি? কবে কি হয়েছিল ষাটের শেষ কি সত্তরের শুরুতে তাই নিয়ে আজীবন অশৌচ পালন করতে হবে? আমার চারদিক দুলতে থাকে, মাটি কেঁপে ওঠে। কানের কাছে কেউ দাড়ি নেড়ে বাণী শোনাতে আসছিল 'দোজ হু ফরগেট দি পাস্ট আর কনডেম্‌ড টু রি লিভ ইট' আমি লাথি মেরে সরিয়ে দিই। আরে দাড়ি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ বলেই সব আপ্তবাক্য ঢকঢক করে গিলতে হবে নাকি? আঁশ্চর্য। সবগুলো দাড়িওয়ালা— কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস থেকে শুরু করে আমাদের খোদ রবিঠাকুর— যাবতীয় ধর্মের ঠাকুরদের তো বাদই দিলাম। আর দাড়ি থাকা মানেই পরমজ্ঞানের লক্ষণ নাকি? আসলে কি হয়েছিল সেই ত্রয়োদশ না চতুর্দশ লুই-এর আমলে? যখন ক্ষুর-এর ব্যাপক প্রচলনে সবাই দাড়ি চাঁছতে শুরু করেছিল। গ্রাম শহর উজাড় করে যাবতীয় সুন্দরীরা মিছিল করে হাজির হয়েছিল

দরবারে। দাড়ি উৎখাত হওয়ার ফলে নাকি চুম্বনের স্বাদ আর পাওয়া যাচ্ছে না।

হুঃ হুঃ, আমাকে দাড়ি দেখিও না, আসল খবর সব ফাঁস করে দেব। কিন্তু একি—পৃথিবীর যাবতীয় দাড়িওয়ালা স্ট্যাচুগুলো আমাকে তাড়া করছে কেন? আমি ছুটতে থাকি, ছুটতে ছুটতে চটি খুলে যায় আবার লাগাই। অনেকগুলো স্যুভেনির দিয়েছিল ওরা। কাগজগুলো টুকরো টুকরো করে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারি পেছনে। কেনা জানে ওই জ্ঞানীবৃন্দরা আসলে জ্ঞানী ভল্লুকের মতনই ডেঞ্জারাস। ওই একদলা কাগজ পেলেই নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেখবে কি আছে ভেতরে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দলা পাকিয়ে মণ্ড হয়ে যায়, আর ওই কাগজের দলা শুঁকলেই তাদের জ্বর আসে ঠিক একমিনিটের জন্য—জ্ঞানজ্বর বলা যায়। ততক্ষণে আমি ছুটে পালাতে থাকি আরো জোরে আরো জোরে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের পুরনো বাড়ীর সামনে হাজির হই। কোথায় সেই বাড়ী আর সবুজ শ্যাওলাধরা ছাত? এতো এক বিশাল মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাট। দূর থেকে ক্যামেরা তাক করে থাকে একদল কাগুজে জনতা। তারা খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে হাসতে বীভৎস শিকারের আনন্দে ছুটে আসে। বুড়ো একটা দারোয়ান আমাকে পাঁজাকোলা করে পেছনের লিফটে নিয়ে যায়। "সোজা চলে যান বাবু টপফ্লোরে, টপফ্লোরে আর টপফ্লোরে উঠেই লিফটের গেট খুলে রাখবেন কিন্তু। আসছে ওরা আসছে।" ছাতের উপরের সুরম্য ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলেই সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ি। সামনেই শুভাশিস আর ক্যামেরা তাক্ করা দিলীপ। "শোন, আফটার অল আমরা তোমার ছোটবেলার বন্ধু। প্রথম ইন্টারভিউএর স্কুপটা কিন্তু আমরাই নেবো।" আমার ভয়ংকর আশ্চর্য লাগে। "কেন কি হয়েছে?" শুভাশিস হাসে "কেন তোমার প্রথম ছবিটা কান ফেস্টিভালে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে—খবরে শোননি।" আমি অজ্ঞান হয়ে পড়তে পড়তে দিলীপ ধরে ফেলে। "কিন্তু তুমি তো জানই শুভাশিস। ছবিটা আমার তৈরীই হয়নি, কেননা এন. এফ. ডি. সি. টাকা দেয়নি। র‍্যাকেট, সব র‍্যাকেট।"

শুভাশিস হাসে। "ইনকরিজিব্‌ল র‍্যাকেট। জানিই তো। তাই আমরাও র‍্যাকেট করে তোমার না হওয়া ছবিটাকেই ফার্স্ট প্রাইজ পাইয়ে দিলাম। এখন দয়া করে শুরু করতো।" আমি ছুটে যাই ছাতের দেওয়ালে। মুখ ঝুঁকে দেখি অনেক নীচে থিকথিক করছে ভীড়। আমি চীৎকার করে উঠি। শোন শোন, আমার একটা পাঁচমিনিটের বক্তৃতা আছে শেষ দৃশ্যে। শোনই না। আরে গাধার দল, পাঁচমিনিটের বক্তৃতা শোনানোর জন্য একটা আস্ত ছবি করতে হয়েছিল চ্যাপলিনকে সে খবর রাখিস? আরে সবাই উঠে চলে যাচ্ছে কেন? আমার বক্তৃতা তো এখনো শুরু হয়নি। শুনতে পাচ্ছ তোমরা?

হায় আমার গলা কি অতদূরে পেঁছুবে? □

ল্যাডলী মুখোপাধ্যায়

জনৈক আদমের সুরত

ছেড়ে যেতে হয়। হারাতেই হয় যদি কর্মসংশ্রবে, উদ্ধারে, আভ্যন্তরীণ তাগিদে, চেতনার হার্দ্য ফসলে একটিও আত্মমগ্ন শব্দবাক্য, রঙরেখার অনন্য সাধারণ উজান, বিক্ষিপ্ত জীবন-পরিক্রমার সুরছন্দ কিম্বা একটি পরাক্রান্ত অনুষ্ঠানকে প্রকাশে আনতে হয়— ফলিত সংগ্রামের আধারকে ছুঁতে হয়। যাকে ঔপনিবেশিক মাহাত্মে বলা হয় এক্সপ্রেশন। যে প্রকাশভঙ্গীর আহ্বানে তাহিতির পথে শিল্পীকে বিষাদক্ষরণের মধ্যেও এনে দেয় অন্তিম আনন্দ। যা বিষপানের পূর্বমুহূর্তে সক্রেটিসকে আঁচড়ে দিয়েছিল। যেখানে মানুষের সৃষ্টির মৌলিকতা লুকিয়ে থাকে। যা কিনা দেকার্তের অতিক্ষুদ্র বিষণ্ন শয়তানের উত্তর-সূরী। যেখানে মৃত্যুর সম্ভাবনার মধ্যেই প্রজন্মের তিরতির কেঁপে ওঠা— অনন্ত যাত্রা। তাকে প্রকাশ করতে, সৃষ্টি করতে— ছেড়ে যেতে হয়, হারাতেই হয়।

অথচ গোবেচারা আমাদের জীবন ননীমাখনে আত্মস্থ আছে। তার ভয় আছে, ক্ষোভ আছে, চিন্তা আছে নিরাপত্তা নিয়ে। তাকেও হয়ত বিদ্ধ হতে হয়, চিহ্নিত হতে হয় সংকীর্ণ এই সাড়ে তিন হাত মানব-জমিনের তেল খাওয়া ক্যাশবুকের ভাষায়। এই সেই জীবন মহাশয়! য়ার ঘুম কাড়ে ডিয়ারনেসের ভূত, উপরি ভাতার ছায়া। এই কলোসাল রিপ্রেশনের বিরুদ্ধেই তার হামাগুড়ি, ফার্সিকাল ক্রম-ডিস্ইল্যুশনড। নিধিরামের লড়াই তাকে সামাজিক করে। যে সমাজ তার মনগড়া। যে সমাজে তাকে দেনাপাওনার নিরীক্ষেই দেখতে হয়। যে সমাজ সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত জীবনের সরল বীজগাণিতিক উপেক্ষা। সাধে-আহ্লাদে, বাল-বাচ্চার নিরাপত্তায় নেয়াপাতি ভুঁড়ি শোভিত গদগদে চর্বিপিচ্ছল বেঁচে থাকা। এ সেই পুঁচকে মানুষ, লিট্ল ম্যান, যে বাসে বসে পা ছড়িয়ে দেয়। মেয়ে দেখলেই ঠোঁট চাটে। সময়াবকাশে এই-ই সেই জীবন মশাই, যে আত্ম-সম্মোহনের বাহানায় নিজেকে আলাদা করতে ভালবাসে। প্রেম নিয়ে কাতর হয়। সংগ্রামবিলাসে ধিক্কার জানায়। 'স্বাধীনতা' শব্দটি তার ঠোঁট থেকে গড়িয়ে পড়লেই পিতৃতান্ত্রিক অধিকারে অতি কাছের আদরণীয় নারীটিকেও বাক্সে পুরে ফেলে। তার অধিকারই তাকে নির্দিষ্ট করে সব পেয়েছির ঘরে ঘরে, যেখানে 'না-পাওয়া'ই হল বিক্ষোভের তেলবারুদ। হ্যাঁ একমাত্র তার, তারই ব্যক্তিগত না পাওয়া।

আবার এও ঠিক, যে মানুষের দ্বিধা নেই, সংশয় নেই, পরস্বার্থে ভাবনা নেই— যার লড়াই, জয় পরাজয়, প্রেমপ্রীতি, উন্মেষ, প্রক্ষোভ সবই উৎপাটিত তার স্বজ্ঞান ঐতিহ্য থেকে— তবে তো সে মানুষ বরবাদ এক ইতিহাসের জীর্ণ অধ্যায়ে পাদটীকার আশ্রয় পাবে মাত্র। বিজ্ঞান তাকে শনাক্ত করবে জড় বলে। দর্শন তাকে অজ্ঞান বলবে। তখন মনুষ্যত্বের ভূমিকা নিয়ে কোন সমাজতত্ত্ব তৈরি হবে? কীভাবেই বা নির্দিষ্ট হবে শতকরা কতো ভাগে মানুষ তার নিজস্ব পরিচয়ের পথ থেকে সরে যাচ্ছে? বস্তুতপক্ষে, ঢালাও অর্থনীতি মায় খোলাবাজারের আই. এম. এফ. যাদু যতই বিঘোষিত উত্তেজনায় ইলেকট্রনিক দ্রব্যসম্ভারে আমাদের ঘরদোর উপচে দিক, যতই এক প্রান্তিক জনসমষ্টি তার পকেট ফুটো করে হাতে ফুটো বাটি ধরুক— মানব ঐতিহ্যের স্খলন কিন্তু তার অর্থনৈতিক বুনিয়াদেই সুনির্দিষ্ট থাকে। খোলাবাজারে যেমন তাকে ভিডিও বাণিজ্যের সুরাসার গিলিয়ে নেয়, তেমনই তার সাংস্কৃতিক অধঃপতনে তাকে আত্মকেন্দ্রিক এক এমন ধ্রুবকে চিহ্নিত করে যা তার জন্মসম্বল মনুষ্যত্বকেই দেয় এক মোক্ষম আঘাত। সে ঝুলে থাকে, যেন কোনো কবুলতি নেই, কোনো দায় নেই। নেই কোনো আত্ম-বিশ্লেষণ। শুধু দোলা আর মরণ ঝোলা।

এতদ্‌সত্ত্বেও ইতিহাসের গতিবেগ ও সম্পন্ন রেখাচিত্রে সমাজ বাস্তবতার যে সমীকরণটি ধরা পড়ে তাতে দেখা যায় একোলসেরে মানুষ, স্বার্থপর মানুষ, দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষ তার নিজেরই অবচেতনায় কিম্বা সমাজের বাস্তবিক চাপে কখনো না কখনো, জ্ঞানে, অজ্ঞানে কোনো একটি বইয়ের পাতায় জব্দ হয়ে যায়। হয়ত কোনো একটি ছবির দিকে অপলক তাকিয়ে থমকে দাঁড়ায়। পাল্টাতে থাকে তার বাদামী জীবনের রূপ। খসে পড়তে থাকে একটার পর একটা মুখোস, তার নিজস্ব তৈরি ছদ্মবেশ। পরিবর্তিত সেই নষ্ট মানুষের ধাক্কায় গোটা বাস্তবতাটাই আচমকা প্রকট হয়ে দাঁড়ায় তার মুখোমুখি। যে বাস্তবতা তারই সাপেক্ষে গঠিত। হাইলি রিলেটিভ।

আসলে আরেকটু পরিস্কার করে ভাবতে গেলে লিখতে হয়, প্রতিষ্ঠার মিনার থেকে সামান্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার মধ্যে যে নোডাল পয়েন্টটি গচ্ছিত থাকে সেখানে নৈরাজ্য প্রাথমিকভাবে এমন একটি বাতাবরণ তৈরি করে যার মধ্যে তৈরি হয় এক মিথ্যে দুঃসাহসের গল্প। এই গালগল্পের ফাঁকে-ফোকরে, চলনে-বলনে প্রতিটি মধ্যবিত্তই প্রায় গুঁজে দেয় তার নিজস্ব ত্যাগের ফর্দটি। যেটি সে অতি সাবধানে গচ্ছিত রাখে তারই নিরাপত্তার লকারে। এখানে সমীকরণটি খুবই সহজ হয়ে যাবে যদি আমরা দেখি তার উৎস থেকে অন্তিম যে যাত্রাপথ সে কথার ভেল্কিতে বোঝাতে চাইছে তার ভিত্তিটি কী! যেন কত হারিয়ে, কত গুঁড়িয়ে এই পাওয়া। তো কোন্ পাওয়া? চকচকে একটা মধ্যবিত্তের ভোঁতা জীবনের 'পাওয়া'র অনুসন্ধান করতে আমরা কোন্ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে যাব? তার কি খুব প্রয়োজন আছে!

ইতিমধ্যে আমার পাঠকবর্গ নিশ্চিতভাবে আমার দিকেও সন্দেহটা ছুঁড়ে দেবেন হয়ত। ভাববেন, এই প্রস্তাবিত রচনার গতিমুখ শেষাবধি কোথায় নিয়ে যাবে। আর বর্তমান লেখকেরই বা পায়ের তলায় কতটা জল, কতটাই বা বালিমাটি। কিন্তু হ্যাঁ, এ আমার স্পষ্ট উচ্চারণ, এ আমার প্রকাশ্য ধারণা (!) যে অনেক কিছু ছাড়তে চাওয়ার কল্পনা আমাকেও স্বপ্নের গহীন পথে নিয়েছে। যেখানে নিজেকে মুক্ত চিন্তা ও সৃষ্টির পাল খাটানো নাবিকের মতো ভাবতে ইচ্ছা করেছে। অথচ কই? গোটাকতক বন্ধুত্ব, সাড়ে চার তোলা প্রেম আর আড়াই রত্তির স্বীকৃতিকে ছাড়তেই তো প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতিষ্ঠার মোহকে দুর্নিবার শিল্পিত মনে আধ মিনিটের জন্যেও অবজ্ঞা করতে পারছি কোথায়? পারছি না বলেই সংশয়। পারছি না, কেননা হে পাঠক, আপনি আমার কোনো অজুহাত কোনো লেখ্যভাষ্যই পড়তেন না, যদি না সামান্য পরিচয়ের সূত্রে, শুনে থাকা নামের কারণেই যেভাবে এই আত্মসমীক্ষার আধারে রচিত এই গদ্যপ্রবাহটি পড়তে শুরু করেছেন—। যেভাবে অনেকানেক বেপরোয়া জীবন ভিখারিকে আপনি- মনেও আনেননি। এই প্রস্তাবনায় আমি এমন এক জীবনের কথা লিখব যাঁর প্রতি ফিরে তাকানোর সময় আপনি পাননি। যিনি সময় উল্লাসে নিষ্ফল প্রতিষ্ঠার গলা টিপে এক নৈর্ব্যক্তিক জীবনকেই কর্ম ভেবেছেন, ভেবেছেন সাধনা। যে ফেলে আসা, ঘটিয়ে তোলা, অর্জন করার সময়বেদ আমাদের লজ্জিত করে, সচেষ্ট করে কিছু একটা করার তাগিদে। ঠেলে দেয় আরেকবার··· যদি আরেকবার···

অথচ দেখুন, কিছু ছেড়ে কিছু কুড়িয়ে নেওয়া আর কিছু হারিয়ে কিছু বাগিয়ে নেওয়ার সমানুপাতিক অঙ্কে মধ্যবিত্ত মায় তাবৎ ছাপোষা মানুষ অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অভ্যস্ত তাদের হতেই হয় কেননা দুধে লিকারে, রসেমদে তারা যেমন গাছের খান তেমন তলারও কুড়োন। তাদের ভদ্দরলোকি জীবন মানে সর্বদাই এক শঙ্কা কাজ করে : এই গেলো, এই বুঝি ছিট্‌কে গেলাম র‍্যাটরেসের ট্র্যাক থেকে। তাই বিস্মিত হতে হয়। বিস্ফারিত এই দৃষ্টিহীন চোখে আরো আরো ঘন অন্ধকার জাগিয়ে তোলে। যখন একজন শিল্পীকে দেখি তাঁর ফেলে আসা পথ চলাতেই আনন্দ। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া এক সংঘর্ষের বহুমাত্রিক নিঃসঙ্গ তথা নৈর্ব্যক্তিক উত্থানেই যে বেঁচে থাকতে চায়। আদৌ কি সে কিছু চায়? যা চায় তা হয়ত এঁকে ফেলা চিত্রপটের বিষয়-বিষয়ীর সামান্য স্বীকৃতি। যারা বলবে 'এই আমার ঘরদোর। এই আমার লালন-পালন। এই আমার দৈনন্দিনের অমিত যুদ্ধের ক্ষণ-মুহূর্ত।'

অজ্ঞানতার কারণেই এই অসম্ভব উদারক্ষ্যাপা সন্ত শিল্পীর প্রথম সন্ধান পাই বাংলাদেশের স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের এই সেইদিন দেখা তথ্যচিত্র 'আদম-সুরত'-এ। যখন তাঁর বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। শরীর আলগা হয়ে আসছে। প্রাথমিক পরিচয়ে মাত্রাতিরিক্ত এক জবরজবরে কম্পনের মধ্যে টের পাই— এ দুনিয়াকে যারা বাসযোগ্য করে যেতে চায় তার অন্তরালে থেকেও এমন কিছু বিস্ফোরক জীবনের

দায় বয়ে যায় যা আমাদের মতো সাধারণত্বে ভরা কৃমি ও পতঙ্গদের কাত করে, ডানা ছেটে দেয়। কাহিল করে তার ইনার স্ট্রেংথ্ দিয়ে। এই শিল্পী, যিনি শেখ মহম্মদ সুলতান একজন দিন দরিদ্র রাজমিস্ত্রির একমাত্র সন্তান। কৈশোরের আঁকা অসাধারণ স্কেচ এবং পেইন্টিং স্থানীয় তালুকদার-জোতদারদের মনোরঞ্জন করার কারণে— পড়াশুনায় যথেষ্ট খারাপ ছেলে হওয়া সত্ত্বেও— এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতার আর্ট কলেজ অবধি আসার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

পাঠক, এর পরবর্তী অধ্যায় তথা সুলতানের জীবনসিঁড়ি অন্যান্য আর পাঁচদশ-পাঁচশো চিত্রকরের মতোই খ্যাতি আর স্বীকৃতির চুনসুরকিতে যথারীতি এক এক ধাপ করে পর্যায়ক্রমে ইউরোপ-আমেরিকার আর্ট-অ্যাপ্রিসিয়েশনের দরজা অবধি পেঁছে যায়। সাথে সাথে দেশেবিদেশে সুলতান তাঁর চিত্রকলার তারিফের ডিঙিতে চড়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। শিল্প(আ)মোদীরা ধরেই নেন যে তিনি, শেখ মহম্মদ সুলতান, প্রতিষ্ঠানের চিরনির্দিষ্ট শার্ল, গ্যালারি, স্টুডিও তথা আর্কাইভগুলোতে নিজেকে সচেষ্ট রাখবেন, নিজেকে ক্রমে বন্দি করে ফেলবেন আর পাঁচজন নামজাদাদের মাঝে। ঠিক এইখান থেকেই আমাদের বিস্ময়ের শুরু। এইখানেই বোধের বিস্তৃতি। তথাকথিত ধরতাইয়ের সম্পূর্ণ বাইরে, শিল্পের অত্যাধুনিক নিরীক্ষাভূমির অকপট স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। যেন এই আবর্জনার সভ্যতা, কোলাহলের সভ্যতা, লোকদেখানো সভ্যতা, যুদ্ধজমানার সভ্যতা থেকে নিজেকে গোপন করে নিলেন। লুকিয়ে ফেললেন, আজন্ম সেই মাটির বিষাদ নিয়ে বুকে।

সুলতান সম্পূর্ণ অন্তর্গত এক আত্মজৈবনিক সাধনার আহ্বানে সাড়া দিলেন। সেটা ছিল মধ্য পঞ্চাশের পাশ্চাত্য অস্থিরতা। বাংলার সামাজিক ভাগ্যাকাশে তখনো মন্বন্তরের দগদগে ক্ষতগুলি অচিকিৎসিতই থেকে গেছে। ইউরোপের সংস্কৃতি তার রাজ্যপাট ফর্মালিজমের অধিগ্রহণে নতুন এক কালচারাল রিউম্যাটিজমে আক্রান্ত হয়েছে। মহান দুই স্পেনীয় শিল্পী গোইয়া ও পিকাসো উভয়েই কালেকটরদের সর্বগ্রাসী ব্যবসায় (তাঁদের শিল্পকৃতির জনআবেদনের বিপরীতে) ঐতিহাসিক সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন। একটি ছবিকে একশো ছাপ্পান্ন টুকরো করে নিলাম ডাকা শুরু হয়ে গেছে। ইউরোপীয় অর্থগৃধ্নু সময়কণ্টক গইয়ার 'দানব'কে ডাইনিং রুমে সাজিয়ে দিয়েছে অনায়াসে। পিকাসোর 'নৃশংসতা' ডিজাইনের গণ্ডীতে হাঁপিয়ে উঠেছিল যেন এমনই কোনো সময়। শুধু সুলতানই নয়, সারা পৃথিবীর যূথচারী ক্লান্তিতর্পণকারী মানুষ একটু একটু করে বুঝতে শুরু করেছিল সংস্কৃতির মূল নিয়ামক তার মানবীয় উত্থানে। জীবন বিচ্ছিন্ন রঙরেখা সুরছন্দ গদ্যপদ্য আসলে আরো বেশি নির্বাপিত জনবিক্ষোভের মলম হিসাবে অন্তর্গত স্বপ্নের গভীরে কাজ করে। ঠিক সেই মধ্যপঞ্চাশে কেউ কোথাও বুঝতে না পারলেও আজকের আবিশ্ব শিল্পমন্দায় হ্যাকুনিড জীবনভাষ্য আর দার্শনিক

যৌনসম্ভার যেন লুপ্তপ্রায় সুররিয়ালিস্টদের তৎকালীন বিযুক্তির দুর্ভাগ্যে কাজ করে গিয়েছিল— তা বোঝা সম্পন্ন হয়েছে। পুরানো পাতা ওল্টাতে গিয়ে বড়ো বেশি কাতর হতে হয় সেই কারণেই। কেরুয়াকের 'অন দ্য রোড' কিম্বা গিন্সবার্গের 'ফাউল' পড়লে যেমন পাশ্চাত্যের বিযুক্ত পারিবারিক অস্তিত্বের নির্বোধ নৈরাজ্যকে স্পর্শ করা যায়। তেমনই বোঝা যায়, উৎসবে-সিনেমায়-ইমেজে-কল্পনায় ওরিয়েন্টাল জলপ্রপাত কেন, কেন এতোটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রসঙ্গত মনে রাখা যেতে পারে, সার্ত্রে যে মধ্যরাত্রেই কড়া নেড়ে থাকুক না কেন অ্যাবস্ট্রাকসন তথা অ্যাম্বিগুইটির চূড়ান্ত লোক-উচ্ছ্বাসগুলি, সেই অষ্টপ্রহরের তর্পণঅর্পণগুলি— এমন কি বিযুক্ত হওয়ার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও একই সঙ্গে আধুনিক প্রয়োগকল্পগুলিও (হারাকিরি কিম্বা চড়ক) এই এশিয়াপ্রান্তরের ঘাসজমিনে, জলেপাহাড়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলোনিয়াল সংহারবাদী মানসতা নিপাত যাচ্ছে। দৌড়ে বেড়াচ্ছে সাহেবসুবো, স্পনসর, কমিটি, গবেষক, বায়ার, প্রডিউসার ও ফড়ে।

অথচ ভেবে দেখুন একবারটি ; আমরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলাম কিছু একটা ঘটিয়ে-ফেলি। সব ছেড়েছুড়ে চলে যাই। মিশে যাই, বিলিয়ে দিই নিজেকে— মিলিয়ে দিই সাধারণ্যে। সাধুসন্ত নাই বা হলাম অন্তত একটিবারের জন্য লোকে বলুক 'আহা কী করে ফেলল ! এমন ধনেমানে উৎসর্গীকৃত জীবনটাকে দুয়ো দিয়ে বেরিয়ে পড়লো রে ?' আমাদের উৎকণ্ঠা, পাপবোধ, প্রত্যাখ্যান আর মমতা মাখানো বোধে মননের নিহিত পরিক্রমায় সামান্য শক্তিটুকুও সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি। অথচ প্রবল ইচ্ছার অনাগত সম্ভাবনার দিকে নিষ্ফল চেয়ে থেকেছি। এক ব্যর্থ, ধ্বস্ত, ক্লেদাক্ত সময়ের অবগুণ্ঠনে শুধু কাতর হয়েছি। আবেগ নিরপেক্ষ হয়েই লিখছি, যদি একটিবারের জন্যেও পারতাম ! পারতাম নিজেকে ছিন্ন করতে, টুকরো টুকরো করতে সেই বোধের সমীপে, শিল্পের যূপকাষ্ঠে যদি পারতাম পা রাখার জায়গাটুকুকে তোয়াক্কা না করে গলা বাড়িয়ে দিতে ? আহা !

জ্ঞানী দোমিয়ের কারাবাসে থাকাকালীন চিঠিতে লিখেছিলেন তাঁর কালি ফুরিয়ে যাওয়ার নিদাঘ যন্ত্রণার্ত মুহূর্তের কথা। আমরা বুঝতে পারলাম আধুনিকতার চিত্রলেখটি কেমন করে সহজ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে, এই গত দশকেই (সম্ভবত) দালির অন্ধকার ক্যাসেলে জীবনকে সংকীর্ণ যাপনের মধ্যে দিয়ে যে আরেক ফলিত বাস্তবতার সূত্রপাত ঘটল তার বিশ্লেষণ কোন ভাষায় করা যাবে ? আমরা খেই হারিয়েছি। চালিয়াত চন্দর বিজ্ঞাপনি দুনিয়ার মেগাস্টার দালি যখন ক্যাসেলের মধ্যে ঢুকেই পড়লেন তখন কোন পাপবোধ, কোন বিচ্ছিন্নতা তাঁকে মদত দিয়েছিল ! কেনইবা নিঃসঙ্গ এক জীবনচর্চার অস্থির উন্মেষের কথা বললেন দালি ? আমার পাঠক কি আমাকে মাফ করবেন— যদি বলি, এও এক পোস্টমর্ডানিস্ট ভেল্কির চরকিচক্কর। পালিয়ে বাঁচা !

এদিকে, যাইহোক, আমার বিষয় ছিল সেই অনন্যসাধারণ শিল্পী সুলতানের ছিটকে যাওয়া, ফিরে আসার দিনপঞ্জীটি আরেককার খতিয়ে দেখা। হ্যাঁ ইউরোপ ভ্রমণকালে যখন তিনি খ্যাতির তুঙ্গে। যে সময় মানুষ উত্তেজিত-অস্থির রোমকূপগুলো প্রায় নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে। ঠিক যে সময় আর কাঁটা দেয় না শরীরে, জীবনের— খ্যাতির মধ্যগগন— এমন একটা মুহূর্তেই স্বেচ্ছানির্বাসন নিলেন সুলতান। ক্যাসেলের অন্ধ-বৈচিত্র বা নির্বাণের চর্চা-সাধনা নয়। সুলতান ফিরে এলেন তাঁর উৎসে। জীবনের শুরুয়াদ, সেই বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে— নরাইলে, নিজের গ্রামে। তাঁকে নিয়ে একটি কথাও হল না বা তিনি বলার সুযোগ দিলেন না। ফিরে এলেন আন্তর্জাতিক শিল্প-ময়দানের গৌরবময় দিনগুলোকে অস্বীকার করে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে। 'ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর সেখানে পাওয়া যাবতীয় যশ ও খ্যাতি আমি পুরোপুরি ভুলে যেতে চেয়েছিলাম। তথাকথিত স্বীকৃতিগুলি আমি আমার গ্রামে নিয়ে আসতে চাইনি। চাইনি এ সম্পর্কে কেউ কিছু জানুক। যখন আমার পুরানো সহপাঠী তথা বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করি, আমার মনে হয় আমি যেন আবার সেই শৈশবে প্রত্যাবর্তন করেছি। যখন তাদের সাথে কথা বললাম, আমি বুঝলাম, তাদের চিন্তাভাবনা ও স্বপ্নগুলি যেন আমারই খুব কাছাকাছি। এইভাবে আমি যত আমার গ্রামের প্রত্যন্তে জড়িয়ে পড়লাম, একইভাবে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করলাম কৃষকদের সাথে। দেন আই ফেলট্ মাইসেলফ আন্ডারগো আ ডীপ ট্রান্সফরমেশন। আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম। ইউরোপ থেকে তুলে আনা সমস্ত বিদেশী আদবকায়দা এবং ভাবনাচিন্তা অনেক পেছনে পড়ে থাকল। আই বিকেম কমপ্লিটলি হোল, ইন টিউন উইথ মাই পিপল অ্যান্ড মাই কান্ট্রি। দিস ট্রান্সফরমেশন গেভ মি ডীপ ফিলিংস অফ পীস অ্যান্ড কনটেনটমেন্ট।'

তো ফিরে এলেন সুলতান। আশ্রয় নিলেন জংলা গাছগাছালিতে ভরা পরিত্যক্ত মন্দিরে। না, কোনো পরিপাটি ঘরদোর তিনি সাজাতে পারেনি। 'যেন নৈঃশব্দের অথবা কোনো শূন্যসময়ের বিনীত জাগরণে একটি একটি করে ভাষার মুকুলগুলি ফুটিয়ে তুললেন তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মাঠে প্রান্তরে। অথচ দেখুন আমরা আছি যেই কে সেই। অ্যাগ্রেরিয়ান ভিজনকে আয়ত্ব করার জন্যে পুঁথিপত্র ঘেঁটে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ সাজিয়ে, বাকতাল্লার জাবর কেটে, সেমিনারে-সভা-সমিতিতে আপ্রাণ বজায় রাখতে চেষ্টা করছি অন্তঃসারশূন্য র‍্যাডিকালইজম। চেষ্টা করছি বোঝাতে : কতো, কতো অনুগত আমরা প্রগতির নাড়ীর টানে। একবার ভেবেও দেখছি না ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থমগ্নতা আর শ্রেণী-নিবন্ধ আমলাতান্ত্রিক গণঅহংকারে আমাদের মর্মান্তিক মানবিক দুর্গতি কি নিদারুণ এক পচনসম্ভব অনুষ্ঠান ঘটিয়ে তুলেছে।

উধাওসন্ধানী এই শিল্পী কিন্তু আপাত বিযুক্তির ভরে নিজেকে সেই জীবনচর্চা ও শিল্পকৃতির ঐকান্তিক যোগসূত্রে চিহ্নিত করলেন। যাঁর জীবন শুরু হয়েছিল ইউরোপীয়ান মাস্টারদের প্রভাবসম্বল ক্যানভাসের রঙরেখায়, তিনিই সরে এলেন

সম্পূর্ণ জ্যান্ত এক বাস্তবতার অধরায় ধরা দিতে। তাঁর নিশ্চয়ই জানা ছিল, বাস্তবতার একমুখি সরলতা বিষয়ক বিতর্ক সারাদুনিয়াব্যাপী শৈলীসংস্কারের প্লাবন ঘটিয়ে ফেলেছে। তাঁর এও জানা ছিল, বিমূর্ত চিত্রপটের বহুমাত্রিক প্রকাশ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা সাম্প্রতিক কালে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। তবু? তবু সুলতান তাঁর আত্মগত বিপন্নতারই শুধু নয়, দুর্গতি-ক্লিষ্ট গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে অকৃত্রিম সখ্যে নেমে আসেন শেকড়ের দিকে, কোন সে যৌথ-অবচেতনার ঐশ্বর্যের গভীরে।

এইভাবেই শুরু হল তাঁর, শেখ মহম্মদ সুলতানের গত তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছরের কৃচ্ছ্রসাধন, শিল্পযোগযাত্রা। অযত্নে ক্যানভাসের সরসতায় রঙের বৈচিত্রে, রেখার বিচিত্র সম্পাদনায়, পরীক্ষানিরীক্ষার সরলজটিল ছন্দে চিত্রিত করলেন আধুনিক শিল্পকারুতন্ত্রের এক তৃতীয় ভুবন। বহুমূল্য বিদেশি রঙ পরিহার করে তিনি বেছে নিলেন দেশজ পটুয়াদের গাছগাছালি, শেকড়বাকড় থেকে উদ্ভূত রঙ। স্বল্প খরচায় অনেক বেশি ও বড় কাজ করতে হলে দেশি দ্রব্যাদি ব্যবহারই শ্রেয়। সুলতান বলেন, 'প্রথম দিকে আমি জুটের কাপড়ে শিরীষের আঠা ব্যবহার করতাম। কিন্তু দেখা গেল বর্ষায় ক্যানভাস-গুলোয় ড্যাম্প ধরে যাচ্ছে। তখন আমি গাবের আঠা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। যা কিনা জেলেরা তাদের জালের জন্যে ব্যবহার করে।'

মধ্যপ্রদেশ দেশে ফিরে সুলতান প্রাথমিক স্তরে অসম্ভব কিছু ল্যান্ডস্কেপ আঁকতে শুরু করেন। মানুষ সেখানে ততোটা গ্রাহ্য নয়। যেন জীবনানন্দীয় প্রাতিস্বিক বোধ আর শস্যক্ষেত্রের জৈবিক উপমা-সমাহার। প্রগল্ভ উষ্ণতায় শিল্পী তাঁর কাঙ্ক্ষিত চিত্রসমূহে আরোপ করেন এক বাদামী সভ্যতা। জানিয়ে রাখা ভাল, তিনি বলেন, 'তুমি দেখবে ব্রাউন ইজ দ্য ডমিনেন্ট কালার। কেননা ব্রাউন হল মাটিপৃথিবীর, ঘরবাড়ির আর কৃষকের রঙ। এই বাদামী রঙ এবং কার্ভড ফর্মস ক্রিয়েট আ ফিলিং অফ ইউনিটি ইন মাই পেইন্টিংস। বলা হয় বাংলাদেশ হল পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশ। কিন্তু তাই-ই বা হবে কেন? এখানে কৃষকের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সঞ্চালিত হয়ে আসছে স্মরণাতীত কাল ধরে। উদাহরণস্বরূপ তেভাগা আন্দোলন এবং আরো কতো সব। অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করে, এই আধুনিক যুগে কেন আমি আমার ছবিতে কৃষকদের এতো সেকেলে করে আঁকি··· আমি তাদেরকে বলি যে ওরা আজও প্রাচীন। ওরা আজকে কী করছে? দিস কালটিভেশন অফ ল্যান্ড ইজ প্রিমিটিভ ওয়ার্ক। সো দেয়ার এন্টায়ার একজিসটেন্স ইজ প্রিমিটিভ। দেখ আমি এইসব আদিম মানুষদের বেছে নিয়েছি আমার ছবির বিষয় হিসাবে কেননা দে আর আউটসাইড দ্য টেরর অফ আওয়ার প্রেজেন্ট ওয়ার্ল্ড। বৃহৎ শক্তির কসমোপলিটান শহরগুলোতে আজ কী হচ্ছে, কীভাবে তারা নিজেদের নিউক্লিয়ার হলোকাস্টের জন্যে তৈরি করছে। আমার বিশ্বাস এইসব শহর অভিশপ্ত হয়ে পড়েছে। একদিন তারা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি, আমার

ছবির এইসব মানুষজন, এইসব ধ্বংসের দিকে আত্মহননের দৌড়ের থেকে অনেক বাইরে। আই ফিল দ্যাট দে উইল আউটলিভ আ নিউক্লিয়ার হলোকাস্ট। দে উইল কনটিনিউ টু কালটিভেট দেয়ার ল্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ।'

ইতিমধ্যে মানুষ এসেছে তাঁর ছবিতে আদমের রূপ নিয়ে। বলিষ্ঠ, সুগঠিত শরীরের মধ্যে বীরত্বের প্রতীকী নিয়ন্ত্রণ। বিস্তৃত আর অনন্ত তাঁর ক্যানভাসে ধরা পড়তে শুরু করে শ্রম ও কর্ষণের অভিনব সব মুহূর্তগুলি। সুলতান ছিলেন পরিবারবিচ্ছিন্ন একাকী জীবনে অভ্যস্ত। তাঁর এই একলা চলার পেছনে কোনো গূঢ় বার্তা কাজ করে ছিল কিনা আমার পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। তবে জানিয়ে রাখি, জীবনের শেষার্ধে এসে তিনি সামাজিকভাবে দায়িত্ব নেন নিম্নবর্গের মধ্যবয়স্কা (প্রায় প্রৌঢ়া) এক হিন্দু বিধবা রমণীর। যার দুই সন্তানের সঙ্গে সুলতান নিজেকেও গ্রথিত করলেন পারিবারিক আস্তানার সহজিয়া বাস্তবতায়। এর পরপরই যেন দেখা যায় সুলতানের ছবিতে মানুষ এক বিশেষ ভূমিকা নিয়ে রঙরেখার বৈশিষ্ট্যে প্রতিভাত হতে শুরু করেছে। এই মানুষ আমাদের চোখে দেখা মানুষের থেকে যেন অনেক বেশি বলবান, মাসকিউলর। এদের যেন নিরন্তর শ্রমের প্রতীকে চিহ্নিত করে সুলতান তৈরি করতে চান এক দুর্দান্ত 'মিথিকাল ইভেন্ট'। তাঁর ক্যানভাসের মানুষজন, গাছপালা, প্রকৃতিপাথর যেন আর্কিটাইপাল চিত্র-চেতনার জন্ম দিয়ে যায়। তাঁর চাষি যেন সেই আদমের আদলে, উৎসের গভীর গোপনে এক ক্লান্তিকারি, স্বপ্নচারী সৃষ্টির জাল বুনে যায়। আমাদের বিদ্ধ করে। নিজেদের অজ্ঞানতায়ই বিপন্ন বোধ করি আমরা। বুঝতে চেষ্টা করি, কেন হাজারো ছবি এঁকে একটিও বিক্রি করার তাগিদ অনুভব করলেন না সুলতান, এখনও পর্যন্ত।

যেহেতু আমার বিষয় ছিল এক অনন্য সাধারণ শিল্পী মানুষের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে আমাদেরই ক্ষয়িষ্ণু মূল্যবোধ, আমাদেরই অজ্ঞানতা, আমাদের নষ্ট সভ্যতার বিশ্লেষিত মুহূর্তগুলি খুঁচিয়ে দেওয়া, তাই আপাতত সেই শিল্পী শেখ মহম্মদ সুলতানের মুখের কথাগুলিকে বাঙ্ময় অভিযোজনে সাজিয়ে এই নিবন্ধের শেষ পর্যায় প্রবেশ করব : 'ক্ষমতায় আসীন লোকেরা সবসময়েই দরিদ্র কৃষকদের জন্যে কুম্ভীরাশ্রু ফেলে। তারা দেখায় যে তারা কৃষকের কতো বন্ধু। কিন্তু এ সমস্তই ভাঁওতা। তারা কখনোই কৃষকের পাশে দাঁড়ায় না। যদি তা সত্যি হতো তবে আমি কৃষকের সঙ্গে তাদের কাজ করতে দেখতাম। দেখতাম, তাদের সঙ্গে খেতে-খামারে কাজ করতে। তাদের সংগ্রাম ও দুঃখের অংশীদার হতে। বৈদেশিক সাহায্য যা কিনা আমাদের দেশে কৃষকের নামে উপচে পড়ছে, তা কিন্তু কখনোই চাষির ঘরে পৌঁছায় না। সমস্তটাই শহরে আটকে থাকে। এবং তুমি জান তা দিয়ে কী হচ্ছে? কতিপয় বড়োলোকদের বিলাসসামগ্রী কেনা হচ্ছে। যদি আজ কিংবা কাল এই বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়, তখন কী হবে? শহর শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু গ্রামে? কিচ্ছুটি ঘটবে না। কোনো পরিবর্তনই দেখা যাবে না। গ্রামের চাষি সবসময়েই বেঁচে থাকবে। আরেকটা সমস্যা হল কৃষককে

বোঝানো হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি ঐতিহ্যবাহী দেশজ পদ্ধতির থেকে অনেক ভাল! মাঝে মধ্যে আমি টেলিভিশন দেখি। কোনো একটা অনুষ্ঠানে কিছু চাষিকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনারা কি জানেন এই গাছের চারা দিয়ে কী করা হয়? বলতে পারেন এটা কোন জাতীয় গাছ?' যখন কোনো চাষি বলে যে এটা কোন ধরনের বা কি। তখন তাকে বলা হয়, 'ওফ! না না না। এটা তা নয়।' তারপর এক তন্বীর ছবি ভেসে ওঠে টিভির পর্দায়। সে পাঠ করতে থাকে কিছু বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আর বলে, 'ইউ আর নট্ রাইট। ইউ হ্যাভ দ্য রঙ আইডিয়া। দিস প্ল্যান্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি ' ইত্যাদি ইত্যাদি। যাদের এই কথাগুলো বলা হচ্ছে সেইসব কৃষকের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পাই তাদের প্রাচীন বাপচোদ্দপুরুষের পেশাগত গর্ব ধ্বংস হতে চলছে। এবং তার পরিবর্তে জায়গা নিচ্ছে নতুন ধরনের হীনমন্যতা। এরাই হল আমার ছবির বিষয়। আই ক্যান নট হেল্প বাট ফিল ফর দেম··· ফর দেয়ার ডে টু ডে কনসার্নস, প্রবলেমস, স্ট্রাগলস। তুমি কি একটা বিষয় জান? আজকের চাষি আর গান গায় না! জারি-সারি সেইসব লোকসঙ্গীত আজ আর গ্রামাঞ্চলে শোনা যায় না। আসলে কোনো না কোনো ভাবে কৃষকের কাছ থেকে তার গানকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইদানিং শহরের লোকজন তাদের কৃষকদের লোকসঙ্গীত প্রডিউস করছে। কিন্তু তারা সেগুলো সম্পূর্ণ বিকৃত করে শোনাচ্ছে। এবং এই কৃষকরা যখন শোনে তাদের সেই পুরোন গানগুলো রেডিওতে কিম্বা টেলিভিশনে বাজানো হচ্ছে, দে ফিল দেয়ার মিউজিক··· হুইচ ওয়াজ দ্য অরিজিনাল এক্সপ্রেসন অফ দেয়ার জয়েস, দেয়ার পেইনস, দেয়ার সরোজ··· দে ফিল দিস মিউজিক ইজ বিইং মেড আ মকারি অফ, অ্যান্ড দে বিকাম টেরিবিলি স্যাড।

অবশেষে ছায়া নামে। ক্রমে এক গাঢ় অন্ধকারে আমাদের প্রতিশ্রুতির সলতেগুলি নিভে যায়। গত একটা দশক আগেও আমরা কোমরবেঁধে নেমে পড়তে পারতাম কোন জাহান্নামের অচীন দেশের পথে। সম্বল ছিল একটাই 'কিছু করা'। কিছু একটা বুঝে ওটা, বুঝিয়ে দেওয়া। যে ধ্বংসপ্রায় যোগাযোগের সেতুটা এখনো স্বপ্নে দেখতে পাই, সেখানে উড়ুক্কু দার্শনিক ছেলেছোকরার দল হাতের তালুতে গাঁজা টিপতে টিপতে গেয়ে ওঠে 'চ্যাংড়া বন্ধুরে··· ঘর তুইল্যা দে নদীর কিনারে'। ভয় হয়, যে ঘর যে বাসা আমাদের পূর্বপুরুষের রক্তে মেধার মজ্জায় তৈরি ছিল তা কি আমরা চিনতে পারলাম! আমরা কি বুঝে উঠতে পারলাম কিছু একটা করার আগে, কিছু একটা বোঝা দরকার, কিছু একটা ধরা দরকার। তাকে যদি না-ই ব্যক্ত করতে পারলাম তাতে কি! হলই বা তা সেই অধরা-অবলা অবাঙমানসগোচর। যা কিনা আমাদের পাওয়া ও খোঁজার নীলমনি আঁধার কালো স্বপ্নের কোরক!

ছাড়তে চাওয়া, হারিয়ে খোঁজা তো অনেক পরের বিষয়। আপাতত সুলতান, শেখ মহম্মদ সুলতান আমাদের অপদার্থ দিন যাপনের মুখে কালি মাখিয়ে দেন! অজড় খিলানগুলি শব্দ করে ওঠে। বেজে ওঠে অপদস্থ জীবনের ভাঙা রেকর্ড। □

কৃতজ্ঞতা: তারেক মাসুদ-এর তথ্যচিত্র 'আদম সুরত'॥

প্রশান্ত ভট্টাচার্য

এসো, উদ্দালকের পিছু পিছু

[ড. নারলা ভেঙ্কটেশ্বর রাও প্রণীত 'পভার্টি অব ইনটেলেকচুয়ালইজম ইন ইনডিয়া' গ্রন্থের পর্যালোচনা]

নতুন মহাকাব্য লেখা হল না গেরিলা ছন্দে ঠিকই, তবু সত্তরের দশক আমাদের চেতনার পরতে পরতে মিশিয়ে দিল— কেউ দেবতা নয়, কেউ দানব নয়। ফলে যে মূল্যায়ন আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে নতুন করে দেখা দিল সত্তরের দশকের গোড়ায় বা কিছু আগে, যা শুরু করেছিলেন কয়েকজন বুদ্ধিজীবী-রাজনীতিক কিংবা রাজনীতিক-বুদ্ধিজীবী তার ঢেউ একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়েছিল এই উপমহাদেশের জ্ঞান ও মেধা-চর্চার কেন্দ্রগুলিতে। কেউ নীরবে কেউ বা সরবে তাঁদের মেধাবী চিন্তা ও প্রকরণ অব্যাহত রেখেছিলেন। কলকাতা বা কলকাতা-কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের সুপ্ত আত্মশ্লাঘা— একমাত্র তাঁরাই সংস্কারমুক্ত হয়ে নির্মোহ দৃষ্টিতে সমাজের গতি-উপগতি অধ্যয়ন করতে পারেন কিংবা নিজেদের অতীতকে একজন প্রথাতিগ খনকের মতো পারদর্শিতায় খুঁড়তে পারেন; পারেন নির্মম সত্য সোচ্চারে বলতে। এঁদের এই মানসিক অবস্থান অমূলক নয় কেননা আর যাঁরা 'অকোলকেতে' কিম্বা অবাঙালি তাঁদের কাজকর্মের হদিশ দেয়া বা রাখাটা ঠিক এখানকার সংবেদনশীল সংস্থাগুলির কাজ নয়। ফলে বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞানতা এখনও যেমন পাথরপ্রমাণ আগামী দিনেও তা পর্বত বই মূষিক হবে না।

এক বছর আগে আমার হাতে দক্ষিণ ভারতীয় বিবেকবান বুদ্ধিজীবী ড. নারলা ভেঙ্কটেশ্বর রাও-এর 'ভারতীয় বুদ্ধিবাদের দীনতা' (Poverty of Intellectualism in India) বইটি এসেছে। সুখপাঠ্য এমন বইটি পড়ে আমিই বা কি করলাম! ক'জনকে পড়াতে পারলাম! কয়েকজন বন্ধুকে মুখে বলা কিম্বা অংশবিশেষ পড়ে শোনানো ছাড়া কি-ই বা করেছি! অথচ এমন একটি বইয়ের অবাধ প্রচার ও পাঠ হওয়া উচিত ছিল। বহুল প্রচারের জন্য অনুবাদ জরুরি ছিল।

'ভারতীয় বুদ্ধিবাদের দীনতা' ড. নারলার দুটি বক্তৃতার সংকলন। ১৯৭৩ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব কন্নড় স্টাডিজ-এর আমন্ত্রণে তিনি দুটি বক্তৃতা দেন; বিষয়বস্তু ভারতের বুদ্ধিবাদী চিন্তার স্রোত— সেই যাজ্ঞবল্ক থেকে রামমোহন হয়ে গান্ধী পর্যন্ত প্রভাবশালী চিন্তাবিদদের মতাদর্শের ভিত্তি ও স্বরূপ। বক্তৃতাকে তিনি দুটি অংশে বিভক্ত করেছেন— (১) প্রাচীন ও মধ্যযুগ, (২) আধুনিক যুগ।

সাধারণভাবে এ ধরনের বইগুলিতে স্বীয় মতপ্রকাশে অসাহসী হয়ে যে ভাষা ও শব্দের ব্যূহ এবং চালিয়াতি থাকে ড. নারলার বইয়ে তা কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই বইটির প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে ড. নারলার ও তাঁর কাজ-কর্মর সঙ্গে পাঠকদের একটু পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। BIRDS বলেছে :

'অহিন্দীভাষী অঞ্চলের লোকেরা, বিশেষত দক্ষিণভারতীয়রা হিন্দীভাষী অঞ্চলের লোকজনের তুলনায় অনেক ব্যাপারেই ভিন্ন। যেমন ওদের তুলনায় তারা আরও উদারমনা। হিন্দীভাষী অঞ্চলের সংকীর্ণ মানসিকতার ফলে সেখানকার লোকজনেরা দক্ষিণভারতীয়দের বুদ্ধিবাদী কাজ-কর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁরা বুদ্ধিচর্চার জগতে দক্ষিণ-ভারতীয় অতীত স্তম্ভদের··· এবং আমাদের কালের ড. নারলা সম্পর্কেও একেবারেই অজ্ঞ।'

BIRDS— ব্যাঙ্গালোর ইনস্টিটিউট অব্ রিসার্চ ইন ডেমোগ্রাফি অ্যান্ড সোসাইটি-র উপরোক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত না হলেও এটা ঠিক যে প্রচার ও প্রসার মাধ্যমগুলির একদেশদর্শিতায় আমরা অনেকেই এঁদের জানি না, চিনিও না। অথচ ড. নারলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার আগ্রহে যখন আমি খোঁজ-খবর চালাচ্ছি তখন আমার হাতে এল ড. নারলা রচিত একটি পঁচিশ পৃষ্ঠার নাটিকা 'জাবালি'। নাটিকাটির বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য আমাকে বিস্মিত করে। পঁচিশ পৃষ্ঠার নাটিকাটির ঊনষাট পৃষ্ঠার একটি ভূমিকা লিখেছেন নাট্যকার। এই দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি তাঁর বক্তব্যের তথ্য ও তত্ত্বগত সমুচ্চয় ঘটিয়েছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আর. জি. ভাণ্ডারকারের (পুনার ভাণ্ডারকার ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট যাঁর নামাঙ্কিত) গৃহীত সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করে তিনিও বলেন— 'এটা খুব করুণ যে আমাদের বেশিরভাগ বি.এ., এম.এ.-রাও রামায়ণকে ইতিহাস বলে মনে করে।' তাঁদের কথাবার্তার বিষয়বস্তুও রামায়ণ-মহাভারতের জনপ্রিয় সংস্করণগুলি ভিত্তি করে, সংস্কৃত সংস্করণগুলিকে ভিত্তি করে নয়। আজকে ড. নারলা বা ভাণ্ডারকার-রা জীবিত থাকলে বলতেন এখন সমস্ত কথাবার্তা হয় টি. ভি.-র জনপ্রিয় সিরিয়াল দুটোকে ভিত্তি করে। 'বাল্মীকি রামায়ণ' না বলে উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই নারলা 'সংস্কৃত রামায়ণ' বলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব যুক্তি আছে। আর সেই যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেই তিনি বাল্মীকি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান তিন নয় রাজা দশরথের স্ত্রীর সংখ্যা সাড়ে তিনশ'। পাঠক অবাক হবেন না, অবিশ্বাসও করবেন না ; এটাই সত্যি। একটু নজর করে পড়ুন বাল্মিকী রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের চৌত্রিশতম সর্গটি। যদিও নারলার সন্দেহ গভীর— আমাদের বইয়ের আলমারিতে জনপ্রিয় সংস্করণ ছাড়া সংস্কৃত রামায়ণ নেই। নারলা দ্বিধাহীন কণ্ঠেই দাবি করেন তিনি একবার নয় একাধিক বার রামায়ণ পাঠ করেছেন। আর তাঁর এই ঘোষণা অমূলক নয়, দাম্ভিকতা নয় যখন তাঁর লেখায় উদ্ধৃত অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টম সর্গ থেকে আমরা জানতে পারি যে রাম এক এবং একমাত্র সীতাপতি নয়, তাঁরও একাধিক স্ত্রী ছিল। এবং 'পুরুষোত্তম' রামের যথার্থ

অনুজ ভরতেরও সংখ্যার বিচারে স্ত্রীভাগ্য নেহাত কম ছিল না।

একজন মুক্তমনা, অন্তর্ভেদী পাঠকের মতো সংস্কৃত রামায়ণ অধ্যয়ন করে, জনপ্রিয় সংস্করণগুলির সঙ্গে তাঁর সেই পাঠের তুলনা করে, রামায়ণের বহু অনালোচিত দিক তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন 'জাবালি'-র ভূমিকাতে তা পাঠকনির্বিশেষের কাছে এক বিরল পাওনা। আমরা পাঠকরা বিতর্ক করব, বিবাদ করব, পৃষ্ঠা-পৃষ্ঠান্তরে আমাদের মতান্তর হবে তবুও তাঁর এই পরিশ্রমী-নিষ্ঠাসহ কাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে বাধ্য হব।

কী আছে জাবালি-তে

পুনরুত্থানবাদী-মৌলবাদীদের অধুনা দৌরাত্ম্যের অনেক আগেই ১৯৬৫ সালে এই নাটিকাটি রচিত হয়। ভরতের নাট্যশাস্ত্র বা অ্যারিস্টটলীয় পোয়েটিকসের বিচারে কিংবা স্ট্রাকচারালিস্ট বা ইদানিংকালের উত্তর আধুনিকদের শবচ্ছেদে 'জাবালি' কতটা নাটক হয়েছে সেটা জানি না কিন্তু এমন একটি বিষয় যে আজকের ভারতীয় আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভীষণভাবে দাবি করছে সেটা বলতে করো দ্বিধা হওয়া উচিত নয়।

নাটিকার স্থান— চিত্রকূট পর্বতের নিকটবর্তী স্রোতস্বিনী মন্দাকিনীর তীর। পাশে একটি আমগাছ।

নাটিকার কাল— রামের বনবাস।

নাটিকার পাত্র— জাবালি, রামচন্দ্র, বশিষ্ঠ।

পুরুষোত্তম রামের মনের আকাশে কোন মেঘ নেই। কিন্তু জাবালি সেখানে মেঘের আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন, ভয়ংকর অথচ স্বাভাবিক কতগুলি জিজ্ঞাসার মুখে ফেলে দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্রকে।

রাম : আপনার কথাগুলি বড়ো অদ্ভুত এবং বিস্ময়কর।

জাবালি : তুমি এখনও খুব তরুণ এবং অনভিজ্ঞ। মনে রেখ যা সাদা তাই দুধ নয় : যা স্বচ্ছ তাই জল নয়।

জাবালি রামকে সতর্ক করতে তাঁর আশংকার কথা বলেন। তাঁর আশংকা ভরত একদিন সিংহাসন নাও ছাড়তে পারেন। বিরক্ত রাম বলে ওঠেন— 'মনে হচ্ছে আমার ভাইকে যেন আমার চেয়েও ভাল চেনেন আপনি!'

জাবালি : রাঘব! তুমি জান ক্ষমতার কি পরিমাণ অসৎ প্রভাব থাকতে পারে? সিংহাসনের আকাঙ্ক্ষা দুই ভাইয়ের মধ্যে গরলের বন্যা বইয়ে দিতে পারে, পারে পিতা-পুত্রের মধ্যে চিরকালীন…

জাবালির যুক্তির বুনোটে ক্লান্ত হয়ে রামচন্দ্র নিজেকে নির্বোধ বলে ভাবতে শুরু করে— একে একে সংসারের জটিল স্বার্থান্বেষী জটিলতাগুলি তার মাথায় ঢুকে পড়ে। রামচন্দ্রের হতাশ কণ্ঠস্বর :

'আপনি আপনার যুক্তি দিয়ে আমাকে দিশেহারা করে দিচ্ছেন। আপনার মেধাবী যুক্তিগুলি স্মৃতি আর শ্রুতির পরিপন্থী!'

সুপণ্ডিত জাবালির উত্তরটি মনে রাখার মতো: 'আমার কথাগুলো শ্রুতি-স্মৃতির পরিপন্থী হতে পারে কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে তা যুক্তির পরিপন্থী নয়।'

শেষপর্যন্ত রামচন্দ্র প্রায় পিতৃশর্ত রক্ষা করতে পারবেন কিনা এই অবস্থা যখন সৃষ্টি হতে চলেছে তখনই সেই নির্জন স্থানে উপস্থিত হন দশরথের প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠ। নাটকীয়ভাবেই অবস্থার পরিবর্তন হয়। জাবালি চরিত্রের দুর্বল অথচ স্বাভাবিক দিকটি প্রকাশ পায়, আর অবাক হওয়ার পালা শুরু হয় শ্রীরামচন্দ্রের। বশিষ্ঠের অনুগত জাবালিকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে রামচন্দ্রের সমস্ত পূর্ব সংশয় কেটে যায়। শুরু হয় নতুন সংশয়— 'সত্য কি? মিথ্যে কি? শঠতা কি?'

প্রচলিত বা চাপিয়ে দেয়া স্মৃতি-শ্রুতি সম্বলিত যুক্তি ও জ্ঞানের ফাঁপা দিকটি অল্প পরিসরে তুলে ধরে কতগুলি প্রশ্ন তুলেই নাটিকাটি শেষ হয়।

'জাবালি' সহ তাঁর অ্যাকাডেমি পুরস্কারে সম্মানিত 'সীতাজোস্যাম' (Seethajcsyam) নাটক দুটি তেলেগু থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন পি. এস. শ্রীধর মূর্তি। নাটক দুটি 'লাস্ট ওয়ার্ড অন্ রামায়ণ' শীর্ষকে প্রকাশ করেছে BIRDS. শ্রীধর মূর্তির লেখা থেকেই জানা যায় হায়দ্রাবাদে নারলার অনুগামীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন— 'নারলা ইনস্টিটিউট অব্ নিউ থট্'।

বুদ্ধিবাদীরা অসন্তুষ্ট হবেন না

জাবালি লেখার আট বছর পরে ১৯৭৩ সালে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. নারলার বক্তৃতা দুটি তাঁর চিন্তার ক্রমবর্ধমান অবস্থাকেই প্রতিফলিত করছে। 'ভারতের বুদ্ধিবাদের দীনতা'— এই শীর্ষকটির জন্যই আপত্তি উঠতে পারে— বুদ্ধির জগতে আমরা কেউ দরিদ্র থাকতে আগ্রহী নই। বিদ্বানদের পক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও ওঁর বক্তৃতাতে এমন কিছু বিষয় এসেছে কিম্বা সিদ্ধান্ত আকারে বেরিয়ে এসেছে যা মৌলিকতার দাবি রাখে। বক্তৃতার মধ্যে সবচেয়ে জরুরি এবং সিদ্ধান্ত আকারে যে মতটি প্রকাশ পেয়েছে তা ওঁর দ্বিতীয় বক্তৃতার প্রথমেই— 'আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে উদ্দালকের পরিবর্তে যাজ্ঞবল্ককে আমাদের জাতীয় দার্শনিক হিসাবে নির্বাচন করাটাই আমাদের বুদ্ধিবাদের ইতিহাসে মস্ত ভুল। এবং আধুনিক যুগে আমরা আবার ওই রকম একটি ভুল করেছি। যদি সত্যিই আমরা এই আধুনিক ভারতে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে চাইতাম তবে আমাদের অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত ছিল রাজা রামমোহন রায়ের পরিবর্তে হেনরি লুই ডিরোজিও-কে।'

এমন বাঙালি নিশ্চয়ই কেউ নেই যে এরকম বাক্য পাঠ করার পর বইটি ও তার লেখক সম্পর্কে কৌতূহলী হবেন না। আরও একটি সাহসী এবং সুচিন্তিত বাক্য পেলাম প্রথম বক্তৃতাটির শুরুতেই, যেখানে তিনি বুদ্ধিবাদ কি এই ব্যাখ্যা শুরু করছেন— 'আমি বলতে পারি এম. এন রায় একজন বুদ্ধিজীবী হলে, এম.·কে. গান্ধী বুদ্ধিজীবী নন।' আমার পাঠকদের মানসিকতা আমার পক্ষে অননুমেয় নয় তাই আমি উল্লেখ করছি কেন নারলা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বুদ্ধিজীবী বলে মনে করলে গান্ধীকে করছেন না "উভয়েরই বুদ্ধি ছিল, উভয়েরই যুক্তি ছিল, বিষয়ের পার্থক্য বোঝবার ক্ষমতা ছিল। তথাপি আমরা রায়ের লেখায় কদাচিৎ আত্মার উল্লেখ পাই, যা পাই তাও ঠাট্টার ছলে। অন্যদিকে আমরা লক্ষ করলেই দেখতে পাব, গান্ধী সব সময় আত্মা সম্পর্কে, আত্মার শক্তি সম্পর্কে বলেছেন। এমনটা নয় যে তিনি বুদ্ধিকে চিরকালই বাতিল করেছেন, কার্যত তিনি ভাবতেন আত্মা মুখ্য, বুদ্ধি গৌণ; বাস্তবে বুদ্ধি আত্মার অনেক পিছনে পড়ে আছে। তিনি বলতেন, 'মহৎ কাজ শুধুমাত্র বুদ্ধিমত্তা দ্বারা সমাধান হয় না, তারজন্য লাগে আত্মিক উদ্যোগ বা আত্মার শক্তি।' রায় এবং গান্ধীর ঠিক এমনি একটি উদাহরণ আমরা উদ্ধার করতে পারি ইতিহাস থেকে; তাঁরা হলেন— উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক।"

আমাদের আপত্তি থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু নারলার কোন অস্পষ্টতা নেই। তিনি তাঁর যুক্তির পরম্পরায় পৃষ্ঠা পৃষ্ঠান্তরে চলে যান প্রাচীন ও মধ্যযুগের বুদ্ধিবাদের স্রোতে কোথায় দৈন্য বাসা বেঁধেছিল তা দেখাতে। যাজ্ঞবল্ক ও উদ্দালকের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান যাজ্ঞবল্ক একাধারে কীভাবে বিষয়ী ও দার্শনিক ছিলেন এবং তিনি সবটাই করতেন অদ্ভুত পারদর্শিতায়, অভিনব কূটভাষে। সংসারে শান্তি অটুট রাখতে বিষয়ী স্ত্রী কাত্যায়নীকে করেছিলেন পার্থিব সম্পদের একক অধিকারিণী। আর বিদুষী মৈত্রেয়ীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন অমৃতের পাত্র— বিদ্যা ও জ্ঞান।

ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যগুলিতে উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ককে যথাক্রমে আদিতম প্রকৃতিবাদী ও আদি ভাববাদী বলে দেখানো হয়েছে। উদ্দালক সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতার জন্মতত্ত্বের যে ধারণা চলে আসছিল তাতে ফাটল ধরিয়েছিলেন। 'উদ্দালক জাতক'-এ পাওয়া যায় বিশ্ব সম্পর্কে তাঁর বস্তুবাদী ধ্যান ধারণা।

উদ্দালকের প্রকৃত বিরোধী যাজ্ঞবল্ক বিশ্বের পরমাত্মাকে সঙ্গীতের যন্ত্র বলে মনে করতেন এবং পৃথিবীর উপাদানগুলোর স্বরের মতো বেরিয়ে এসেছে। যাজ্ঞবল্কের কাছে বিশ্বজগৎ হচ্ছে মায়া। যদিও বিদেহ-র রাজা জনকের সমসাময়িক দার্শনিক প্রবরের মতাদর্শ ও জীবনযাপনের মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য।

ম্যাক্সমুলার-কৃত ভারতীয় দর্শনের ছটি শাখার কথা উল্লেখ করেও তিনি বলেন 'পূর্বমীমাংসা' পুরোহিতদের যাগযজ্ঞ শেখাবার জন্য জামিনীর তৈরি ব্যবহারিক গ্রন্থ। আর, পতঞ্জলীর 'যোগ' মনো-স্বাস্থ্য অভিজ্ঞতায় ক্লান্তদের ম্যানুয়াল। আজকের দিনে

'যোগ' ভাল লাভজনক ব্যবসা। আসলে চিন্তা করার জন্য চিত্তকে পরিশুদ্ধ করার তথাকথিত পদ্ধতিটি 'যোগ'। কে. এস. মূর্তিকে উদ্ধৃত করে তিনি জানান— 'যোগের লক্ষ্য চিন্তাকে হত্যা করা। মানুষের ইতিহাস হচ্ছে চিন্তার ইতিহাস ; হোমোস্যাপিয়েনস্ মানুষ চিন্তাশীল। যোগাভ্যাস ও আত্মার স্বাধীনতার আকুল আকাঙ্ক্ষা সম্ভব চিত্তকে খুন করার মতো একটি বিশাল মূর্খামির পরে।'

হিন্দুরা দার্শনিকভাবে কোনদিনই উদার নয়— তা বেনার হত্যা, শম্বুকের শিরচ্ছেদ ও চার্বাকদের তাড়িয়ে বেড়ানোতেই প্রমাণিত। যাঁরাই বেদের সত্যাসত্য যাচাই করতে চেয়েছেন তাঁরাই নিগৃহীত হয়েছেন হিন্দুদের হাতে। বেদান্তবাদীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন বুদ্ধ মহাবীরের অনুগামীরা। অনেক হিন্দুরাজা, শংকরাচার্যের অনুগামীরা বৌদ্ধদের বহু স্মৃতিস্তম্ভ এবং কেন্দ্র ধ্বংস করেছেন। এ সমস্ত কার্যক্রমই হিন্দুদের অসহনীয় মানসিকতাকে প্রতিফলিত করে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ কারণেই হিন্দুধর্ম অনমনীয়, হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বলতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

ড. নারলা বস্তুবাদী দর্শনের ছাত্র। কিন্তু এই বক্তৃতায় ভাববাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করতে চাননি— বলতে চেয়েছেন— হিন্দুরা যেভাবে মুক্ত চিন্তার, সব মতাদর্শের সমান সুযোগের কথা বলেন আদৌ তা কখনো ছিল না এবং এখনও নেই। হিন্দু হলে কতগুলি মৌলিক বিষয় আছে যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাবে না :

১. বেদ হচ্ছে স্বর্গীয় সত্য।
২. বেদান্ত এমনই মহৎ যে দেশী বা কোনো দার্শনিক তত্ত্বের উৎকর্ষই তার ধারে কাছে পৌঁছতে পারবে না।
৩. পার্থিব জগত মায়া, আত্মাই এক এবং একমাত্র সত্য।
৪. শুধু অবিরাম পুণ্যার্জনের মধ্য দিয়েই জন্মমৃত্যুর চক্র ভেঙে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হতে পারে।
৫. অসাম্য প্রকৃতির নিয়ম ; অতীত জীবনের কর্মফলই বর্তমান জন্মের সামাজিক বর্গ নির্ণীত করে দেয়।
৬. বর্ণাশ্রম ধর্ম অনড়, এই ধর্ম অমান্য করলে পৃথিবী ধ্বংস হবে।

এই বিধানগুলির একটিও ঋকবেদে খুঁজে পাওয়া যাবে না, বরং ঋকবেদে পার্থিব জীবনই আলোচিত সেখানে স্বর্গের ব্যাপার নেই। আত্মা ও বস্তুর কোনো পার্থক্য ঋকবেদে পাওয়া যাবে না। ড. নারলা কুনহান রাজার মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেন— 'যদি আমায় কেউ প্রশ্ন করে যে বৈদিক সংস্কৃতির মর্মার্থ কী, তবে আমার উত্তর -- এই সুন্দর পৃথিবীতে একটি সুখী জীবন গড়ে তোলা।'

আর্যদের এদেশে আসা এবং ঋকবেদ সৃষ্টির আলোচনা করে তিনি দেখান যে তাদের ছিল সুখাদ্য ও মদে দারুণ আসক্তি এবং যৌনসুখে তারা পরমানন্দিত হতো ; তাদের একদিকে কাব্য-সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক প্রিয় ছিল অন্যদিকে ঘোড়দৌড় ও জুয়া।

স্তোত্র রচনা করা ছিল তখনকার দিনে অন্যতম পেশা। এক-একজন রচয়িতা ইদানিং কালের সিনেমার গীতিকারদের থেকেও বেশি পয়সা পেতো। ঋকবেদে বর্ণাশ্রমের কোনো ব্যাপার ছিল না। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে আর. সি. দত্তের একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন—"বর্ণ এই বিশেষ শব্দটি সংস্কৃততে জাত (কাস্ট) বোঝালেও ঋকবেদে তা ব্যবহৃত হতো আর্য ও অনার্য বোঝাতে। 'ক্ষত্রিয়' শব্দটি পরবর্তীকালে সংস্কৃতে যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ঋকবেদে তা হয়নি— ঋকবেদে তার ব্যবহার বিশেষণ রূপে, শক্তিশালী অর্থে। 'বিপ্র' শব্দটিও জ্ঞানীর বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হতো। এমনকি 'ব্রাহ্মণ' শব্দটি ঋকবেদে একশো জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে স্তোত্রের রচয়িতা হিসেবে।"

ড. নারলার মতে ঋকবেদ ছিল "জয়ের যুগ, উপনিবেশ সম্প্রসারণের যুগ। তাদের স্লোগান ছিল 'চরৈবেতি!" (এগিয়ে চলো! এগিয়ে চলো!) ফলে তাদের হাতে শ্রেণী বা জাত নিয়ে চর্চার সময় ছিল না। ঋকবেদ শেষ হচ্ছে ঐক্যের আবেদন দিয়ে— তার কাছে পার্থিব জগত কখনোই মায়া নয়। আলবার্ট সুইৎজার এবং এস. কে মূর্তির মতামত অস্বীকার করে নারলা বলেন ঋকবেদের সময়কার মানুষের পৃথিবী ও জীবনের প্রতি ভালোবাসা ছিল অদম্য। ক্রমে ক্রমে এবং মন্থর গতিতে পৃথিবীর ও জীবনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলালো— এবং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই প্রতিফলিত হয়েছে। ঋকবেদ ও উপনিষদের মধ্যে আনুমানিক পাঁচশো বছরের তফাত, আর এই সময়ের মধ্যেই সিন্ধু ও গাঙ্গেয় উপত্যকা আর্যরা দখল করে নিয়েছে। যাদের আর্যরা নিজস্ব সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে টানতে পারেনি তারা হয়েছে তাদের ভাষায় শূদ্র এবং যারা তাদের প্রভুত্ব না মেনে গহন অরণ্যে কিংবা পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছে তারা হয়েছে চণ্ডাল বা অস্পৃশ্য।

ঋকবেদে যা ছিল না সেই পুনর্জন্ম ও কর্মফল কি করে বিধান হিসাবে এল তার কাহিনী জানা যায় বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে। বিদেহরাজ জনক তাঁর যজ্ঞকালে উপস্থিত ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের জন্য একটি দানের ব্যবস্থা করলেন। এক হাজার গোরু ও তাদের শিং-এ দশ পাদ (তখনকার একক) স্বর্ণমুদ্রা বেঁধে দিয়ে বললেন— 'আপনাদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই এই উপহার গ্রহণ করুন।' ব্রাহ্মণেরা একে অপরের মুখের দিয়ে চেয়ে আছেন। এমন সময় যাজ্ঞবল্ক তাঁর শিষ্যকে গোরুগুলি তাঁর আশ্রমে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। অন্য ব্রাহ্মণরা রুষ্ট হয়ে যাজ্ঞবল্ককে তর্কে আহ্বান করলেন। একে একে সবাই পরাভূত হলে এগিয়ে এলেন জারংকারব আর্তভাগ নামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ। তুমুল তর্কের মুহূর্তে যাজ্ঞবল্ক বললেন— 'আহর সোম্য হস্তমার্ত-ভাগাবামে বৈতস্য বেদিষ্যাবো না নাবেতৎ সজন ইতি।' (সৌম্য আর্তভাগ তোমার হাত আমাকে দাও। আমরা দুজনে এই রহস্য জানব। কিন্তু এই জনবহুল স্থানে তা হবার নয়।) এরপর তাঁরা দুজনে বেরিয়ে গেলেন এবং ফিরে এলেন— বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলছে তাঁরা ফিরে আসতে আমরা জানলাম তাঁরা কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং

কর্মের প্রশংসা করেছেন। তাঁরা একমত হয়েছেন যে পুণ্যকর্ম দ্বারা পুণ্যবান হয় এবং পাপকর্ম দ্বারা পাপী হয়। জারৎকারব আর্তভাগ ও যাজ্ঞবল্কের সমঝোতার মধ্যে কি ব্যক্তিগত চুক্তি হয়েছিল, লেন-দেন হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই কিন্তু সেই থেকেই কর্ম ও কর্মফলের অনিবার্যতা মেনে নেওয়া শুরু হল।

যুক্তির দৃঢ় ভিত্তি না থেকেও কর্ম এবং পুনর্জন্ম হিন্দু জীবনধারা ও তত্ত্বের মূল। এর এত ক্ষমতা যে বুদ্ধ-মহাবীরের মতো নিরীশ্বরবাদীরাও পুনর্জন্ম এবং কর্মফলে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং এই একটি জায়গায় অন্যান্য ধর্ম, বিশেষত খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে— খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মের মতো ঈশ্বরে অবিশ্বাস হিন্দুধর্মে ক্ষমার অযোগ্য নয় কারণ শাসক ও এলিট সমাজের প্রভুত্ব এই অবিশ্বাসে নষ্ট হয় না কেননা তাদের প্রভুত্ব টিকে আছে কর্মফল ও পুনর্জন্মের বিশ্বাসের উপর— সাধারণের মনে এই বিশ্বাস অটুট রাখাই হিন্দু মাতব্বরদের আদর্শ।

জালিয়াতি হিন্দুদের জাতীয় ঐতিহ্য। কোনো মৌলিক রচনার মধ্যে পছন্দমতন বিষয় সংযোজিত করা এবং অপছন্দের বিষয় বিলোপ করাই— এবং এইরকম সম্পাদিত রচনাই মৌলিক বলে চালানোটা হিন্দুদের ঐতিহ্য। দীর্ঘদিন গবেষণা করে জার্মান পণ্ডিত রুডলফ ওটো দেখান যে গীতার মূল শ্লোক ছিল মাত্র তিয়াত্তরটি। গবেষণায় আরও দেখা যায় মহাভারতে মূল শ্লোক ছিল আট হাজার আটশো— তখন তার নাম ছিল 'জয়'। পরবর্তী সংস্করণে তার নাম বদলে হল 'ভারত' এবং শ্লোকের সংখ্যা হল চব্বিশ হাজার; এখনকার মহাভারতে সেই সংখ্যা ছিয়ানব্বই হাজার আটশো ছত্রিশ। রামায়ণের অবস্থা তথৈবচ। এবং এসব করা হয়েছে নিছক খেয়ালে নয়, বরং উদ্দেশ্যমূলকভাবেই— অন্য দার্শনিকমতাবলম্বীদের ও তাদের কার্যকলাপকে হেয় করতে। গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই বর্ণে ক্ষত্রিয়— এবং এঁরা নিজেদের জাত (কাস্ট)-কে নিজেদের কর্ম দিয়ে ব্রাহ্মণের চেয়ে উঁচুতে তুলে নিয়েছিলেন। এদের টেনে নামাতে হবে, অতএব ক্ষত্রিয় ভীষ্মকে দিয়ে ক্ষত্রিয় যুধিষ্ঠিরকে বলানো হচ্ছে রাজার প্রধান কর্তব্য ব্রাহ্মণদের সেবা করা। অনুশাসন পর্বে বলানো হচ্ছে— 'রাজমুকুটধারী ক্ষত্রিয়দের প্রধান কাজ শিক্ষিত ব্রাহ্মণের সেবা করা··· যদি ব্রাহ্মণেরা অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয় তবে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।' এরকম অসংখ্য সংযোজন পাওয়া যাবে— যার তুলনায় আর সমস্ত সাহিত্য-ঘটিত জালিয়াতি ম্লান হয়ে যায়।

আরও একটি অপরাধ, মিথোলজির ব্যাখ্যায় তারা নিয়ে এল অবতারের তত্ত্ব। বুদ্ধকে বানালেন অবতার। এরই পাশাপাশি 'ভক্তি'। 'মহকাব্য' ও 'পুরাণ' হচ্ছে শূদ্রদের গ্রন্থ। আইনপ্রণেতাদের অন্যতম গৌতমের ভাষ্য— শূদ্রেরা বেদপাঠ শুনলে তাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বন্ধ করে দেওয়া হবে উত্তপ্ত তরল ধাতু ঢেলে; তারা বেদপাঠ করলে জিভ কেটে নেয়া হবে; এবং যা পাঠ করেছে তা যদি সে মনে রাখতে পারে তবে তার দেহ

দ্বিখণ্ডিত করা হবে। এটা বেশ মজার যে যে-কোনো ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থটি সেই ধর্মের সকল সদস্যদের জন্য, যেমন বাইবেল সব খ্রিস্টানদের, কোরান সব মুসলমানদের কিন্তু হিন্দুদের উচ্চবর্গীয়দের জন্য বেদ এবং নিম্নবর্গীয়দের জন্য মহাকাব্য এবং পুরাণ। এ সবই বেদান্তবাদীদের অদ্ভুত মনীষার ফের!

মধ্যযুগীয় ভক্তিবাদ এবং তার সন্ত দাদু, কবীর, রাজ্জাব প্রমুখ এবং সর্বশেষ চৈতন্য বর্ণাশ্রম কিংবা অস্পৃশ্যতা মানতেন না ঠিকই কিন্তু শেষ পর্যন্ত এঁদের কার্যক্রম কিছু সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে সমাজকে আরও টুকরোই করেছে— সামাজিক বিন্যাস তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ড. নারলার মতে ভক্তি আন্দোলন আরেকভাবে মানুষের মুক্তচিন্তার ক্ষতিই করেছে। যদিও তিনি ডি. পি. মুখার্জির সঙ্গে একমত যে ভক্তি আন্দোলন ছিল বুদ্ধিবাদের বিরোধী এবং এই আন্দোলন ভারতের প্রধান প্রধান ভাষার সাহিত্যে তার অবদান রেখে গেছে। ড. নারলার অপছন্দ ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যম ভক্তিবাদের মোক্ষে পেঁছিবার সরল ও নিশ্চিত পথের আসক্তিতে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, শূন্য আবিষ্কার নিশ্চয়ই গর্বের বিষয় কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারের ভিত্তি বেদ এটা মেনে নেয়া যায় না। ড. নারলা দৃঢ়ভাবে দাবি করেন যে আমাদের এই মানসিকতাই এদেশে ইসলাম-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান আসার পর তার থেকে ইতিবাচক কিছু গ্রহণ করতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অথচ সারা পৃথিবী জানে যে ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা ইসলাম-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে কতখানি ঋণী। আলবেরুনির রচনা উল্লেখ করে তিনি দেখান যে ভারতীয়রা কি-পরিমাণে অহংকারী ছিল— তারা মনে করত এই মর্তলোকে দেশ-জাতি হিসাবে তারাই মহত্তম; তাদের মতো ধর্ম, তাদের মতো জ্ঞান-বিজ্ঞান কারো নেই। কার্যত ইসলাম সংস্কৃতি থেকে হিন্দুরা যা গ্রহণ করেছিল তার বেশিরভাগটাই ছিল তাদের সংস্কৃতির খারাপ দিক। পক্ষান্তরে ইসলামও যা গ্রহণ করল তা হিন্দুদের নিম্নমানের সামাজিক রুচি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়— হিন্দুরা নিল মুসলমানদের পর্দা, মুসলমানরা নিল হিন্দুদের জাতপাত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বুদ্ধিবাদের এই চেহারার মূলে মুক্তমনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিচার করার মানসিকতাসম্পন্ন এবং সুতার্কিক বুদ্ধির অধিকারী উদ্দালকের পরিবর্তে যাজ্ঞবল্ককে 'জাতীয় দার্শনিক' নির্বাচন। যাজ্ঞবল্কের বিচারে আত্মা বাস্তব, শিং-এ বাঁধা সোনা সমেত গোরু বাস্তব, শুধু এই পার্থিব জগত অবাস্তব। উদ্দালক বিশ্বাস করতেন সবই বাস্তব, এই জগতের সবকিছুরই মূলে বস্তু, এককথায় বলতে গেলে যাজ্ঞবল্ক হচ্ছেন শব্দের ভোজবাজ বিপরীতে উদ্দালক বিজ্ঞান-চেতনা সম্বলিত একজন দার্শনিক। উদ্দালকই আমাদের প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক দার্শনিক, আদর্শবাদী দার্শনিক। আমাদের উদ্দালকের অনুগামী হওয়াই উচিত ছিল।

এমন কোন প্রতারণা, অপরাধ, নিষ্ঠুরতা নেই যা ধর্মের নামে হয়নি

আগেই বলেছি প্রায় তিন হাজার বছর আগে যেমন ভুল হয়েছিল উদ্দালকের পরিবর্তে যাজ্ঞবল্কের নির্বাচন ঠিক তেমনই ভুল হয়েছে হেনরী লুই ডিরোজিও-র পরিবর্তে রাজা রামমোহন রায়ের নির্বাচন।

'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের মেরুদণ্ড, বাংলার নব্যযুগের প্রধান পুরুষ ডিরোজিও শেখাতে চেয়েছিলেন সবকিছুকে সন্দেহ কর, পরীক্ষা কর, তারপর গ্রহণ কর— তা যদি ফ্রান্সিস্ বেকনের সুচিন্তিত বচন হয়, তবুও। এই নব্য-চেতনার দ্রুত সমাপ্তি নিয়ে এলেন রামমোহন রায়। গান্ধী রামমোহনকে 'বামন' বলে ভুল করেছিলেন এবং গান্ধীর এই মতের যথাযথ বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ— আসলে রামমোহনের প্রভাব ছিল সুদূর বিস্তৃত। অভিজাত মুসলিমদের মতো পোশাকে, হিন্দু উদারবাদীদের মতো জীবনধারণে, খ্রিস্টান একেশ্বরবাদীর মতো চিন্তাভাবনা নিয়ে তিনি যা করেছিলেন তা বিস্ময়কর— তাঁর আর্থিক উৎসাহ ছিল ভূস্বামীদের ও মুৎসুদ্দিদের সঙ্গে জড়িত যদিও তাঁর বুদ্ধিবাদী উদ্দীপনা স্বপ্ন দেখতো স্বাধীনতা ও ন্যায়ের ভিত্তিতে গঠিত সর্বসাধারণের এক মঙ্গলময় বিশ্বের। সাধারণত তিনি যুক্তির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন কিন্তু প্রায়ই ধর্ম-বিশ্বাসের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেন। মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী হয়েও তিনি কিছু সময়ের জন্য তান্ত্রিকতা চর্চা করেছেন— যা মূর্তি পূজার চেয়েও খারাপ। এবং সবসময়েই যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না এমন জিনিসের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করতেন। তাঁর জীবন এবং চিন্তাভাবনার বৈপরীত্যই এর কারণ। আসলে বিজ্ঞানভিত্তিক ধর্ম করতে গেলে না বিজ্ঞান চর্চা হয়, না ধর্ম চর্চা হয়। এবং রামমোহন নিজেও তা বুঝতেন।

১৮২৩ সালে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে লিখিত চিঠিতে সংস্কৃত স্কুল স্থাপন ও সংস্কৃত চর্চার বিরোধিতা করে রামমোহন যখন তাদের জানাতে চান যে বেকনের আগে ইউরোপে যে রকম মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা ছিল ভারতে তা আনার প্রয়োজনীয়তা হাস্যকর, এখানে চাই বেকনীয় দার্শনিক পরিমণ্ডলের উপযুক্ত শিক্ষা— সেই রামমোহন 'বেকন সমাজ' প্রতিষ্ঠা না করে 'ব্রাহ্ম সমাজ' কেন প্রতিষ্ঠা করতে গেলেন এটাই ড. নারলার জিজ্ঞাসা। এবং তিনি নিজেই উত্তর দেন— রামমোহন চেয়েছিলেন ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব নয়। রামমোহনের চিন্তাভাবনার দিক উল্লেখ করে তিনি বলেন সামাজিক সংস্কার থেকে ধর্মীয় বিশ্বাসকে আলাদা করা উচিত এবং এক কিম্বা বহুঈশ্বরের পূজা সবই আসলে যুক্তির উপরে ধর্মবিশ্বাস, মুক্ত চিন্তায় উপর প্রভুত্বকে স্থান দেয়। এবং এ কারণে খুব সঠিকভাবেই ডিরোজিও শুরু করেছিলেন সবরকম ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার উপর। কার্যত রামমোহনের বেদান্তচিন্তা মুক্ত চিন্তাতে অবরোধ তুলেছিল, ক্ষতি করেছিল বুদ্ধিবাদের। এবং রেনেশাঁসের সোনালী আকাশ ক্রমে আঁধারে ঢেকে গেল।

রামমোহনের মৃত্যুর পর কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মধর্ম সর্বভারতীয় এলিটিস্ট আন্দোলনের রূপ নিলেও রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মতোই ধর্মীয় সংগঠনটিও টুকরো-টুকরো হল। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি এক কথায় ভারতীয় চিন্তা ভাবনার জগতে প্রচুর অবদান থাকা সত্ত্বেও প্রচলিত ভারতীয় জীবন ও চিন্তাধারার উপরিতলে সামান্য আঁচড় কাটা ছাড়া কিছুই করতে পারেনি এই ধর্মীয় আন্দোলন। এবং এই আন্দোলনের পুনরুত্থানেরও আর সম্ভাবনা নেই

ব্রাহ্ম নেতাদের বিপরীতে বিদ্যাসাগরের পোশাক এবং জীবন ধারণ ছিল প্রচলিত ব্রাহ্মণদের মতো। তথাপি তিনি বেদান্তবাদী ছিলেন না। কদাচিৎ বেদান্ত বা উপনিষদের উল্লেখ করতেন, কখনো পুজো করতেন না। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মনে করতেন তিনি অজ্ঞাবাদী (agnostic)। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর এই শিক্ষককে মনে করতেন নাস্তিক। দৃষ্টবাদীদের ঘনিষ্ঠ হয়েও তিনি কখনও তাঁদের কাজকর্মে অংশগ্রহণ করেননি, মোহিত হননি রামকৃষ্ণে। অধিবিদ্যার আলোচনায় অনাগ্রহী বিদ্যাসাগর ছিলেন যুক্তির পক্ষে প্রত্যাদেশের বিপক্ষে, ঈশ্বরের জন্য নয় মানুষের জন্য নিবেদিত প্রাণ। ড. নারলা মনে করেন, শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসার, বিশেষত নারী-শিক্ষার এবং বিধবাবিবাহের মধ্যে সীমিত না থেকে তিনি যদি বৃহত্তর আঙিনায় নিজেকে নিয়োজিত করতেন তবে ভারতীয় রেনেশাঁস বিপথগামী হতো না। ডিরোজিও-র ঘাটতি ছিল ভারতীয় ঐতিহ্য ও সভ্যতার সম্পর্কে। সেসব সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, মুক্তমনা পশ্চিমী যুক্তিবাদীর চিন্তায় সমৃদ্ধ বিদ্যাসগরই ডিরোজিও-র ধারাকে সঠিক পথে চালিত করতে পারতেন। কিন্তু পারলেন না! নারলা মনে করেন তার মুখ্য কারণ তাঁর অনুগামী ও কাছের মানুষদের থেকে বহু হৃদয়বিদারক আক্রমণ তাঁর ওপর হয়েছে, এক কথায় তাঁকে ক্লান্ত করে দিয়েছে।

দয়ানন্দ সরস্বতীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে ড. নারলা বলেন তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল মহাকাব্য ও পুরাণ সমেত জনপ্রিয় হিন্দুধর্মের মূলোৎপাটিত করা, উপনিষদ-ব্রহ্মসূত্র-ভগবতগীতা সমেত বেদান্তকে অগ্রাহ্য করা, এবং বৈদিক যুগকে পূর্ণ সমাদরে পুনরায় ফিরিয়ে আনা। তিনি মনে করতেন সব ধর্মের মধ্যে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম হচ্ছে ভীষণ শিশুসুলভ, তুচ্ছ। দয়ানন্দের এই উদ্দেশ্যের অংশীদার হতে তাঁর আপত্তি থাকত না কিন্তু দয়ানন্দের এই ঝোঁক তাঁকে আরেকটি চরম দিকে নিয়ে গেলো, যেখানে তিনি বিশ্বাস করেন বেদ সমস্ত জ্ঞানের আধার এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানেরও এবং ঈশ্বর নিজেই বেদ সৃষ্টি করেছেন। বেদ সম্পর্কিত দয়ানন্দের এই মানসিকতাকে সমর্থন জানিয়েছেন অরবিন্দ।

দয়ানন্দের আর্যধর্মেরও অন্যতম উপাদান অসহিষ্ণুতা। অনার্যদের তারা দাস এবং দাসু* বলে ডাকত, লিঙ্গ-পুজারীদের মতো তাদের ঘৃণাসহকারে পরিহার করত, নাক-চ্যাপ্টা বলে বিদ্রূপ করত, তাদের ভাষা কর্কশ বলে অবজ্ঞা করত; বাস্তবিক তাদের

* Slaves and thieves.

সম্পর্কেও একটাও ভাল কথা বলত না। ইসলাম ও খ্রিস্টানদের সঙ্গে তাদের বিরোধ ছিল হিংসাত্মক এবং গালিগালাজপূর্ণ। যদিও ব্রাহ্মধর্মের মতো আর্য সমাজের চিন্তা ভাবনায় ও কাজে কিছু প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী উপাদান ছিল। কিন্তু সংস্কারমূলক কাজকর্মে তারা এক-পা এগিয়ে দু-পা পিছিয়েই গেল।

থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি আমাদের এক-পা না এগিয়েই বারো-পা পিছিয়ে দিয়েছে। এঁরা হিন্দুধর্মীয়-সাহিত্যের সবটাই সংকলিত করল একেবারে অলঙ্ঘণীয় মনে করে। এই সোসাইটিতে হাজার হাজার শিক্ষিত ভারতীয় বিশেষত হিন্দুরা ভিড় করেছিল কেন? আমাদের মূর্খের মতো বিশ্বাসগুলি, নোংরা রুচিগুলি এবং অর্থহীন ঐতিহ্য-গুলির যথার্থতার বৈজ্ঞানিক বিচার করার যে প্রয়াস সোসাইটি দেখিয়েছিল তা আমাদের ক্ষতিই করেছে। যদিও এই সোসাইটির আজ আর কোনো বিশেষত্ব নেই তবুও যোগি-যোগিনী-ভগবান-মা-ত্রাতা ইত্যাদির জন্মাবার জন্য এই সোসাইটিই দায়ী বলে ড. নারলা মনে করেন।

বেদান্তবাদী হয়েও মূর্তিপুজোয় বিশ্বাসী গুরু-শিষ্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব আজও অটুট। 'হিন্দু নেপোলিয়ন' বিবেকানন্দ শুধু হিন্দুদের জন্য নয় পশ্চিমী বস্তুবাদী জগতে নিয়ে এলেন আধ্যাত্মবাদের বার্তা। এবং বিবেকানন্দই হিন্দুধর্মের ইতিহাসে প্রথম মিশনারি কার্য-কলাপ শুরু করলেন। হিন্দু কর্মফলে যেভাবে সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলা হয়েছে তার সঙ্গে মিশনারি কার্য-কলাপ স্ববিরোধী— এবং সে কারণেই রামকৃষ্ণমঠের অন্যান্য সদস্যরা তাঁর এই কার্য-কলাপকে হিন্দু-বিশ্বাস ও ঐতিহ্যবিরোধী বলে মনে করতেন। কোনো রাজনীতিক নয় বিবেকানন্দই বলেছিলেন যুগটা সমাজতন্ত্রের যুগ এবং তিনি মনে করতেন সন্ধেবেলা গীতাপাঠের চেয়ে যুবকদের একঘণ্টা ফুটবল খেলা অনেক কাজের।

এরপরে ড. নারলা মহারাষ্ট্রের ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবন ও চিন্তাভাবনা নিয়ে আলোচনা করে দেখান যে তা বেদান্ত নিয়ন্ত্রিত নয় বরং যুক্তিবাদ নিয়ন্ত্রিত। যাঁদের অন্যতম গোপালরাও দেশমুখ, জ্যোতিরাও ফুলে এবং গোপাল গণেশ অগরকার। ফুলে ছিলেন পেশায় একজন মালি। তিনি সেখান থেকে 'মহাত্মা' হিসাবে উঠে এসেছিলেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলের গুরু মহাদেব গোবিন্দ রানাড়ে বোম্বে হাইকোর্টের একজন জজ হিসাবেও গোপনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তাত্ত্বিক নির্দেশক ছিলেন। বি. আর. আম্বেদকরও ফুলে ও রানাড়ে-কে শ্রদ্ধা করতেন।

গান্ধী সম্পর্কে কিছু বলার আগে নারলা আমাদের জানিয়ে দেন কংগ্রেস-সেবীরা সাধারণভাবেই ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন এবং জ্যোতিষবিদ্যা, হস্তরেখাবিদ্যা, তান্ত্রিকতায় বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন এটা সম্ভবত তাঁরা জন স্টুয়ার্ট মিল ও লর্ড মোরলির দ্বারা প্রভাবিত বলেই।

গত দুশো বছরে আমাদের ইতিহাসে গান্ধীর সমতুল্য কোনো প্রভাবশালী মানুষ

আসেননি। তথাপি বলা যায় তিনি তত্ত্বগতভাবে আমাদের এক ইঞ্চিও এগিয়ে দিতে পারেননি। 'মানুষ গান্ধীর দর্শনের কথা বলেন'— নারলা বিনয়ের সঙ্গে বলেন সত্যি এমন কিছু নেই যা গান্ধীর দর্শন। তাঁর কিছু বিশ্বাস ছিল, কিছু প্রত্যয় ছিল এবং কিছু খ্যাপামি ছিল। এগুলি তিনি পেয়েছিলেন কোনটা হিন্দু, কোনটা জৈন, কোনটা খ্রিস্টধর্ম থেকে— এবং আর কিছুটা পেয়েছিলেন থোরে, টলস্টয়, রাস্কিন এবং এডওয়ার্ড কার্পেন্টারের কাছ থেকে। এ এক জগা-খিচুড়ি ব্যাপার যা পাওয়া যায় ভগবত গীতায়। আর এ কারণেই গান্ধী গীতাকে পবিত্র বলে মনে করতেন। তাঁর লেখায় বা বক্তৃতায় যা পাওয়া যায় সবই সেই 'হিন্দু স্বরাজ'-এর বিষয় যা তিনি লিখেছিলেন ১৯০৮ সালে। ডাক্তার প্রয়োজন নেই এবং ডাক্তার অসংযম, কদভ্যাস, পাপ জাগিয়ে দেয় — এই মানসিকতা নিয়ে তিনি প্রচার করতেন। মনে করতেন হৃদয় দিয়ে রামায়ণ পাঠ করলে সব রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু সবকিছু সিকেয় তুলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস অপারেশনের জন্য তাঁকে আধুনিক হাসপাতালে যেতেই হল। শুধু ডাক্তার নয়, হাসপাতাল, আইনজীবী, আদালত এমনকি রেলপথেরও তিনি বিরোধী ছিলেন।

কার্যত একজন ধর্মীয় মানুষ হিসাবে গান্ধী বুদ্ধির চেয়ে তাঁর অন্তরের উপলব্ধিকে মুখ্য বলে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর অন্তরের বাণী ঈশ্বরেরই বাণী। ড. নারলার মতে গান্ধীর বুদ্ধিবাদ-বিরোধী মানসিকতা ভারতের প্রভূত ক্ষতি করেছে।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ড. নারলা বলেন অতীন্দ্রিয়বাদী হয়েও তাঁর চিন্তাভাবনায় যুক্তিবাদের প্রকাশ পাওয়া যায়। এবং এ কারণেই গান্ধী যখন বিহারের ভূমিকম্পের কারণ মানুষের পাপ দেখেন তখন রবীন্দ্রনাথের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীর সমস্ত খ্যাত ভারতীয়দের মধ্যে ড. নারলার বিচারে এম. এন রায় হচ্ছেন একমাত্র আপোসহীন বস্তুবাদী এবং যুক্তিবাদী। ভারতীয় চিন্তা ও সংস্কৃতি তাঁর নখদর্পণে না হলেও তাঁর পশ্চিমী দর্শন বিশেষত বস্তুবাদী দর্শনে গভীর প্রজ্ঞা ছিল। এবং তিনি সঠিকভাবেই বলতেন (ধর্ম) বিশ্বাস অজ্ঞানতার জন্ম দেয়।

বক্তৃতা শেষাংশে তিনি বলেন— ইতিহাস থেকে আমরা কী শিক্ষা নিয়েছি ? কিছুই না। তাইতো এই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের যুগে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানে চেয়ে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে, গ্রহ-নক্ষত্রাদির পরিক্রমার চেয়ে হস্তরেখাবিদ্যায়, জ্যোতির্-পদার্থবিদ্যার চেয়ে বাবাদের ছাই-য়ে বেশি আগ্রহী। নারলা বলেন যে এ তাঁর অজানা নয় যে এ কথাগুলি বললেই ইউরোপ ও আমেরিকার সেইসব গোষ্ঠীগুলি, যারা ভারতের এইসব কার্যকলাপকে উৎসাহিত করছে, তাদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে।

মন সত্যিই দুর্বল কিন্তু আজ থেকে দশ হাজার বা তারও বেশি বছর আগের তুলনায় তো সবল। এবং গত পাঁচশো বছরে তা তো অভাবনীয় ক্ষমতায় বলীয়ান হয়েছে অতএব চোখ বন্ধ করে ধ্যান না করে চোখ খুলেই জগতের গতি ও তার নিয়ম অধ্যয়ন

করাই বাঞ্ছনীয়। মনে রাখা উচিত শুধু আত্মাকে অস্বীকার করলেই হবে না, যা গৌতমবুদ্ধ করেছিলেন, কর্মফল ও পুনর্জন্মবাদকেই অস্বীকার করতে হয়। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর মতো বলতে হবে— বেদান্ত চারটি অপ্রমাণিত আপ্তবাক্য দ্বারা আবদ্ধ দর্শন : ১. বৈদিক জ্ঞানের অভ্রান্ততা, ২. পরমার্থিক মুক্তি এবং বন্ধন, ৩. কর্মের অনুশাসন এবং ৪. পুনর্জন্ম।

ড. নারলা বলেন বেদান্ত চিরকালই কায়েমি স্বার্থের ক্ষমতাশালী বন্ধু এমন কি বৃটিশদেরও ভারতীয়দের ওপর প্রভুত্বে তা সাহায্য করেছে। এবং নারলা তাঁর এই অভিমতের সমর্থনে নিরঞ্জন ধরের লেখা 'বেদান্ত এবং বেঙ্গল রেনেশাঁস' বইটির থেকে উদ্ধৃতি দেন।

আগামী দিনে বেদান্তর সঙ্গে এবং বিভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শগুলির বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়েই 'ভারতীয় বুদ্ধিবাদের দীনতা' ঘুচে প্রকৃত বুদ্ধিবাদ সম্প্রসারিত হতে পারে এটাই ড নারলার বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমাদেরও সেই তেলেগু প্রবাদটি মনে রাখতে হবে— 'বেদান্তবাদীরা আসছে, ঘটি-বাটি-র ওপর নজর রাখো।' □

প্রভাস সেন

চিত্ত প্রসাদ, কিছু স্মৃতিচারণ

চিত্ত প্রসাদের বন্ধু শিল্পী প্রভাস সেন। সোমনাথ হোর-এর প্রথম দীক্ষাগুরু চিত্ত প্রসাদ। প্রভাস সেন এবং সোমনাথ হোর দুই বর্ষীয়ান শিল্পীর চোখে চিত্ত প্রসাদ মানুষটি কেমন ছিলেন, তাঁর শিল্পের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তির ক্ষেত্রই বা কোথায়— আমরা জানতে চেয়েছিলাম।

শিল্পী চিত্তপ্রসাদকে যখন আমি প্রথম দেখি আমার হঠাৎ নন্দলাল বসুর সুপ্রসিদ্ধ বিশ্রামরত অর্জুনের রেখাচিত্রটি মনে পড়েছিল। শক্ত, ঋজু, উজ্জ্বল চেহারা। নাক, চোখ মুখ যেন কুঁদে তৈরি। প্রতিভায় উজ্জ্বল অনমনীয় ব্যক্তিত্বের আধার। মেদহীন পেশল ছিপছিপে শরীরে চওড়া বুক আর সরু কোমর। চলাফেরা, নড়াচড়ায় বন্য সৌষ্ঠব। একশতটি আকর্ষক ব্যক্তিত্বের মানুষের ভিতর প্রথম চোখে পড়বার মতো লোক।

চিত্ত প্রসাদ ছিলেন দৃঢ় আদর্শের মানুষ। তাঁর নিজস্ব আদর্শ ও জীবন দর্শনে একনিষ্ঠ থাকবার জন্য সারা জীবন কৃচ্ছ্রসাধন করতে বা একদা প্রিয় বন্ধু বা সহকর্মীদের পরিত্যাগ করতে তিনি পশ্চাৎপদ হননি। শিল্পচর্চায় তিনি ছিলেন একলব্যের মতো। শিল্পী নন্দলালের কাছে শিক্ষা লাভে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অন্য কারো কাছে তিনি শিল্পশিক্ষা লাভের জন্য যাননি। আমাকে বলেছিলেন যে নন্দলালের শিল্পশৈলীর বোধ ও সাম্যবাদী আন্দোলনের আদর্শকে নির্ভর করে তিনি তাঁর নিজস্ব শিল্পশৈলী গড়ে নিতে পেরেছিলেন এবং ১৯৪৩/৪৪ সালে যশস্বী ও প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসাবে নন্দলালের আশীর্বাদ ও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

যতদূর জানি চট্টগ্রামের ছাত্র আন্দোলনের পোস্টার আঁকা ও হাতে লেখা পত্রিকায় ছবি ইত্যাদির সূত্রে তিনি চারের দশকের পূর্বেই চট্টগ্রামের স্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমে তৎকালীন অবিভক্ত সি. পি. আই.-এর সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশির আগ্রহে আই. পি. টি-এ আন্দোলনে যোগ দেন। এবং অল্প ক-বছরের মধ্যেই ভারতীয় কম্যুনিস্ট আন্দোলনের শৈল্পিক অভিব্যক্তির প্রধান শিল্পী হিসাবে খ্যাত হন। ক্রমে প্রখ্যাত শিল্পী সোমনাথ হোর ও বহুমুখী যশস্বী শিল্পী

খালেদ চৌধুরীও* সাম্যবাদী আন্দোলনের সূত্রে চিত্তপ্রসাদের সংসর্গে আসেন তাঁদের নবীন বয়সে। এবং যতদূর জানি এই দুই বহুজন শ্রদ্ধেয় শিল্পীর প্রথম সামান্য কিছু আনুষ্ঠানিক শিল্প প্রশিক্ষণ চিত্ত প্রসাদের কাছেই হয়েছিল। সোমনাথ হোর মশাই অবশ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ হবার পরও বোধহয় শিল্পের গ্রাফিক আর্টের টেক্‌নিকাল দিকগুলি ভাল করে বোঝবার জন্য কলকাতা আর্ট স্কুলেও কিছুদিন পাঠ নিয়েছিলেন। ঠিক মনে নেই, আমার সঙ্গে শিল্পী চিত্ত প্রসাদের পরিচয় ১৯৪৫ বা ৪৬ সালে। যতদূর মনে পড়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত আলোক চিত্র শিল্পী সুনীল জানা। বোম্বাই শহরে। চিত্ত প্রসাদও তখন ভারত বিখ্যাত শিল্পী। কম্যুনিস্ট পত্র-পত্রিকায় সর্বদা প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর জোরালো হাতের সাদা-কালো ড্রইং, লিনোকাট্‌ কার্টুন। ড্রইং-এর বলিষ্ঠতায় আর তার ভিতর দিয়ে দেশের নানা বর্গের মানুষ জন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজস্ব প্রত্যয়ে, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, অত্যাচারিত মানুষের প্রতি ড্রইং বা লিনোকাটের লাইনে লাইনে ভালবাসার অভিব্যক্তিতে তাঁর শিল্পকর্ম তখন এক আশ্চর্য জগতের সৃষ্টি করে চলেছে। সারা ভারতের শুধু সাম্যবাদীরাই নয় অন্য বুদ্ধিজীবীরাও চিত্ত প্রসাদের শিল্পকর্মের সাগ্রহ প্রতীক্ষা করতেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ।

চিত্ত প্রসাদ গ্রাম-ভারতকে বিশেষ ভালবেসেছিলেন এবং গ্রামের শিশু ও মা, কর্মঠ কৃষক, ভূমিহীন চাষী শ্রমিকদের জীবনের সংগ্রাম তিনি তাঁর শিল্প মাধ্যমে মমতা-মাখা যত্নে ও ক্রোধে প্রকাশ করেছেন।

দেশের নানা অংশে কৃষক সম্মেলনগুলিতে সে-সময় কৃষকেরা তাঁদের সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের মতোই চিত্ত প্রসাদকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করে থাকতেন। একবার মহারাষ্ট্রের কোথায় এক কৃষক সম্মেলনে ছবি আঁকতে গিয়ে শিল্পী তাঁদের হাতে আটক হয়ে গেলেন। প্রায় মাস দুয়েক ধরে গ্রামের পর গ্রামের দরিদ্র কৃষকেরা তাঁকে ভালবাসার বন্ধনে বেঁধে সমস্ত দক্ষিণ-পশ্চিম মহারাষ্ট্র ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের যখন পরিচয় হয়, তিনি থাকতেন বোম্বাইয়ের উপনগরী আন্ধেরীতে। স্টেশন থেকে ৮/১০ মিনিটের হাঁটা পথের শেষে সেকালের খোলামেলা পরিবেশে বড় হাতাওয়ালা একটি পুরনো একতলা বাড়ির একটি ঘরে। শুনেছি বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পশ্চিম ভারতের এক জঙ্গী নায়ক পৃথিসিং বাড়িটির মালিক বা ভাড়াটে ছিলেন।

---

*খালেদ চৌধুরীকে আমরা চিত্ত প্রসাদ সম্পর্কে লিখতে অনুরোধ করেছিলাম। শেষাবধি তাঁর লেখা পাইনি। সাক্ষাৎকার দিতে চেয়েছিলেন। —সম্পাদক।

চিত্তকে তিনি ভালবাসতেন এবং ঐ ঘরটি তাঁকে স্বল্প ভাড়ায় থাকতে দিয়ে ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে চিত্ত প্রসাদকে তাঁর বোন কলকাতায় নিয়ে আসবার আগে পর্যন্ত তিনি ঐ বাড়িতেই ছিলেন।

১৯৪৮ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কলকাতা কংগ্রেসে ভারতের কম্যুনিস্ট আন্দোলনে ভাঙনের সূত্রপাত হয়। পি. সি. যোশি পার্টি সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়িত ও পার্টি থেকে সাস্‌পেন্ডেড হন। বোম্বাইতে বি. টি. রণদিভে কলকাতা কংগ্রেস সম্বন্ধে পার্টি সদস্যদের গোপন বৈঠকে রিপোর্টিং করেন। চিত্ত প্রসাদ রিপোর্টটি মেনে নিতে পারলেন না এবং নিজেকে পার্টির কাজ থেকে সরিয়ে নিলেন এবং পার্টির কাছ থেকে ভাতা নেওয়াও বন্ধ করলেন। পার্টির ভাতা দিয়ে দুবেলা ডাল আর রুটি খাওয়া চলত তার বেশি নয়। বোধহয় চল্লিশ টাকা ভাতা পেতেন (তা থেকেও ১০ টাকা বাড়ি ভাড়া বাদ)। এই টাকায় এর বেশি খাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন সেটি বন্ধ হল। শুরু হল উপবাসের পালা যা জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবন যাত্রায় সঙ্গী ছিল মোটামুটি। চিত্ত প্রসাদের মতো প্রতিভাবান শিল্পীর জীবনসঙ্গী উপবাস কেন হবে সে প্রশ্ন স্বভাবতই মনে আসে। প্রশ্নটির উত্তর আছে তাঁর অত্যন্ত কঠোর জীবনদর্শনের ভিতর।

১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সংশ্রব ত্যাগের পর তাঁর কৃচ্ছ্রসাধনের সংবাদ জানতে পেরে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের ভিতর ও বাইরের তাঁর বহু গুণগ্রাহী তাঁর প্রতি নানা ধরনের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন! কিন্তু সে সব সাহায্যের প্রস্তাব তিনি প্রায় সমস্তই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ কোনও বিজ্ঞাপন সংস্থার কাজে মন্দকেও ভাল চিত্রিত করতে হয়। যে পার্টি ছেড়ে এসেছেন তার কর্মকর্তা বা সদস্যদের সুপারিশে আসা কোনও কাজ গ্রহণ করা নীতিবিগর্হিত মনে হয়েছিল। পয়সাওয়ালা লোকদের কাছে ছবি বিক্রি করাও অসহনীয় ছিল। বই-এর কভার ও ইলাস্ট্রেশন করবার চেষ্টা করতেন কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রকাশকেরা শিল্পীদের কম পয়সায় কাজ করাতে চেষ্টা করছে দেখতেন বা দেখতেন যে তাঁকে খাতির করে তাঁদের কর্মরত শিল্পীকে না দিয়ে কোনও প্রকাশক কাজটি তাঁকে দিতে চেষ্টা করছেন। একসময় তিনি বইয়ের কভার বা ইলাস্ট্রেশন করছেন জেনে একবার পোল্যান্ড বা চেকোশ্লোভাকিয়ার (ঠিক মনে নেই) এক প্রকাশন সংস্থা তাঁকে দিয়ে ২/৩টি বাংলা বই-এর ওদেশী অনুবাদের জন্য মলাট ও ভিতরের ছবি করিয়ে নেন। চিত্ত প্রসাদ সেগুলি করে তাঁদের দূতাবাস মারফৎ বিল সহ পাঠিয়ে দিলেন। যখন সে দেশ থেকে 'চেক্' এলো সেটি দেখে চিত্ত প্রসাদ মহা খাপ্পা! তিনি যা বিল করেছেন

তা থেকে বোধহয় দশগুণ বেশি টাকার চেক এসেছিল। চিত্ত প্রসাদ চেক ফেরত দিয়ে তাঁদের লিখলেন তিনি যে বিল করেছিলেন তার চাইতে বেশি টাকা পাঠিয়ে তাঁকে অপমান করা হয়েছে। তাঁরা ফিরে লিখলেন যে, তাঁরা তাঁদের দেশে ঐ কাজের যে অর্থমূল্য দিতেন তাই মাত্র শিল্পীকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি যেন অনুগ্রহ করে এটি গ্রহণ করেন না হলে তাঁরা সে দেশের সমাজের চোখে শিল্পীর শোষণকারী হিসাবে চিহ্নিত হবেন। শেষ পর্যন্ত চিত্ত প্রসাদকৃত বিলের টাকা মাত্র দিয়ে তাঁরা ছবিগুলি ফেরত দেওয়া থেকে রেহাই পান।

এই ঘটনার ভিতর দিয়ে দেশটির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের বেশ পরিচয় হয় এবং ঐ দেশের দু তিন জন শিল্পী ও সমালোচক এসে তাঁর শিল্পকর্ম দেখে মুগ্ধ হন। যতদূর জানি এঁরা চিত্ত প্রসাদের কিছু ড্রইং ও লিনো ছাপাই চিত্র ও-দেশে নিয়ে গিয়ে অনেকগুলি শহরে প্রদর্শনী করেন। সেসময় কয়েকটি সংগ্রহশালা তাঁর বেশ কিছু কাজ কিনেছিলেন এবং ও-দেশের শিল্পী সংঘ তাঁর কিছু ছবির একটি অ্যালবাম বার করেন। তাঁরা কিছু সংখ্যায় সেগুলি শিল্পীকে পাঠান এবং তাঁকে ওদেশে শিল্পী সংঘের অতিথি হিসাবে অন্তত বছর খানেক, অথবা ইচ্ছা করলে যতদিন খুশি থেকে যাবার জন্য সরকার মারফৎ নিমন্ত্রণ করেন। অ্যালবামটি চিত্ত প্রসাদ নামমাত্র মূল্যে তাঁর বন্ধু-বান্ধব মহলে বিক্রি করেন এবং আমাকে কলকাতায় একটি চিঠি লিখে ঐ নিমন্ত্রণ পেয়ে খুশি হয়েছেন জানিয়ে বলেন যে যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পাশপোর্ট ইত্যাদির জন্য তিনি কলকাতায় আসছেন তাতে আমাদের কিছু সাহায্যের দরকার হবে এসব ব্যবস্থার জন্য। আমি স্বাগত জানিয়ে টেলিগ্রাম করি এবং বন্ধু সুনীল জানা তাঁর স্টুডিওতে চিত্তর থাকবার ব্যবস্থা করেন।

এরপর যা হল তা থেকে মানুষ চিত্ত প্রসাদকে বুঝতে আরও সাহায্য করবে।

চিত্ত প্রসাদ কলকাতায় এলেন এবং বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহীদের চেষ্টায় অনতিবিলম্বে অর্থাৎ মাসখানেকের ভিতর তাঁর পাশপোর্ট হয়ে গেল— সেই দেশটির দূতাবাস থেকে লোক এসে ভিসা ইত্যাদি ওদিকের যা করণীয় সব করেছিলেন। সে দেশের শিল্প আকাদামি থেকে চিঠি এল— তাঁরা জানতে চেয়েছেন শিল্পী কবে রওনা হতে চান— তাঁরা সেভাবে তাঁর সমস্ত ব্যবস্থা করবেন। দিল্লী দূতাবাসে একটি ফোন করলেই তাঁরা টিকিট পাঠিয়ে দেবেন।

এবারে শুরু হলো মুস্কিলের। আমরা চিত্তর অনুরাগীরা যখন তাঁর

বিদেশ যাত্রার অনারে একটি সম্বর্ধনার আয়োজন করতে ব্যস্ত— হঠাৎ আমি সুনীলের ফোন পেলাম— 'চিত্ত দুদিন ধরে খুব কিছু ভাবছিল,— আজ সকালে বলছে ও যাবে না— এখন বসে ওর হবু হোস্টদের চিঠি লিখছে। একবার এসো।' সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম সুনীলের স্টুডিওতে। আমায় দেখেই চিত্ত একগাল হেসে আমাকে সম্বর্ধনা জানাল,— 'এসো ভাই, একটু সেলিব্রেট করা যাক, খুব বেঁচে গেছি। দারুণ ভুল করতে যাচ্ছিলাম। ভাগ্যিস পরশুদিন হঠাৎ খেয়াল হলো।' বললাম— 'ব্যাপার কী? সুনীল কোথায়?'— 'সুনীল খুব রাগটাগ করে ডার্করুমে ঢুকে বসে আছে'— বলেই অট্টহাসি।— 'আর ব্যাপারটা হলো আমি যাচ্ছি না।' তারপর সে যা বলল তার মোদ্দা কথা হলো এই যে সে কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছে মার্কসবাদে বিশ্বাস হারিয়ে নয়। সারা দুনিয়ায় কম্যুনিস্ট আন্দোলন যে চেহারা নিয়েছে সে আর তাতে বিশ্বাস করে না। এ অবিশ্বাস যে সব দেশে কম্যুনিস্ট সরকার আছে তাদের সম্পর্কে বেশি করে সত্য। যে দেশে তাঁকে আমন্ত্রণ করছে সে দেশের রাষ্ট্রশক্তি কম্যুনিস্ট এবং সেখানে শিল্পীর নিজের এই বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে না। এমন কি তাঁকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেও হয় তাঁকে চুপ করে থাকতে হবে নয়ত ভাল ভাল কথা বলতে হবে। এটার অর্থ হলো নিজের সত্তা বিসর্জন দেওয়া। সুতরাং তিনি চিঠি লিখে ওদের জানিয়েছেন যে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছেন এবং কম্যুনিস্ট দেশগুলির সরকার সম্বন্ধে তাঁর কোনও শ্রদ্ধা বা আস্থা নেই। ওখানে কোন কিছু অন্যায় বা অব্যবস্থা দেখলে তার সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হবে। কিন্তু যেহেতু তিনি অতিথি হিসাবে সে দেশে যাবেন— এ রকম কিছু করা অভদ্রতা হবে। সুতরাং নিজের সত্তা রক্ষার জন্য না যাওয়া স্থির করলেন।

কিছুদিনের ভেতরই মত পরিবর্তন করবার অনুরোধ সহ পত্র এল। তাঁরা বললেন যে তাঁদের সরকারের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। চিত্ত প্রসাদ ওদেশে গেলে তাঁর সর্ববিষয়ে সমালোচনা করবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। সুতরাং তিনি যেন কোনও সংকোচ না করে চলে আসেন। তিনি কম্যুনিস্ট পার্টি ত্যাগ করেছেন তাও তাঁরা জানেন। এর পর চিত্ত প্রসাদের দ্বিতীয় ও শেষ পত্র যাতে শিল্পী তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে জানালেন যে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়ে নিমন্ত্রণকর্তার নিন্দা বা সমালোচনা করা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। তিনি একজন ভারতীয়। সুতরাং তাঁর পক্ষে সমালোচনার স্বাধীনতা নিয়েও যাওয়া সম্ভব নয়।

জীবনের শেষ দশ পনেরো বৎসর ছবি আঁকার সঙ্গে কবিতা লিখেছেন।

আর অপূর্ব সব পুতুল নাচের পুতুল (স্ট্রিং পাপেট) তৈরি করেছেন। এবং তাদের নিয়ে অনবদ্য সব ছোট ছোট গল্প বেঁধেছেন। একদল ছেলেমেয়েও ছুটে গিয়েছিল যারা তাঁর কাছে পুতুলগুলি খেলানো শিখে নিয়েছিল এবং চমৎকার একটি পুতুল নাচের দলও গড়ে উঠছিল। চিত্ত প্রসাদ এই সময় বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দলটি ঠিকমতো গড়ে উঠতে পারল না আর আমরা— চিত্ত প্রসাদের প্রতিভার আর একটি দিকের পূর্ণ বিকাশের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত হলাম।

অসুস্থ অবস্থাতেই চিত্ত প্রসাদ রামায়ণ মহাভারতের গল্প নিজের মতো করে একপৃষ্ঠায় ক্যালিগ্রাফিক কলমে লিখন এবং সামনের পৃষ্ঠায় তার চিত্রীকরণের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তা শেষ করে যেতে পারেননি।

আমি তার কয়েকটি পৃষ্ঠা দেখেছিলাম এবং ছবি ও লেখার অসাধারণ শিল্প গুণে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

এই ছবি ও লেখাগুলি চিত্ত প্রসাদের ভগ্নী শ্রীমতী গৌরীর কাছে আছে কিনা জানি না। যদি এই মহাকাব্য দুটির যে কোনও একটির কয়েকটি কাণ্ড শিল্পী শেষ করে গিয়ে থাকেন তবে সেগুলির একটি প্রদর্শন করতে পারলে শিল্পীর ঐ কাজগুলি রসিক জনেরা দেখতে পারতেন। □

সোমনাথ হোর

চিত্ত প্রসাদ

চিত্ত প্রসাদ অতি সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘদেহী বৃষস্কন্ধ উন্নত নাসা এবং পদ্মপলাশলোচন। এগুলি দৃশ্য ছিল; যা দেখতে পেতাম না কিন্তু অনুভব করতাম— সেটা তাঁর মহান হৃদয়। তাঁর ক্রোধ ছিল, অসহিষ্ণুতা ছিল; কিন্তু পাত্রভেদে ভালবাসা যেন উপচে পড়ত। আমি তাঁর কাছ থেকে শুধু ভালবাসাই পেয়েছি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুব বেশি কিছু জানতাম না। শুনেছিলাম— মেদিনীপুর জেলায় তাঁর জন্ম। চট্টগ্রামে কবে কেন এলেন, জানা নেই। কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার আগে তিনি নাকি কিছুটা বাউণ্ডুলে ছিলেন। আঁকা এবং গানবাজনা নিয়ে থাকতেন। চট্টগ্রামের প্রখ্যাত এবং প্রয়াত কম্যুনিস্ট নেতা পূর্ণেন্দু দস্তিদার তাঁর সন্ধান পান এবং তাঁকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ করে তৎকালীন সাম্যবাদী আন্দোলনে সামিল করেন। কিছুদিনের মধ্যেই পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি. সি. যোশি তাঁর অঙ্কন পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বম্বেতে পার্টির সদর দফতরে নিয়ে যান।

আমার সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখন তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তরের অসহায় শিকার অজস্র নরনারীর ছবি এঁকে চলেছেন এবং সেগুলি সাম্যবাদী মুখপাত্র Peoples War এবং জনযুদ্ধে অনবরত ছাপা হচ্ছে। সুনীল জানার আলোকচিত্র এবং চিত্ত প্রসাদের রেখাংকন ভারতের বুদ্ধিজীবী মহলকে তখন সচকিত করে তুলেছিল। এমন মর্মস্পর্শী রেখাচিত্র পেশাদার শিল্পীদেরও বিচলিত করেছিল। আমরা জয়নুল আবেদীনের অবিস্মরণীয় চিত্রগুলির কথা জানি। প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরা যেমন অতুল বসু, গোবর্ধন আশ, সুধীর খাস্তগীর এবং আরও অনেকে মন্বন্তরের উপরে ছবি করেছেন। চিত্ত প্রসাদের কাজ তাঁদের হয়ত সরাসরি প্রভাবান্বিত করেনি, কিন্তু তাঁর ছবিগুলি শিল্পী-দের সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে যেন সতর্কবাণী হিসাবে কাজ করেছিল।

তিনি আমার প্রথম দীক্ষাগুরু। প্রায় হাতে ধরে ক্ষুধিত পীড়িত মুমূর্ষুদের অবয়ব আঁকায় উৎসাহ জুগিয়েছেন। যখনই চট্টগ্রামে যেতেন, আমি তাঁর অবিরাম সঙ্গ পেতাম। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ও'র সঙ্গে ঘোরাঘুরি

করতাম। রাত্রে লণ্ঠনের আলোয় বসে দেখতাম সারাদিনে করা পেন্সিলে আঁকা স্কেচগুলিকে অবলীলায় চাইনীজ ইংকের কালি তুলি দিয়ে ভরাট করে তুলেছেন। মনে পড়ে, তিনি বলছেন— "সোমনাথ, এই যে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটি, কী বড় বড় চোখ, কত চুল, কত দিন খেতে পায়নি, চোখগুলি কী রকম জ্বলজ্বল করছিল, ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল, কণ্ঠা বুকের পাঁজরা, আহা-রে, বেরিয়ে আসতে চাইছে···" আমি শুনে যেতাম, হুঁ-হাঁ করতাম; বুঝতে পারতাম উনি নিজের সঙ্গে কথা বলছেন, সমগ্র দৃশ্য মনের চোখে দেখছেন এবং ছবিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছেন। একবার ভরা বর্ষায় কুতুবদিয়া কক্সবাজার চলে গেলেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের ছবি এঁকে আনতে। চট্টগ্রামের বর্ষা শুরু হয় ত, শেষ হয় না। প্রায় মাস খানেক বাদে ফিরলেন— অনেক ছবি এঁকে। কমিউনে বসে সেগুলি দেখিয়ে প্রত্যেকটির বর্ণনা দেন। সেই বর্ণনা শুনে এবং ছবি দেখে আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম। এই একমাস ধরে খাওয়া-দাওয়ার অনিয়মের দরুন শরীর বেশ খারাপ হয়েছিল; উনি সে সব গ্রাহ্যই করতেন না।

চিত্ত প্রসাদের ভুখা বাংলার ছবিগুলি বিশিষ্টতার দাবি রাখে। সুনীল জানার ফটোগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিল— চারপাশে কি নির্মম ঘটনা ঘটছে; এবং ঘটনাগুলি সত্য, প্রত্যক্ষ। চিত্ত প্রসাদের ছবিগুলি সেই সত্যে আরেক মাত্রা যোগ করে মানুষের হৃদয়কে তাদের অস্তিত্বকে মথিত করছিল। দুর্ভিক্ষপীড়িতের এমন জোরালো এবং ধারালো রূপণ আমরা কমই দেখেছি।

এ সময়ে চট্টগ্রামী ভাষায়— তিনি বেশ কিছু গান রচনা করেন— যা খোদ চাঁটগেঁয়েরাও অত জোরালোভাবে লিখতে পারেননি। শহরে গ্রামে বিভিন্ন জনসভায় পার্টি কর্মীরা সে সব গান যখন করতেন— শ্রোতারা কখনও চোখের জলে ভাসতেন, কখনও সুরে সুর মিলিয়ে সংগ্রামের আওয়াজ তুলতেন, আবার কখনও কালোবাজারী সমাজবিরোধীদের উদ্দেশ্যে ধিক্কার জানাতেন,

'শুনরে ওগো দেশবাসী, শুন যত নারী
বহু দুঃখের শেষে আজুয়া জীবন যার গৈ ছাড়ি···'

'চাটিগাঁইয়া হাজার হাজার আঁরা হিন্দু মোছলমান
ঢেউয়র মাথাৎ সাম্পান চালাই, সিনা দি ঠেকাই ঝড়তুফান···'

'পেট মোটা সব ইঁদুর হিয়াল গাতথুনে ডাকে,
কঅজর বোঁদা লারের তারা, গরম দাম-অ হাঁকে···' ইত্যাদি।

১৯৪৮-৪৯ সালে পার্টির সংকীর্ণতাবাদী নীতি গ্রহণের সময় পি সি যোশি সম্পাদক পদ থেকে অপসারিত হন। এতে চিত্তপ্রসাদ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং ক্রমশঃ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসতে থাকেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে যাঁরা যোশির ব্যক্তিগত উদ্যোগে পার্টিতে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই পরবর্তীকালে অল্পবিস্তর ক্ষোভ এবং অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়েছেন কিন্তু সাম্যবাদের প্রতি অবিচল বিশ্বস্ততার কারণে পার্টি সংগঠনের বিরুদ্ধতা করতে পারেননি। চিত্তপ্রসাদ এই পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারেননি। পরে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের হস্তক্ষেপের ফলে পার্টির অভ্যন্তরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। চিত্তপ্রসাদ এই সময়ে আরও দৃঢ়ভাবে যোশির রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর জোরালো সমর্থক হয়ে ওঠেন। কিন্তু ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায় এবং রাজনীতির জটিল উপসর্গগুলি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল না-থাকার ফলে ধীরে ধীরে রাজনীতি থেকে সরে আসেন।

পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে মাঝে মাঝে কলকাতায় ওঁর সঙ্গে দেখা হত। খালেদ চৌধুরী এবং প্রভাস সেনের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে উঠতেন, রেবা এবং আমি কলকাতায় এসেছেন জানতে পেলেই ওঁর সঙ্গে দেখা করতাম। একদিন দেখি নিউ মার্কেট থেকে একটি মস্ত বড় গ্লাডিয়োলি ফুলের তোড়া নিয়ে ঢুকে বললেন— "ছবি আঁকব ; আজ ৩০০৲ টাকায় একটি ছবি বিক্রি হয়েছে। সবটা দিয়ে এই তোড়া এবং তেল রঙ, তুলি কিনে নিয়ে এলাম।" সব টাকা পেয়েই ওরকম হাতেনাতে খরচ করা আমরা ভাবতেই পারতাম না। ঐ সময়ে ঐ বাড়িতে বেশ কিছু তেলরঙে কাজ করছিলেন। যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ এসব থেকে সরে এসে কিছু ঐতিহাসিক, কিছু লোকায়ত জীবনের ছবি করেছিলেন মনে পড়ে। যখনই নূতন কিছু করতেন, বম্বে থেকে চিঠি লিখে জানাতেন। মাঝে মাঝে লিনোকাট ছেপেও পাঠাতেন ; Tissue paper-এ ছাপা হত বলে— এগুলি সময়ের ব্যবধানে নষ্ট হয়ে যেত। বম্বের নীচুতলার বাসিন্দাদের যেমন, মৎস্যজীবী, সব্জিওয়ালা, কিশোর-কিশোরী, মজুর মজুরানী— এদের নিয়ে অনেক ছবি করেছেন। একবার ওঁর নির্দেশে এ রকম এক সেট ছবি নিয়ে শান্তিনিকেতনে নন্দলাল বসু মশায়কে দেখিয়েছিলাম। উনি ছবি দেখে খুশি হয়ে চিত্তপ্রসাদকে নিজে লিখে জানান। তাতে চিত্তদা উচ্ছ্বসিত আবেগে আমাকে একখানি চিঠি লেখেন, যা সৌভাগ্যক্রমে এখনও প্রায় অক্ষত আছে*। এসময়ে আরও অনেক অনেক ছবি করেন— যা দেশে বিদেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি আন্দোলনের উপরও অনেক ছবি করেছেন। ১৯৬০ সালের গোড়া

* পরিশিষ্ট অংশে চিঠিটি ছাপা হয়েছে।

থেকে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। সম্ভবত এ সময়ে চিত্ত প্রসাদ পুতুল নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। শুনেছি এগুলি অসাধারণ সৃষ্টি। নিজের সন্তানের মতো এগুলি লালন করতেন। এ সময়ে তাঁর খুব অনটন। তথাপি কেউ যদি ভালবেসেও সাহায্যের হাত বাড়াতেন, করুণা ভেবে তাঁদের হাঁকিয়ে দিয়ে বন্ধু বিচ্ছেদের পথ নিতেন। আবার এও সত্যি, কেউ কেউ তাঁর দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে তাঁকে নানাভাবে প্রবঞ্চনা করেছেন।

আন্ধেরীর (বম্বে) এক জনবহুল শ্রমিক এলাকায় একটি ঘর নিয়ে থাকতেন শুনেছি। এ সময়ে সুরা তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়। আমি তাঁকে কখনও সুরাপান করতে দেখিনি। কোনো নারী যদি তাঁকে ভালবেসে থাকেন, আমি বলব তিনি উপযুক্ত কাজই করেছেন। অত বিশাল হৃদয় সুন্দর লোকটিকে ভাল না বেসে পারা যায় না। কিন্তু তার জ্বালাও ত কম নয়। মৃত্যু অবধি একটি দীর্ঘ সময় এই যন্ত্রণা তাঁকে দিল যত, নিলও তত। মহৎ শিল্পীর জীবনে দেয়া নেয়ার এই টানা পোড়েন অনিন্দনীয়।

শান্তিনিকেতন
২০. ৮. ১৯৯১

গৌরী ভট্টাচার্য

নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক

হাইকোর্টের সিল করা তালা দেওয়া ছিল ৮নং চন্ডী ঘোষ রোডের ফ্ল্যাটে। বম্বে থেকে দাদাকে নিয়ে এসেছিলাম সদ্য ভাঙা-পা অপারেশনের পর। ভেতরে স্টিল প্লেট লাগানো, হাঁটাচলা করতে যতদিন সময় লাগে আমার বাসায় থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গের জোলো আবহাওয়া দাদার সহ্য হল না। ক্রনিক ইউসোনোফেলিয়া, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা ইত্যাদি নানারকম আনুষঙ্গিক রোগের দ্রুত বৃদ্ধি হতে লাগল। খুব জিদ ছিল। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা চলতে লাগল। এতে শেষকালে মাত্র ২ মাসের মধ্যে দাদা একেবারে দারুণ রকম কাহিল হয়ে পড়ল। হাঁপের টান উঠলে, সারাদিনরাত বালিস নিয়ে বসে থাকত। বহু অনুনয় বিনয় করে কোনমতে রাজি করানো হল অ্যালোপাথি চিকিৎসার। ডাক্তার কামাক্ষ্যা মুখার্জি এই তল্লাটের খুব নাম করা ডাক্তার। বয়স্ক ডাক্তার, অভিজ্ঞ। তাঁর চিকিৎসায় খুব তাড়াতাড়ি ভাল করে তুললেন দাদাকে। ফিজিও-থেরাপিস্ট ঠিক করা হল। বাড়িতে রোজ সন্ধ্যাবেলায় দু ঘণ্টা ধরে দাদার পায়ে মাসাজ হত। একটু একটু করে দাদা আবার নিজের পায়ে দাঁড়াল। এক পা এক পা করে ঘরের একধার থেকে দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে গেল, এল। সন্ধে হলেই বাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে যেত। দাদার পা এবার সেরে যাবে, স্বাভাবিক চলাফেরা করবে। টালিগঞ্জের ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্যে হুইল চেয়ার কিনতে দিল না, বলল আর ২/১ মাসে পা ঠিক হয়ে যাবে। রোজ সন্ধেবেলা ডাক্তার চলে যাবার পর দাদার গল্পের আসর বসত। আজ আপশোস হয়, তখন যদি ওর সব কথা টেপ করে রাখতাম। এখানে থাকাকালীন একটা ফটোও তুলিনি, সব কদিন পরে হবে এই আশায় স্থগিত ছিল। এই আনন্দের আসরে হঠাৎ আমার বড়বোন, তার স্বামী ও ছেলের আসা যাওয়া শুরু হল। তাঁরা খুব ধনীলোক। আমার সামান্য ঘরে দাদার থাকা নিয়ে তাঁদের প্রচন্ড আপত্তি উঠল "এসব ঘরে গোরু ছাগল থাকে", তুমি আমাদের ওখানে চল। দাদার উত্তর হল— "আমি গরু ছাগলের দাদা—, গরু ছাগলের সঙ্গেই থাকবো।" বড়লোক জামাইবাবু— তাঁর ইচ্ছে নামকরা বড় বড় ডাক্তার ডাকা হোক, নানান্ তর্কাতর্কি চলতে থাকল ক'দিন ধরে। দাদা যেন থকে পড়ত। শেষপর্যন্ত ডাঃ কামাক্ষ্যা মুখার্জী বাতিল হয়ে গেলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে কোন বড় ডাক্তার কিন্তু দাদার চিকিৎসার জন্যে এলো না। জামাইবাবুদের বাড়ির হাউস ফিজিশিয়ান একজন ছোকরা ডাক্তার তিন দিনে দাদার শরীর ভাল করে দেবার দায়িত্ব নিয়ে দাদার চিকিৎসা করতে এলেন, রক্ত ইত্যাদি সব দুবার করে পরীক্ষা হল, সত্যিই তিনদিনে এমন অবস্থা হল দাদার, এমন বেড়ে গেল নিঃশ্বাসের কষ্ট, যে সেই ছোকরা ডাক্তার সুলেমান তাড়াতাড়ি, পি জি-তে ভর্তি করার ব্যবস্থা করতে উপদেশ দিয়ে কেটে পড়লেন। ততক্ষণে দাদার খাওয়া দাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। পা দুটো

ভীষণভাবে ফুলে গেল, নিঃশ্বাসের কষ্টে অস্থির হয়ে ছটফট করতে লাগল। অথৈ জলে পড়লাম আমি। কাছাকাছি রামকৃষ্ণ সেবাসদনের ইমার্জেন্সীতে ভর্তি করা হল। সাতদিন ধরে যমে মানুষে টানাটানি চলল। ক্রমশ অবস্থার আরো অবনতি হল। কিছুতেই কিছু হল না। ১৩ নভেম্বর ভোররাতে দাদা আমায় ছেড়ে চলে গেল, আমার চোখের সামনে অত বড় একটা প্রতিভার জীবনদীপ নিভে গেল।

এরপরেও একলা দাঁড়িয়ে ৮নং চণ্ডী ঘোষের বাড়ি, আন্ধেরীর বাড়ির মতো করে দাদার সব জিনিসপত্র, ছবি কাঠপুতলি লেখা বই দিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলাম। দেশ বিদেশের অনেকজন ওই বাড়িতে এসে নীরবে চোখের জল ফেলে গেছেন শোকাপ্লুত অবস্থায় অসীম শ্রদ্ধা জানিয়ে গেছেন দাদার স্মৃতির উদ্দেশে। আমায় বুকভরা সমবেদনা জানিয়ে গেছেন। স্মৃতি সভা হয়েছে প্রথম যোগেশ মাইম একাডেমিতে। দাদার সব কিছুর সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব সম্মিলিতভাবে আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। দ্বিতীয়বার দাদার ছবির প্রদর্শনী হয়েছে কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে। এই প্রদর্শনী চলাকালেই ১৯৮০ সালে হঠাৎ মামলার সূত্রপাত করল আমার বড়বোন। দাদার ছবির দাবিতে পার্টিশানের মামলা। আমার কাছ থেকে সব ছবি, লেখা বইয়ের অধিকার কেড়ে নিয়ে ঐ চণ্ডী ঘোষ রোডের বাড়ি হাইকোর্ট থেকে সিল করে দেওয়া হল। যতদিন না মামলার নিষ্পত্তি হয়, দাদার সৃষ্টি ও বই লেখা ইত্যাদি বিষয়ে একটি আঙুল নাড়ার অধিকারও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হল।

সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে গেল, সব পরিকল্পনা উদ্যম ও উৎসাহ। দশবছর পরে নিষ্পত্তি হয়েছে মামলার। দাদার করে যাওয়া উইলের জয় হল। ৮নং চণ্ডী ঘোষের বাড়ির মালিক ইতিমধ্যে বাড়িছাড়ার মামলা দায়ের করেছিলেন আমার বিরুদ্ধে। মামলার নিষ্পত্তির খবর আমি জানতে পাবার আগেই তাঁরা আলিপুর কোর্টের বেলিফকে দিয়ে ঘরের তালা ভেঙে দাদার সব জিনিসপত্র বার করে দিলেন। ঘরে নিজেদের তালা দিয়ে দিলেন। সমস্ত জিনিসপত্র বই ছবি, দশবছর ওই একতলার ফ্ল্যাটের ঘরগুলিতে বন্ধ থাকায় শতকরা ৫০ ভাগ পোকামাকড় ইঁদুর ও ড্যাম্পের কারণে নষ্ট হয়ে গেছিল। তার ওপর যথেচ্ছ টানা-হেঁচড়া ও লণ্ডভণ্ড হয়ে তার বাকিটুকুও তছনছ হয়ে গেল। উদ্ধার করার মতো বিশেষ কিছু ছিল না তবু দৈবক্রমে যা কিছু গুছিয়ে নিয়ে নেতাজী নগরের আদর্শ পল্লীর একটি ঘরে তোলা হল তার মধ্যে দৈবক্রমে দাদার কিছু ছবি ও পাঁচ হাজার বইয়ের মধ্যে পোকাকাটা অবস্থায় হাজারখানেক বইয়ের হদিশ পাওয়া যায়।

এই ধ্বংস স্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে ভিজে দোমড়ানো মোচড়ানো একটি চামড়ার ব্যাগ। ঐ ব্যাগটি আমার বিশেষ পরিচিত। আমার মনে পড়ে গেল এই ব্যাগটি আর একটি জলের বোতল ছিল ১৯৩৯ সাল থেকে দাদার নিত্যসঙ্গী। এই ব্যাগটি কাঁধে ঝুলিয়ে আর এই এক বোতল জলের সংস্থান নিয়ে দাদা সারা ভারতের আনাচে কানাচে, গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। ব্যাগে থাকত দাদার ছবি আঁকার সরঞ্জাম, স্কেচ খাতা,

নোটবই আর সিগারেটের প্যাকেট। চট্টগ্রামের বন্যা ও দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রাম, বন, জঙ্গল, মিলিটারির অত্যাচারে শ্মশান হয়ে যাওয়া পল্লী ও তার নিঃস্ব অনাহার ক্লিষ্ট অধিবাসীদের ছবি আঁকতে আঁকতে সারা পূর্ববাংলা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে দাদা—তখনকার কত মানুষ দেখেছেন সেই দৃশ্য। মোটা খদ্দরের হলদে পাঞ্জাবি ও পায়জামা পরা চিত্ত প্রসাদের কাঁধে এই এক ব্যাগ। ধলঘাট রাঙামাটির কিষান মজদুর সভায় এসেছিলেন তিনি পি. সি. যোশি— তৎকালীন সর্বভারতীয় সি. পি. আই এর প্রধান নেতা। তিনিও চিত্ত প্রসাদের সেই মূর্তি দেখেছেন, হাজার হাজার পোস্টার এঁকে চলেছেন বলিষ্ঠ রেখায়। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শহর থেকে শহরে গণজাগরণের উত্তাল জোয়ার এনেছিলেন চিত্ত প্রসাদ ছবির ভাষার উদাত্ত আহ্বানে গণ সংগঠনের এই প্রথম হোতাকে দেখে, তার সত্যদৃষ্টি, ছবির বিষয় নির্বাচন, সাদাকালো তুলির টানে সেই সত্যের প্রচণ্ড প্রকাশ শক্তি ও ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছিলেন পি. সি. যোশি। জোর করে দাদাকে তিনি কলকাতার মূল অফিসে নিয়ে আসেন, দায়িত্ব দেন কলকাতায় আসন্ন পার্টি মহাসম্মেলনের মণ্ডপসজ্জার। সেখানেও এই ব্যাগ কাঁধে দাদা দিবারাত্রি পরিশ্রমে প্রায় চার হাজার পোস্টার দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর পি. সি. যোশির ডাকে দাদাকে যেতে হল বম্বে। প্রায় দুবছর পার্টির কাজে দাদাকে থাকতে হয়েছিল কলকাতায়। এখানে কাজ ছিল কিন্তু তার জন্যে ছিল না কোন আয়। প্রায় অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটত ১০নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের তিনতলার একটি খুপরি ঘরে। এ সময়ের দিনপঞ্জির ইতিবৃত্ত জানেন 'কথাশিল্পের' অবনী রায় মশাই*। এ সময় হঠাৎ দাদার আলাপ হয়েছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সঙ্গে। চাঁটগার আর্যসঙ্গীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রলাল দাসের সঙ্গে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল দাদার। তিনি তখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর মিউজিক ডিরেক্টর। তাঁর ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সুপারিশে দাদা কলকাতা বেতারে 'বেতারজগৎ' পত্রিকার অলংকরণের কাজ পান। বিখ্যাত .মহিষাসুরমর্দিনী অনুষ্ঠানের প্রথম প্রচার যখন হয়েছিল, সেই নিয়ে দাদার আঁকা 'মহিষাসুরমর্দিনীর' একটি ছবি 'বেতারজগৎ'-এ প্রকাশিত হয়। ছবিটি আজও অক্ষত আছে। তখনও দাদার সঙ্গে থাকত এই চিরপুরাতন ব্যাগটি।

এর পর ৪২ সালের মন্বন্তর। এই ভয়ানক সংবাদ বেতার মারফৎ তখন রোজই প্রচারিত হত। মেদিনীপুরের অবস্থা মায়ের চিঠিতে দাদা জানতে পারে। বাবা তখন রিটায়ার করেছেন। তাঁকে সিভিলসাপ্লাইয়ের চিফ ইন্সপেক্টর করে পুনর্নির্বাচিত ও বহাল করা হয়। আমাদের এবং মেদিনীপুর শহরের শতকরা পঞ্চাশটি পরিবারের তখন চরম দুর্দশা ও খাদ্যাভাব। গোপনে যারা খাদ্য বা চাল সংগ্রহ করতে পারত, তারা ছাড়া কারো সপ্তাহে দুবার ভাত জুটত না। মিলিটারির কল্যাণে গমের বস্তা

* অবনীবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। গৌরী দেবী সম্ভবত ঠিক জানেন না। অবনীবাবু জানান, 'চিত্ত প্রসাদকে আমি বোম্বাইয়ে কাছ থেকে অনেকদিন দেখেছি, মিলেছি'।

দেখেছিলাম সেই প্রথম আমরা। পরিবার পিছু সপ্তাহে দু সের করে গম দেওয়া হত। গ্রামের দিকে মানুষ আটার ব্যবহার জানত না, চালের মতো করে গমসেদ্ধ করে ওদের ভাতের অভাব পূর্ণ করতে আমিও দেখেছি। আমি তখন স্কুলের ছাত্রী। মনে আছে খাবার জন্যে বাজারে কোনো তরকারি পাওয়া যেত না। খালবিল শুকিয়ে যাওয়ায় মাছ পাওয়া যেত না। গবাদি পশু মরে যাওয়ায় দুধ খাইনি আমরা কতকাল। অ্যামেরিকান গুঁড়োদুধ টিনে করে স্কুলে আসত। ওই জলে গুলে দিত আমাদের। কেউ খেতে পারত না। মেদিনীপুরে আমরা যে বাড়িটায় থাকতাম তাতে একটা গভীর কুয়া ছিল। একেবারে যেন পাতালে চলে গেছিল জল। তাই টেনে-টেনে ছোড়দা আর মা বাড়িতে শাকপাতা রাঙালুর গাছ করেছিলেন। খুব পাথুরে আর কাঁকুরে মাটি। কিছু জন্মাত না আর। মনে আছে সজনে শাক, তেলাকুচো পাতা এসব দিয়ে একটা কিছু রান্না হত আর শুকনো রুটি। বাবা এ বিষয়ে একেবারে নির্বিকার ছিলেন। আসলে বাবা ছিলেন অত্যন্ত সাচ্চা ও সংপ্রকৃতির ব্রাহ্মণ। খুব ধর্মে বিশ্বাস ছিল। রোজ মহেন্দ্রক্ষণে উঠে গায়ত্রী জপ করতেন। শাদা উপবীতটিকে বাবা অনুশাসনের মতো মান্য করে চলতেন। নইলে সে সময় তিনি যে সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে কাজ করতেন, সামান্য অসাধুতার আশ্রয় নিলে অন্তত আমাদের খাওয়া পরার কোনো কষ্ট পেতে হত না। মেদিনীপুরের ওই বাড়িটি বাড়িওলা ঈশ্বরচন্দ্র পণ্ডিত মাত্র দুহাজার টাকায় বাবাকে বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন। সেদিন যদি বাড়িটি কিনে নিতেন তাহলে বাবার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়ি ছাড়া করার জন্যে ঈশ্বরবাবুর ছোট ছেলে প্রভাত, আমার মাকে অতর্কিতে মাথা ফাটিয়ে দিতে পারত না। কিম্বা মায়ের মৃত্যুর পর, ওবাড়িতে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে, সাজানো সংসার, সমস্ত জিনিসপত্র, জীবজন্তু মায় মায়ের ঠাকুর কুলদেবতা পর্যন্ত সমেত বাড়িটি বেআইনী ভাবে দখল করতে পারত না। ওই বাড়িতে দাদার অজস্র ছবি, বই-এর পাণ্ডুলিপি, মায়ের অজস্র কবিতা, বাবার দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত বইয়ের বিশাল সংগ্রহ, গানবাজনার বহু যন্ত্র ও মার্গসঙ্গীতের কয়েকশত বই পুরনো দিনের আসবাবপত্র এবং অজস্র স্মৃতিচিহ্ন ছিল। সেইসব সমেত বাড়িটি বে-দখল করে ১৯৭২ সালে। আমি তখন দাদাকে দেখতে বম্বে গিয়েছিলাম। বাড়ি আর উদ্ধার হয়নি কোনো জিনিসও নয়।

ওই বাড়িটিতে আমাদের বহু স্মৃতি বিজড়িত ঠিকানা ছিল জাজেস কোর্ট রোডে। আগেকার কত ঘটনা, কত স্মৃতি তো অহরহ মনে পড়ে। মনে পড়ে মন্বন্তরের ওই হাহাকারের দিনে একদিন সন্ধ্যার সময় বাইরের ঘরে বসে বাবা অফিসের কাগজপত্র দেখছিলেন। আমাদের কিছু কখনও বলতেন না কিন্তু অসাধু প্রস্তাব সে সময় বাবার কাছে অহরহ আসত যে তার প্রমাণ একদিন পাওয়া গেল। মেদিনীপুর জেলার জন্য যত খাদ্য ও বস্ত্র সাপ্লাই সরকার থেকে সদরে পাঠান হত সব কিছু বিতরণের প্রধান কর্তা ছিলেন বাবা। কাজেই বাবাকে প্রলোভন দেখিয়ে, ঘুষ দিয়ে তখনকার মেদিনীপুরের বড় বড় ব্যবসায়ীরা কিছু সুবিধের চেষ্টা সমানে চালিয়ে যাচ্ছিল। দাদার দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব

সম্পূর্ণত বাবার কাছ থেকেই পাওয়া। এই ব্যক্তিত্ব তাঁর ধবধবে পৈতেটির মতো মনের ভেতরটাকেও পরিচ্ছন্ন করে রাখত। সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে দুটি ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই করে, ঝুড়িঝুড়ি ফলমূল, খড়গপুর থেকে আনা সবজি, বারকোশের মতো ডালা ভরা মিষ্ট, ভাদুয়া ঘিয়ের টিন ও বড় বড় বাক্সতে কাপড় নিয়ে একজন মাড়োয়ারি বস্ত্র ব্যবসায়ী বাবার কাছে আসেন। প্রথমটা আমরা অর্থাৎ ছোড়দা, ছোড়দি ও আমি, বাবার গলায় ধমক আর চেঁচানো শুনে অবাক হয়ে গেছিলাম। বাবাকে কখনও এত রেগে যেতে দেখেনি কেউ। এ দিকে খুব ঠাণ্ডা মানুষ ছিলেন। বাবার কাছে বকা বা মারধোর আমরা কল্পনাই করতে পারি না। সেই মানুষকে ওরকম চেঁচামেচি করতে দেখে পর্দার ফাঁক দিয়ে আমিই প্রথম উঁকিঝুঁকি মেরে দেখি বাবার টেবিলে কত কত নোটের তাড়া। আমি খবরটা ছোড়দা ও ছোড়দিকে দিতে ওরাও পর্দার পেছনে এসে জড়ো হল। বাবা বলছিলেন, 'এখনি বেরিয়ে যাও নইলে আমি পুলিশে রিপোর্ট করব, ভেবেছ কি, দেশের লোকের জিনিস নিয়ে তুমি জোচ্চুরি করতে চাও, আমায় ঘুষ দিতে এসেছ রাতের অন্ধকারে? এক্ষুনি সব ওঠাও, সব লাথিয়ে ফেলে দেব।' তারপর খানিকটা ঠেলাঠেলি আর মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীর ভাঙা বাংলাতে অনুরোধ উপরোধ 'নেই, নেই, চারুবাবু, ঘুষ নেই আপনার ছেলেমেয়েদের জন্যে এনেছি। কিছু পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে, ওরা খাবে পরবে। চারুবাবু আপনি চটবেন না সেহি ভাবে আমি আপনি, আপনি শুধু হমার লাইসেন্সটা করিয়ে দিবেন, চারুবাবু, হামি আপনার দাস হয়ে থাকছি।...' বাবার পায়ে ধরতে যাচ্ছে। বাবা অমনি ওর ঘাড় ধরে এক ধাক্কাতে দরজার থেকে ঠেলে বাইরে বার করে দিলেন। এলোপাথাড়ি ফল তরকারি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাঠে। বাইরে একটু মাঠ ছিল, উঠোনের মতো তারপর রাস্তা। নোটের বান্ডিলগুলো মাঠে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন অন্ধকারে, তারপর দরজা বন্ধ করে আবার চেয়ার টেনে বসলেন কাজে, আমরা দেখলাম, রাগে, অপমানে, দুঃখে বাবা একেবারে থরথর করে কাঁপছেন, লাল হয়ে গেছে মুখচোখ। ভয়ে ভয়ে আমরাও তাড়াতাড়ি যে যার জায়গায় পালিয়ে গেলাম।

এই ঘটনার তিন চারদিন পরে হঠাৎ দাদা সন্ধের লোকালে এসে পেঁছিল! কাঁধে সেই ব্যাগ। হাতে একটা ছোট চামড়ার স্যুটকেস। ভেতরের বারান্দায় ঢুকে আমাদের দেখে বলল 'কিগো ; কেমন আছ, কী করছ তোমরা সব— ?' ব্যাস্ তার পরে মায়ের ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত মার যত কথা ছিল আর দাদার যত কথা ছিল, যথাসম্ভব বলা হলে, তারপর দাদার খাওয়া দাওয়া জামাকাপড় ছাড়া শোওয়ার ব্যবস্থা। দাদা আমাদের খুব ভালবাসত, প্রত্যেকের জন্যে নাম করে করে যত সামান্যই হোক, একটু কিছু হাতে করে নিয়ে আসত। সকালবেলায় দাদার স্যুটকেস খোলার ব্যাপারটা আমাদের যে কি উৎসাহের বিষয় ছিল বলার নয় । কিন্তু এবারে দাদাকে খুব বিষণ্ণ আর চিন্তিত দেখে আমরাও কেমন দমে গেলাম। শুতে শুতে সেদিন অনেক রাত হয়ে গেছিল। মা আর দাদার মধ্যে

অনেক কথা হল রাত পর্যন্ত। কখন তার পর ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মনে নেই। ঘুম ভাঙল, ভোর না হতেই বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠল 'দাদা এসেছে!' 'দাদা এসেছে!' বিছানায় বসেই দেখলাম, দাদার খাট খালি। কখন উঠে পড়েছে, কি জানি। এ ঘর ওঘর করে দেখলাম, দাদা বাড়িতে নেই। মা মাঠের দিকে চেয়ে, জানলায়-বসে। দাদার সেই ব্যাগটা নেই। বুঝলাম অনেক ভোরে ব্যাগ নিয়ে দাদা কোথায় বেরিয়েছে। বেলা হল, দাদা ফিরছে না সমানে উসখুস করছি। মাকে কিছু জিগ্যেস করার সাহস নেই কারো। এক সময় মা নিজেই বললেন 'ডবি কাঁথি গেছে, গ্রামের অবস্থা দেখতে।' সারাদিন কাটল সন্ধে পার হয়ে রাত হয়ে গেল দাদা ফিরল না। আমরা মায়ের কথামত খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। বাগানের ঝিঙের চচ্চড়ি আর রুটি রোজ রোজ ইচ্ছে করত না খেতে তবু বাধ্যতা আর হাসিমুখ আমাদের সব অভাবকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছিল। মনে পড়ে না কোনো দিন ওই দুর্ভিক্ষের সময় আমরা কেউ, বাবা পর্যন্ত, কখনও কোনো বিতৃষ্ণা বা বিরক্তি প্রকাশ করেননি। 'দেশে খুব আকাল চলছে, ঘরে ঘরে লোক অনাহারে আছে। গ্রামের দিকে হাজার হাজার লোক মারা গেছে, এখনও যাচ্ছে।' বাবার এই কথাগুলো মনে করে রোজ খাবার সময় হলে আমাদের নিজেদের কি রকম অপরাধী মনে হত। এই ভাবটা কিছুতেই কেউ কাটিয়ে উঠতে পারতাম না। দাদা ফিরত অনেক রাতে। পরিশ্রান্ত, উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা ধুলোভরা জামা চটি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মায়ের ঘরে বসে বলত সারাদিনে যা দেখেছে যা শুনেছে যা জেনেছে তার মর্মান্তিক কাহিনী, ব্যাগ থেকে বার করত খাতা, কাগজ ওতে অজস্র ছবি আঁকা। গ্রাম গ্রামান্তরে হেঁটেহেঁটে লিখে আনা ঘটনা, এঁকে আনা ছবি একে একে দেখাত মাকে, পড়তে পড়তে গলা ধরে যেত দাদার, আর মা কাঁদতেন ছবি দেখে আর ঘটনা শুনে। প্রতি রাত্রে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হত, প্রায় একমাস ধরে। মা আর দাদা শুধু শেষ রাতটুকু বিশ্রাম করতেন, আবার ভোর হলে দাদা বেরিয়ে যেত। আগে দেখতাম দাদার সারাদিনের খাবার বলতে একটুখানি চিড়ে আর গুড় বেঁধে গুছিয়ে রাখতেন বিকেল থেকে। দাদা নিয়ে যেত কিন্তু খেতে পারত না, কাউকে দিয়ে দিত। তাই মা ক্রমশ বেশি করে চিড়ে-গুড় বেঁধে দিতেন বড় ব্যাগে। কাঁধে ছবির ব্যাগ হাতে চিড়ে-গুড়ের ব্যাগ বয়ে নিয়ে কোথায় কোথায় চলে যেত দাদা। ওই একমাসে দাদা রোগা হয়ে, রোদে পুড়ে কালো হয়ে গেছিল এমন যে চেনাই যেত না। সবকিছু বিশদ বুঝতাম না। তখন দুর্ভিক্ষের জন্যে গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হয়ে গেছে, শ্মশান হয়ে গেছে, কত লোক ঘরের দাওয়ায় মরে পড়ে থেকেছে, তার কিছু কিছু বর্ণনা শুনতে পেতাম। বড় কষ্ট হত দাদাকে কাঁদতে দেখে। যাও-বা খাবার জোগাড় করে দিতেন মা, আমাদের মুখে উঠত না। বাবা কোথা থেকে থলে করে খুদ নিয়ে আসতেন ২।১ দিন ছাড়া ছাড়া। সেই খুদ ফুটিয়ে নুন দিয়ে বিতরণ করতেন মা, দুপুরবেলা সামনের উঠোনে কতো অনাহার ক্লিষ্ট কত যে মানুষ আসত, টিনে করে তারা ওই খুদসেদ্ধ খেত রোজ। ওরা বলত ওরা কেউ 'ভিখিরি' ছিল না।

মেদিনীপুরের নানান গ্রাম থেকে আসা গরিব চাষী ছিল ওরা। গ্রামদেশে জমির মাটি ফেটে গেছে, কোথাও সমুদ্রের নোনা জলের বন্যা জমি নষ্ট করে দিয়েছে, বাড়ি ঘরদোর ভাসিয়ে দিয়ে গেছে। শুধু দুটি খাবার আশায় শহরের দিকে চলে এসেছিল ওরা। পথে পথে কেঁদে বেড়াত, 'ফ্যান দাও মা, এটু ফ্যান' ক্রমশ ক্রমশ এই হাহাকার আরও আরও বাড়তে লাগল। দিনেরাতে আমরা চারদিকে মানুষের কান্না শুনতে পেতাম। বাজারে, পথের ধারে, মাঠের মধ্যে মরে পড়ে থাকত ওইসব নিরন্ন মানুষ। ততদিনে দাদা ফিরে গেছে বম্বেতে। যাবার দিনে আমাদের সবাইকে একে একে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে দাদা ফোঁপাচ্ছিল আর বলে গেছিল, 'কোনমতে বেঁচে থাকিস তোরা, মা বাবাকে বাঁচিয়ে রাখিস। বেশিদিন এরকম আর চলবে না, দুনিয়ার লোকে ধিক্কার দিচ্ছে।' ছোড়দা হয়ত এ কথার মানে তখন বুঝেছিল, আমরা দুইবোনে কিছু বুঝিনি কে, কাকে, কেন ধিক্কার দিচ্ছে, কার কোন অন্যায় অযোগ্যতার জন্যে গ্রামবাংলা শ্মশান হয়ে গেল, কার পাপে এত লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেল।

মনে আছে আমি তখন মিশন বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তাম, স্কুলের পক্ষ থেকে ত্রাণ সমিতির হয়ে মেদিনীপুরের পথে পথে বাড়ি বাড়ি ঘুরে অনেক টাকাপয়সা চাল কাপড় সংগ্রহ করেছিলাম ছাত্রীরা মিলে। সে সময় চারদিকে সাড়া পড়ে গেছিল সাহায্য তহবিল খোলার। সব স্কুল, মেদিনীপুর কলেজ, কলেজিয়েট স্কুল, সবাই চাল ও কাপড় সংগ্রহ করে, জেলাশাসকের দপ্তরে জমা দিতে লাগল। পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে লাগল দৈনন্দিন ঘটনার বিবরণ দিয়ে। এর কিছুকাল পরে মায়ের কাছে একটি পার্সেল এল বম্বে থেকে। মা দেখালেন বাবাকে, আমাদের সবাইকে দাদার বই! দাদার সেই একমাস ধরে প্রত্যক্ষ-দর্শীর বিবরণ লেখা ও আঁকা 'Hungry Bengal'।

মায়ের কাছে পাঠানো ওই একখানি কপিই বোধহয় আজ সেই বিভীষিকার সাক্ষী হয়ে আছে। শুনেছি বইটির পাঁচ হাজার কপি বৃটিশ রোষে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আজ বুঝতে পারি শাসককুলের চরম গাফিলতির কলঙ্ক চাপা দেয়ার প্রচেষ্টায় এছাড়া বোধহয় আর কোন পথই ছিল না কেননা 'Hungry Bengal' একটি অতি গুরুত্ব-পূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল। সরেজমিন তদন্তের Report। এমনভাবে জীবন বিপন্ন করে প্রত্যক্ষদর্শীর তথ্য সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা ও তার দৃষ্টান্ত সম্ভবত আর নেই। 'Hungry Bengal' চিত্ত প্রসাদের একটি অসামান্য সৃষ্টি। প্রায় পঞ্চাশ বছর (৪৮ বছর) পরে আবার সেই লেখা 'যোগসূত্র' ছাপল। □

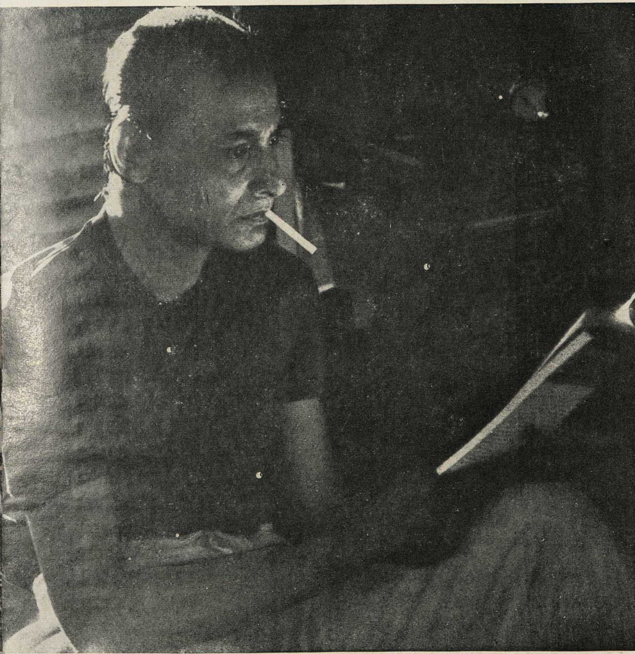

চিত্ত প্রসাদের অপ্রকাশিত রচনা

চিত্রকর বনাম বিজ্ঞাপনের দালাল

এদেশের আর্ট স্কুল বা কলেজ থেকে প্রতিবছর অনেক তরুণ চিত্রকর ডিপ্লোমা অর্জন করে জীবনের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁরা প্রায় সবাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের প্রতিভাবান সন্তান। তাঁদের প্রায় সকলেরই শুরুতে অনেক উচ্চাশা থাকে। অনেকেই একদিন 'মাস্টার পীস' এঁকে জগদ্বিখ্যাত হবার স্বপ্ন দেখেন। অনেকেই কিছুদিনের মধ্যে একক প্রদর্শনী করেন নিজেদের কাজের, পত্রিকার চিত্র-সমালোচকদের নিন্দামিশ্রিত প্রশংসায় সহজে নিরুৎসাহ হন না কিছুদিন। তারপর এমন একদিন আসে যখন ছবি বিক্রির কথাটা আর এড়ানো যায় না। জীবনের বাস্তব সমস্যার তাড়নায় অনেকেই বাঁধা মাইনের চাকুরিতে ঢুকে পড়েন—কেউ ড্রইং মাস্টারিতে ঢোকেন, কেউ বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানির স্টুডিয়োতে। এসব দালাল-কোম্পানিরা কিছু ভারতীয়, কিছু ইংগ ভারতীয়, কিছু আমেরিকান-ভারতীয় মূলধনে চলে—কোম্পানির এ দেশের হর্তাকর্তারা প্রায়শই সবাই ভারতীয়। ভারতের চিত্রকরদের রাজ্যে এই ঘটনা ঘটে চলেছে বিগত প্রায় ২৫/৩০ বছর ধরে।

যাঁরা এসব চাকরিতে ঢোকেন না তাঁরা হয় দুঃসাহসী, নয়তো অগত্যা ঢোকেন না, তারা বইয়ের প্রচ্ছদ এবং গল্পাদির ইলাসট্রেশন এঁকে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকেন। এঁদের ব্যবসার ক্ষেত্রে মর্মান্তিক প্রতিযোগিতা। এবং তাদের সংখ্যা চাকুরেদের অনুপাতে কম, কিন্তু তারাও ঐসব দালাল কোম্পানিদের দ্বারস্থ হতে প্রায়শই বাধ্য হন এবং দালালদের প্রয়োজন ও রুচিগত কাজ করতে বাধ্য হন একমাত্র পেটের দায়ে।

এ দেশের চারটি মহানগরীতে—বোম্বাই, কলিকাতা, দিল্লী ও মাদ্রাজে অনেকগুলি বিত্তশালী বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনের দালাল কোম্পানি আজ বহু চিত্রকরের প্রতিভা এবং শ্রমের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত—(যদিও এক্ষেত্রে প্রতিভা না বলে পটুত্ব বলাই ভালো হবে) কোম্পানিগুলি বহু লক্ষ টাকার কারবার করেন প্রতিবছর, তাদের মুনাফার বহর আমরা জানি না, কিন্তু জানি যে তাদের মাইনে-বাঁধা চাকুরে চিত্রকরদের কোনো দিক দিয়েই সৌভাগ্যবান বলা যায় না। কোম্পানির স্টুডিয়ো মানে সারিবদ্ধ ডেস্কের সামনে চেয়ার পাতা হল ঘর। চিত্রকরেরা পাশাপাশি বসে যে যার নির্দিষ্ট কাজ করেন। কাজের সময়: অফিসের সময়—দশটা পাঁচটা। তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেন আর্ট ডাইরেক্টর। তিনি কাজ ঠিক করে দেন, কাজ বুঝে নেন। তাদের মাইনে ন্যূনতম ৬০/৭৫ টাকা ঊর্ধ্বতম ২০০/২৫০ টাকা।

আর্ট ডাইরেক্টরদের মাইনে ২০০০/৩০০০ টাকা। যদিও তিনি স্টুডিয়োর অন্যান্য

চাকুরে চিত্রকরদের মতোই একই রকমের ডিপ্লোমাধারী চিত্রকর। কিন্তু তাঁর কাজের গুরুত্ব অপরের চেয়ে অনেক বেশী—সম্পূর্ণ স্টুডিয়োর পরিচালনার দায়িত্ব তাঁর। প্রত্যেক চিত্রকরকে দিয়ে মিতব্যয়ে প্রয়োজন মতো কাজ সময়মতো সুসম্পন্ন করিয়ে নেবার ভার তাঁর ওপর। চিত্রকরদের যোগ্যতা বিচার করে চিত্রকর নিয়োগ করা থেকে স্টুডিয়োর সব কিছু সামলাতে হয় তাঁকে। আর্ট ডাইরেক্টর না হলে স্টুডিয়ো অচল, তাঁর খ্যাতিতেই স্টুডিয়ো চলে—কোম্পানি চলে বললে অন্যায় হবে না।

আর্ট ডাইরেক্টরের অধীনস্থ চিত্রকরেরা প্রত্যেকে সমগ্র কাজের একেক অংশ বিশেষ সম্পূর্ণ করেন। তাদের সকলেরই ছবি আঁকার হাত খুবই দক্ষ। তাদের কাজ করতে হয় খুবই দ্রুত এবং ঘষামাজা পরিপাটি পরিচ্ছন্নভাবে—প্রায় যন্ত্রের মতো—কিন্তু সবই হাতের কাজ। তাদের মাথা খাটিয়ে নতুন ছবি বা নতুন ঢং নতুন রং কিছুই বার করতে হয় না—সে সব ঠিক করে দেন আর্ট ডাইরেক্টর। তাঁর অধীনস্থেরা অনেকটা কলের মতো আজীবন কাজ পয়দা করে যান। এই হলো এদেশের বিজ্ঞাপন দালাল কোম্পানির স্টুডিয়োর চাকুরে চিত্রকরদের মোটামুটি পরিচয়।

আমার পরিচিত কোনো কোনো সাধারণ চাকুরে চিত্রকর গত বিশ বছর চাকুরির পর বলেন: 'আমরা তো হুজ্জাম নাপিত। আমরা চিত্রবিদ্যাদেবীর মাথা মুড়িয়ে রুজি রোজগার করি, ব্রাদার, কত্তাদের দাড়িও কামাই তাও বলতে পারো। নিজের ইচ্ছে মতো ছবি আঁকা ভুলে গেছি কবে তাও মনে নেই। তেমন ইচ্ছে আর হয় না। কত্তাদের খদ্দের খুশি না হলে আমাদের চাকরী যাবে—সেই ভয়ে তাঁরা যা আঁকান তাই আঁকি। অসহ্য বোধ হয় মাঝে মাঝে এই গোলামি কিন্তু নিরুপায়। বিয়ে সাদী করেছি, বাল বাচ্ছা সব হয়েছেন, দু'বোনের বিয়ে দিতে হবে, ছোটো ভাই বেকার, মা বুড়ী ভি আজও টিঁকে আছেন। আমাদের তো স্বাধীন চিত্রচর্চার কথা চিন্তা করাও পাপ।...'

আর্ট ডাইরেক্টরদের মুখেও সেই এক বাণী শুনেছি। তাঁরা যদিও অনেক বেশি পসার বোনাস ইত্যাদি পান—তবু তাঁরাও খুব স্বাধীন নন, তাঁদেরও কত্তা আছেন—একজিকিউটিভ শ্রেণী। তাঁদের—আর্ট ডাইরেক্টরদের আয়ের চেয়ে ব্যয় কম নয়—প্রেস্টিজের বালাই আছে। তারও বড়ো কথা, কর্মক্ষেত্রে নিত্য নতুন কাজ পয়দা করতে হয় কলের মতো এবং বিচিত্র সব কাজ নানান পণ্য নিয়ে। মগজের উদ্ভাবনী শক্তির সীমা আছে, তাই আইডিয়া আহরণ করতে হয় তাঁদের অন্যের আইডিয়া থেকে, এবং তার জন্য—সৌভাগ্যের বিষয়—বিশেষ করে আমেরিকান সচিত্র পত্রিকাগুলি দুষ্প্রাপ্য নয়। লাইফ, স্যাটার্ডে ইভনিং পোস্ট, লেডিজ্ হোম্ জার্নাল—আরো অগণ্য বিজ্ঞাপনের মেড্ ঈজি সুলভে পাওয়া যায়,—অফিসের কাজের বাইরে সময় দিতে হয় বটে, কিন্তু তৈরি আইডিয়াকে একটু ঢেলে সাজিয়ে খাড়া করলেই হোলো। অধুনা কালার ফোটোগ্রাফের মুদ্রণে উন্নতি হওয়ায় আরেক সুবিধা হয়েছে মডেলের ফোটো দিয়ে বেশ সহজেই কার্যোদ্ধার হয়। এমন কি কালার না হলেও কালো সাদা ফোটোতেও চলে। কিন্তু চিত্রশিল্পী হওয়া আর আর্ট ডাইরেক্টর হওয়া তো এক ব্যাপার নয়। তাই এক আর্ট

ডাইরেক্টরকেও লাইফের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলতে শুনেছিলাম : 'আমরা তোমাদের মতো আর্টিস্ট নয় মশায়, আমরা হলাম হজ্জাম—নাপিত। আমরা আর্টের মাথা মুড়িয়ে রুজি রোজগার করি।...'

বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানির স্টুডিয়োর চিত্রকরদের মতো কর্মনিষ্ঠ চাকুরে ঝানু কেরানী কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের ছবি আঁকায় হাতের সুপটুত্বের কথা আগেই বলেছি—দ্রুত এবং পরিপাটি কাজ পয়দা এঁদের বিশেষত্ব, এঁদের ছবি ফোটোগ্রাফের চেয়ে প্রকৃতির নকল হিসেবে কোনো হিসেবে কম নিখুঁত নয়, এঁদের হাতের লেখা ছাপার হরফ বলে ভুল হবে, ছবিতে বিষয়বস্তু এবং লেখা সাজানো আমেরিকান যে কোনো কাজের সমতুল। এবং আমি দেখেছি, অনেকেই স্টুডিয়ো ছুটির পরও রাত ৮/৯ টা অবধি ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় দিনের অসমাপ্ত কাজ ফিনিশ করেন, অনেকে কাজ বাড়ীতে বহে এনে সমাপ্ত করেন। তা ছাড়া অনেক সাধারণ চাকুরে চিত্রকর আর্ট ডাইরেক্টরের প্রাইভেট কমিশনের কাজ ফিনিশ করে দেন উপরি ২০/২৫ টাকার মজুরীতে। অনেক আর্ট ডাইরেক্টর দেখেছি নিয়মিত ভাবে প্রাইভেট কমিশন জোগাড় করেন কিন্তু নিজে সেসব কাজ সম্পূর্ণ করবার সময় পান না। ছবির খসড়া করে দিয়ে অধীনস্থদের দ্বারা সে সব ছবি ফিনিশ করিয়ে নেন। অধীনস্থেরাও মাঝে মাঝে প্রাইভেট কাজ পান—যেমন পুরোনো ছোটো গ্রুপ ফোটোর মাঝ থেকে একটি ছোটো ঘোলা মুখ থেকে বড়ো অয়েল পেন্টিং করে দেওয়া—তা থেকে মাঝে মাঝে বড়ো জোর ৫০ টাকা উপরি হয় গরীবের।

স্টুডিয়োর কাজের চাপে পড়ে এঁরা প্রায় সকলেই বহি-প্রকৃতির চিত্রানুশীলন করতে পারেন না। চিত্র সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে পারেন না, এমনকি অনেকে চিত্র প্রদর্শনী দেখতেও যান না। বলেন : 'সময় কোথায়, ব্রাদার ? তাছাড়া, মন খারাপ হয়ে যায় একজিবিশনে গেলে। মনে পড়ে যায়—আমরা তো হজ্জাম, আর্টের সংগে সম্পর্ক কী আমাদের ? তার চেয়ে বৌ ছেলে পিলে নিয়ে ফিলম্ দেখে আসি মাঝে মাঝে, বেশ সময় কাটে, ওরাও খুশি হয়।' কিন্তু কোনো কোনো আর্ট ডাইরেক্টরকে দেখেছি নিয়মিত ভাবে উল্লেখযোগ্য একজিবিশনগুলি সবই যত্ন সহকারে দেখতে। তাঁরা নতুন ট্যালেন্ট সন্ধান করেন 'তাদের' স্টুডিয়োর জন্যে, নতুন আইডিয়া পেলে তার সদ্-ব্যবহার করেন যথা সময়ে এবং যথাস্থানে।

এদেশের এতোগুলি বিজ্ঞাপন-দালাল-স্টুডিয়োর শত শত চিত্রকরেরা চিত্র হিসেবে কী সম্পদ বা জঞ্জালের অফুরন্ত 'অবদান' দিয়ে যাচ্ছেন আমাদের সমাজকে ? বিজ্ঞাপন-দাতার পণ্যের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার বেশি তাঁদের ঐকান্তিক পরিশ্রমের সকল ফসলের আর কোনো সার্থকতা বা উদ্দেশ্য নেই। সে সব কাজে মন দিয়ে দ্রষ্টব্য, হৃদয় দিয়ে রসানুভবের কিছুই থাকে না। ছবির অপব্যবহার হয় বিজ্ঞাপনে। সে সব ছবিতে থাকে নির্বোধ বাহ্যিক আকর্ষণ—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্থূল যৌন আবেদন, নারী-দেহের নির্লজ্জ অবমাননাকর অসদ্ ব্যবহার। কোনো কোনো বিজ্ঞাপনে 'ভারতীয়তার'

নামে এদেশের প্রাচীন শিল্প সম্পদগুলির নির্মম অপব্যবহার করা হয়—ধান ভানতে শিবের গীতের মতো—প্রসাধন পণ্যের সঙ্গে অজন্তার বৌদ্ধ নারীর ছবি, কাগজ কোম্পানির ক্যালেন্ডারে মোগোল রাজপুত মিনিয়েচার সেসব বিজ্ঞাপন দেশের লোকের মনে দেশের ঐতিহ্য সম্পদের প্রতি তথা নারী দেহের প্রতি অশ্রদ্ধা বা তাচ্ছিল্যের বেশি কিছু উদ্রেক করা হয় না। বিজ্ঞাপনের পণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোই বিজ্ঞাপনের ছবির কাজ। সে কাজ বিজ্ঞাপনদাতা ও তাঁর দালালদের ব্যবসায়ের হিত সাধন করে তা খুবই সত্য। কিন্তু সমাজের চোখে চিত্রের ভূমিকাকে বাজারে ঢাক পেটানোর কাজে নামিয়ে আনা হয়, সেই সঙ্গে চিত্রকরকেও সেই স্তরেই নেমে আসতে বাধ্য করা হয় অন্নের বিনিময়ে। এ কথার মর্মান্তিক বেদনাময় সত্য বুঝতে হলে স্মরণ করা দরকার যে এককালে চিত্র বিশেষ করে নারী প্রতিমা দেবালয়ের পবিত্র স্থানে এদেশের চিত্রকরেরাই স্থান দিয়েছিলেন এবং ছবির স্থান ছিল তীর্থস্থানে ও রাজা বাদশাদের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারে। এবং তাকে আজ বিজ্ঞাপনের দালালেরা পণ্যের সেবাদাসী করে বাজারে দাঁড়া করিয়েছেন। দালালদের মাথা ব্যথা তো চিত্র বা চিত্রকর বা নারী-দেহ বা দেশের ঐতিহ্য কোনো কিছুরই প্রতি সম্মান দেখানো নয়, তাঁদের এবং তাঁদের ক্লায়েন্ট বিজ্ঞাপন দাতাদের একমাত্র উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন। দাড়ি কামানোর ব্লেড-এর বিজ্ঞাপন আমি দেখেছি নারী মূর্তি সহযোগে রচনা হয়েছে! মানুষের দৈহিক সুখ সাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে ব্যবহারের পণ্য বিক্রি করা বিজ্ঞাপনের কাজ, শিল্পপ্রেম নয়। শুধু চিত্রকরদের কাজ থেকেই সেই প্রেম আশা করা যায়। এবং দেশের লোকের কাজ থেকেও।

সিনেমার বিজ্ঞাপনগুলি যদিও বড়ো বড়ো বিজ্ঞাপনের দালাল্ল-কোম্পানি থেকে পয়দা হয় না, ফিলম্অলাদের নিজস্ব বাঁধা চিত্রকরেরা সে সব পোস্টার এবং পত্রিকার বিজ্ঞাপন পয়দা করেন, তবু সেগুলিতে সচরাচর যে জঘন্য রুচির উচ্চণ্ড বহুল প্রচার দেশময় আজ ছড়িয়ে পড়েছে তার কুপ্রভাব অন্যান্য বিজ্ঞাপনের ওপরেও কিছু কম হচ্ছে না। অভিজাত-দর্শন সুন্দরী ভারতীয় তরুণী রূপবান স্মার্ট ভারতীয় তরুণের সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছেন, টাইট-স্ল্যাকপরা সুন্দরী ভারতীয় তরুণী সুদৃশ্য গালচেতে দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমের ভান করেছেন—এমন সব বিজ্ঞাপন দেখে ফিলমের কথা মনে পড়ে। এ দেশের, বিশেষ করে বোম্বাইয়ের ফিলমের বিজ্ঞাপনগুলিতে আমেরিকান কুরুচির প্রভাব উৎকটরূপে স্পষ্ট। ইয়োরোপীয় সিনেমা পোস্টারে তবু সুরুচি এবং চিত্র মূল্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশ কিছু থাকে,—কিন্তু এদেশে সে জাতের সিনেমা-পোস্টার অতি অল্পই কদাচিত দেখা যায়। এ দেশের সিনেমা পোস্টার ইত্যাদি এ দেশেরই চিত্রকরদের সৃষ্টি, তাই সে কাজের উল্লেখ করা এ প্রসংগে বিশেষ প্রয়োজন। বিশেষ করে যখন দেখি যে সিনেমা-পোস্টারের প্রভাবে দেশবাসীর সৌন্দর্যবোধ বিকৃত হচ্ছে তখন বিজ্ঞাপন জগত সম্বন্ধে কোনো সৌহার্দ্য পোষণ করা সম্ভব হয় না। নির্লজ্জ 'মোহব্বতের' এবং নির্লজ্জতর উৎকট পোষাক ও অঙ্গভঙ্গির বিশালয়তন এবং অত্যুগ্র বর্ণের অগণ্য পোস্টারের জ্বালায় নগরে কোনো দিকে চোখ পাতা যায় না। তেমনি সব বিজ্ঞাপিত ছবির নামগুলি

'আও পেয়ার করে', 'পেয়ার কিয়া তো ডর্না ক্যায়া ?' শ্রেণীর নামগুলি তো কদর্য রুচি পরিবেশন করে। এসব পোস্টার সরকারি সেন্সরের দৃষ্টিতে পড়ে না কি ? বিজ্ঞাপন-দাতারা বিজ্ঞাপন-দালালদের সাহায্যে চিত্রকরদের এবং চিত্রবিদ্যাকে অপব্যবহারে প্রয়োগ করছেন এবং জনসাধারণের রুচিকে নষ্ট করছেন - একথা আজ আর অবজ্ঞা করলে চলে না। বিশেষ করে শিল্প-রসিকদের চলে না।

তারপর, কিছুদিন অবধি বিজ্ঞাপন জগতে 'আধুনিক' ছবির ক্যালেণ্ডার পয়দা হতে দেখা যাচ্ছে। সেগুলিকে বিজ্ঞাপন-দালালেরা নাম দিয়েছেন 'প্রেসটিজ ক্যালেণ্ডার', মামুলি ক্যালেণ্ডারের নাম 'বাজার ক্যালেণ্ডার'। প্রেস্টিজ-ক্যালেণ্ডারে ছবিতে উচ্চাঙ্গ বা উন্নাসিক 'আর্টের' নামে রং ঢং ইত্যাদির যথেচ্ছাচার এবং বাজার ক্যালেণ্ডার বাজারের উপযুক্ত হয় নারীমূর্তি বা 'ধর্মমূলক' বিষয়ের ছবি আর তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতা ও পণ্যের চিৎকার ঘোষণা আর উভয় ক্ষেত্রেই ক্যালেণ্ডার অতি নগণ্য লেজুড় মাত্র। প্রেস্টিজ্ ক্যালেণ্ডার বিদেশে উপহার পাঠানো হয়।

প্রেস্টিজ ক্যালেণ্ডারের 'আধুনিক' ছবি বেশির ভাগই দালাল-কোম্পানির স্টুডিয়োতে আঁকা হয় না, বাইরের 'ফ্রী লান্স আর্টিস্ট' বা স্বাধীন চিত্রকরদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ক্লায়েন্ট্দের কাছে বেচেন দালালরা। ক্লায়েন্ট্ স্বয়ং চিত্রকরের কাছে গিয়ে ঐসব 'আধুনিক' ঢং ও মর্মের ছবি কেনেন না। দালালদের ওপর 'নতুন কিছু' খুঁজে বার করে আনার ভার ছেড়ে দেন ক্লায়েন্ট। দালালেরা তাঁদের নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি রুচি আর্টজ্ঞান ইত্যাদি অনুযায়ী সে-সব ছবি পছন্দ করেন—বেশির ভাগ দালালের ঐসব গুণাবলী অতি স্থূল এবং নির্বোধ—চিত্রবিদ্যা সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং অন্ধ—এক কথায় বাজার-ক্যালেণ্ডারের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁরা ক্লায়েন্ট্ খুশি করবার তাগিদেই বাধ্য হয়ে 'আধুনিক চিত্রকরদের' দ্বারস্থ হন।

তাঁরা সচরাচর উদীয়মান স্বাধীন আধুনিক চিত্রকরদের কাছেই যাওয়া পছন্দ বা নিরাপদ মনে করেন, এবং ছবি দেখে বলেন : 'আপনার এসব কাজ খুবই নতুন ঢং-এর খুবই ভালো লাগলো আমার, পিকাসো-টিকাসো বুঝিনে মশাই, কিন্তু আপনার এসব কাজ যদি মডার্ন আর্ট হয় তবে আমিও মডার্ন আর্টকে শ্রদ্ধা করতে পারি, বুঝতে পারি। খুবই উচ্চশ্রেণীর কাজ আপনার, ব্যক্তিগতভাবে আমি একদম মুগ্ধ আপনার কাজ দেখে। কিন্তু কী জানেন, আমার ব্যক্তিগত পছন্দ তো এখানে বড়ো কথা নয়, জানেনই তো কীসব জীব এ দেশের ক্লায়েন্ট্রা সবাই, মক্কেলেরা সবাই মুখেই বলেন তাঁরা এখন নতুন ঢং-এর কাজ চান, মডার্ন আর্ট চান, তা না হলে আজকাল আর তাদের প্রেস্টিজ থাকচে না। কিন্তু তা তো নয়। ওসব ওঁদের ফ্যাশনেব্ল্ সোসাইটির ফাঁকা বুলি। ওঁরা আসলে কী চান আর কী চান না তা আমরা বুঝি। ওঁদের রুচি বিদ্যে-বুদ্ধি সব বুঝে চলাই আমাদের কাজ। আমি বলছি শুনুন—এই যে এই ছবিটা—এটি চলতে পারে ক্যালেণ্ডারে—এরকমটি আরো পাঁচখানি চাই। সে কথা পরে হবে। এখন আমার মনে হয়—ক্লায়েন্টকে তো চিনি—এই ছবির রংগুলি যদি আরো একটু উজ্জ্বল

—একটু ব্রাইটর করে দেন—বেশ কিছুটা ব্রাইটর—যেন চট করে চোখে পড়ে,—আর এই ফিমেল্ ফর্মটিকে আরেকটু স্পষ্ট ফিমেল করে দেন যদি—তবে আমি—আই এ্যাম মোর দ্যান্ শ্যুয়োর যে—ক্লায়েন্ট্ মক্কেল একেবারে গলে পড়বে। তারপর এই একখানা পছন্দ হলে পর বাকি পাঁচ খানার জন্যে আর অতো ট্রাব্‌ল্‌স্ না নিলেও চলবে—আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন ক্লায়েন্ট কী চায়।' এই ধরনের বাণী আমিও নিজে দু' চার দালালের কাছ থেকে জীবনে বার কয়েক শুনেছি।

এ হেন গায়ে—পড়া 'বন্ধু' দালালের উপদেশ মতো কাজ করতে চিত্রকর যদি নারাজ হন তবে : 'ঐ তো আপনাদের দোষ মশাই, আপনারা যাকে বলে টু মাচ্ আর্টিস্ট হয়েই তো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই নষ্ঠ করেন, আনকম্প্রমাইজিং টেম্পারামেন্টাল হয়ে নিজেদের ট্যালেন্ট নিয়ে নিজেরাই বসে আছেন আর দুর্ভোগ ভুগছেন। ক্লায়েন্ট্ মক্কেলরা আজকাল প্রেস্টিজের খাতিরে মডার্ন আর্ট চাইছে—সেটা যে আপনাদের কতো বড়ো সৌভাগ্যের কতো বড়ো সুযোগের কথা তা ভেবে দেখছেন না। কিন্তু এদেশের মক্কেলরা যতোই মডার্ন আর্ট চান না, তাঁরা তো কেউ পিকাসো-টিকাসোর ধার ধারেন না। যারা হেলে ধরতে পারে না তাদের কাছে একেবারে কেউটে নিয়ে গেলে চলে কি? ঘাবড়ে যাবে বুঝলেন না? তাই বলছি একটু হেরফের করে দিলেই যদি কাজটা মক্কেলের পছন্দ হয়ে যায় তবে আপনারও লাভ মডার্ন আর্টেরও লাভ। আমাদের কী বা এমন লাভ? বরং এই নতুন কিছুর ফ্যাড্ সামলানো তো আমাদের পক্ষে যাকে বলে এক নতুন হেড্-এক্ হয়েছে। মক্কেলদের আমরা চিনি—তাদের চেনাই আমাদের কাজ।...'

প্রসঙ্গত, দালালেরা দেখেছি অনেকেই প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা হবার ট্যালেন্ট রাখেন। কেউ কেউ এ্যামেচার স্টেজে অভিনয় করেন।

শিল্পী যদি দালালের উপদেশ মতো ছবিতে পরিবর্তন করতে রাজি হন, নেহাৎ পেটের দায়ে কোনো কোনো শিল্পী তো হন, তখন : 'আপনাদের মতো ক্রিয়েটিভ আর্টিস্টদের সহযোগিতা পেলে আমরা—পাব্‌লিসিটি যারা হ্যান্ডেল করি—আমরা এদেশের পাব্‌লিসিটির রাজ্যে হুলস্থুল বাধিয়ে দিতে পারি মশায়, দস্তুর মতো রেভোল্যুশন এনে দিতে পারি। ঐ তো আমাদের কাজ। নিত্য নতুন ট্যালেন্ট খুঁজে বার করে তাদের সমাজের মাঝখানে তুলে ধরা, এদেশের ক্রিয়েটিভ আর্টকে এগিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া। এই তো আমাদের কাজ। তা শুনুন, আপনি ঐ যে দামটা বললেন, তা অবশ্যি ফরেনের যে-কোনো দেশে হলে লুপে নিতো তাদের ক্লায়েন্ট্। কিন্তু এটা কোন দেশ তা ভুললে তো চলবে না। এদেশে এখনো টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি শুরু হয়নি মশায়, হবো হবো করছে মাত্র।—দামটা আপনাকে কাজে কাজেই কমাতে হবে—অনেকটা কমাতে হবে। প্রথম কথা, ক্লায়েন্টের বাজেটে অতো বেশি টাকা ছবির জন্য ধরা হয়নি। তারপর প্রিন্টিং খরচ প্রচণ্ড পড়বে,—এসব জানাই তো আমাদের কাজ। কিন্তু ঘাবড়াবেন না মশায়, ঐ একটু রদবদল করে দিলে পর আপনার এ ছবি ক্লায়েন্ট এ্যাপ্রুভ্ করবেই—আফটার অল্ ক্লায়েন্টের পেছনে আমি নিজে লেগে

থাকবো তা ভুলবেন না। এই তো আমাদের কাজ। আর এটা এ্যাপ্রুভ হয়ে যাক তারপর বাকি পাঁচখানা সবই আপনাকে দিয়ে আঁকিয়ে নেয়াবো। তা হলেই তো হোলো? ধরুন একশ করে হলে ছ'খানায় সবশুদ্ধ ছশো হচ্ছে। মন্দ কী? তারপর একবার যখন এ ক্যালেন্ডার বাজারে বেরিয়ে দাঁড়াবে—হৈ হৈ পড়ে যাবে মশায়, হুলুস্থুলু পড়ে যাবে তখন আর কে পায় আপনাকে, তখন যা দাম হাঁকবেন তাতেই মক্কেলেরা রাজি হবে। যেই কেউ নতুন একটা কিছু করে বসল অমনি আর সবার তা এ্যাট এনি কস্ট করতেই হবে। মক্কেলদের আমরা চিনি তো, ঐ তো আমাদের কাজ। বলুন রাজি আছেন। তা হলে নিয়ে চললাম এ ছবিটা। কাল লাঞ্চেই মক্কেলের সঙ্গে দেখা হবে।…'

এইভাবে পাইকিরি হিসেবে কাজ দেবার আশা দেখিয়ে স্বাধীন আর্টিস্টদের কাজের দাম খুচরো দরে নামানো হয়। তারপর অনেক ক্ষেত্রেই পাইকিরি ফরমায়েশ দেওয়া হয় না,—দালাল অফিসিয়ালি চিঠিতে জানান যে ক্লায়েন্ট ঐ একখানির বেশি ছবি কিনতে রাজি নন। এতএব খুচরো দরেই ছবিটির দাম ধার্য হয়। সম্প্রতি আমার এক 'বন্ধু' আমায় মাঝখানে রেখে—এই কলকাতাতেই—কয়েকজন তরুণ গুণী শিল্পীর সৃষ্ট একটি চমৎকার এবং সম্পূর্ণ নতুন আইডিয়ার কাজ তাঁর ক্লায়েন্টের জন্যে ঠিক উপরোক্ত রীতিতে ভাঁওতা দিয়ে দর নির্মমভাবে কমিয়ে কিনেছেন। এই দুর্নীতি দালাল-কোম্পানীদের অন্যতম ব্যবসায়নীতি। ক্যালেন্ডারে অবশ্যি যথা সময়ে সে-ছবি বার হয়—আরো পাঁচজন স্বাধীন আর্টিস্টের নতুন শ্রেণীর পাঁচখানা ছবির সঙ্গে। কিন্তু বাজারে দাঁড়ালেও হৈ হৈ হুলুস্থুলু পড়ে যায় না, আরো শত শত ওঁছা কাজের ভিড়ে নতুন ভালো কাজ তলিয়ে যায়—ওঁছা ছবির চটক ভড়ং সবই বেশি। আর, সস্তা দামটা? চিত্রকরের ভাগ্যে তা অনেক সময়ে জোটে অবশ্যি—মাস চারেক হাঁটাহাঁটি লেখালেখির পর,—দালাল-কোম্পানির কমিশন বাদ দিয়ে নিশ্চয়। দালাল-কোম্পানির ঐ তো কাজ!

দালাল-কোম্পানির দুর্নীতির প্রভাব কোম্পানির অন্নপুষ্ট প্রতিভাবান চিত্রকরদেরও কী ভাবে অমানুষ করে তোলে তার একটি উদাহরণ এখানে দিতে চাই। আমার চেনা বোম্বায়ের এক বিখ্যাত ভদ্রসন্তান ভদ্রলোক নিজে নাম করা প্রতিভাবান চিত্রকর এবং মোটা মাইনেতে এক দালাল-কোম্পানিতে পরিণত প্রাচীন আর্ট ডাইরেক্টর। তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে তাঁর এককালের সহপাঠী এক স্বাধীন এবং অত্যন্ত গুণী স্বনামধন্য চিত্রকর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা আমায় বলেছিলেন। আর্ট ডাইরেক্টর মশায় সহপাঠীর তাৎকালীন আর্থিক দুর্দশার কথা জানতে পেয়ে বন্ধুকে 'সাহায্য' করবার জন্যে একটি কাজে কমিশন করেন। চিত্রকর বন্ধুটি তখন নিজের তৈরি রঙে নিজস্ব স্টাইল আবিষ্কারে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দিনরাত পাগলের মতো খাটছেন, এবং ঘরে তাঁর বৃদ্ধ রুগ্ন পিতা, রুগ্না স্ত্রী, রুগ্ন সন্তান বুভুক্ষু—এসব আমার এবং আর্ট ডাইরেক্টরেরও স্বচক্ষে দেখা। বাড়ীওলার দয়ায় তখনো নিরাশ্রয় নয় এবং প্রতিবেশীদের দয়ায় উপবাসে থাকেন না, কিন্তু তাঁর স্কন্ধে বিপুল ঋণের বোঝা বিপুলতর হয়ে উঠছে প্রত্যহ। এ হেন অবস্থায় কমিশনটি পেয়ে চিত্রকরের কী আনন্দ হতে পারে তা অনুমান করা সহজ।

কাজটা এক কোটিপতি তৈল কোম্পানির প্রেস্টিজ্ ক্যালেণ্ডারের জন্য একখানি ল্যাণ্ডস্কেপ্ আধুনিক ঢং-এ আঁকা চাই। ল্যাণ্ডস্কেপ্‌টি এদেশের নতুন কোনো এক বিশেষ তড়িতশক্তি উৎপাদনের বাঁধের এবং তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যকে বজায় রেখে হতে হবে,—এবং ফোটোগ্রাফিক্ হবে না আদৌ—সম্পূর্ণ আধুনিক ঢং-এ আঁকতে হবে।

চিত্রকর সেই বিশেষ বাঁধের স্থানে গিয়ে কয়েকদিন সম্পূর্ণভাবে স্টাডি করে এসে তাঁর নিজের তৈরি রঙে নিজের নতুন ঢঙে চমৎকার, আশ্চর্য সুন্দর, সানন্দ উদ্দীপনায় আঁকা বলিষ্ঠ এক ছবি সৃষ্টি করলে। সত্যই সে-এক দৃশ্যকাব্য—সে ছবি আমি পরে ক্যালেণ্ডারে দেখেছি।

মূল ছবিটি যখন প্রথম নিয়ে গিয়ে চিত্রকর তাঁর আর্ট ডাইরেক্টর্ বন্ধুকে দেখালেন, বন্ধু তা দেখেই দু'হাতে চোখ ঢেকে মুখ বিকৃত করে—'এ্যাহ্, ছ্যা ছ্যা ছ্যা—দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে—।' বলে আপ্যায়িত করলেন, তারপর পিতৃসুলভ স্নেহমিশ্রিত কন্ঠে বললেন: 'চলবে না ব্রাদার, এ চলবে না, তোমার ওসব কাদা গোবোর পাঁকের রং-ও চলবে না আর অতো বেশি মডার্ন হলেও চলবে না। মিস্টার আর্-কে দেখালেই সায়েব হয় আঁৎকে উঠবেন নয় হেসে লুটোপুটি খাবেন। আমি তাঁকে চিনি তো, এই আমাদের কাজ। মাঝ থেকে আমার নামও ডুববে। চলবে না।—বোসো আমি হেল্প্ করছি—।' বলেই ডাইরেক্টর মশায় দামি একখানা ভারি হাতে-তৈরি ড্রইং কাগজ তাঁর বোর্ডের ওপর ফেলে পেলিকানের পোস্টার রং দিয়ে ওপরে নীল আকাশ আর নীচে উজ্জ্বল কমলা জমিন লেপে দিয়ে বললেন: 'এর ওপরে এই ব্রাইট্‌নেস্ বজায় রেখে নতুন করে এঁকে আনো কালকেই। আর মনে রেখো, যদিও ফোটোগ্রাফিক হওয়া চাই না, তবু ঐ রকমের অনু-রিয়ালিস্টিকও চাই না, দুয়ের মাঝামাঝি হওয়া চাই। যাও, মন খারাপ কোরো না, আর তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি। আজকের দিনটা নষ্ট হোলো—আজ এ্যাপয়েন্টমেন্ট্ ছিলো মিস্টার আর—এর সঙ্গে।—তোমার কাছে পেলিকানের রং না থাকলে নিয়ে যাও আমার কাছ থেকে। আর তুলি? না কি আজকাল ঝাড়ু দিয়ে আঁকছো? তোমায় কিছু বলা যায় না। যে ক্ষ্যাপামি ঢুকেছে তোমার মাথায় আজকাল, কিছুই বলা যায় না।...'

বলা ভালো, সৌভাগ্যক্রমেই চিত্রকর বন্ধুর বিখ্যাত বদ্‌মেজাজ তখন অর্থাভাবের তাড়নায় সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা ছিলো: 'অন্য সময় হলে কী যে করে বসতাম তা জানি না—কিন্তু তখন আমাদের টাকার ভীষণ দরকার, কাজ পেয়ে কাজ ছেড়ে দিতে পারি না, তাই'—বলেছিলেন সেই বন্ধুটি আমায়, বেশ মনে আছে।

তার পরদিনই তিনি নতুন করে বেশ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করে এঁকে নিয়ে ছবিটি ডাইরেক্টর বন্ধুকে দেখালেন। ডাইরেক্টর মহাশয়ের মুখে বিজয় গর্বের তৃপ্ত হাসি: 'ঠিক এই রকমটি চেয়েছিলাম। লাঞ্চ আওয়ারেই যাচ্ছি মিস্টার আর এর কাছে, তুমিও চলো আমার সঙ্গে।' মিস্টার আর এর কাছে দু'খানি ছবিই নিয়ে যাওয়া স্থির করলেন আর্ট ডাইরেক্টর মশায়।

ছবি দুটি নিয়ে একা প্রবেশ করলেন মিস্টার আর্ এর কক্ষে, চিত্রকর বন্ধু

ওয়েটিং রুমে বসে রইলেন উদ্বিগ্ন মনে।

মিস্টার আর্‌ জাতে বৃটিশ, তৈল কোম্পানির পাবলিক্‌ রিলেশন্‌ অফিসার। কিছুক্ষণ পরে আর্ট ডাইরেক্টর মশায় বেরিয়ে এলেন—চিত্রকরের প্রথম মূল ছবিটি মিস্টার আর্‌ দেখা মাত্রই পছন্দ করে নিয়ে রেখেছেন। দ্বিতীয়টি দেখেই ফেরৎ দিয়েছেন!—এবং মিস্টার আর্‌ চিত্রকরের সঙ্গে একা সাক্ষাৎ প্রার্থনা জানিয়েছেন তৎক্ষণাৎ।—এরপর অবশ্যি আর্ট ডাইরেক্টর মশায় তাঁর বন্ধুটিকে 'সাহায্য' করবার সুযোগ আর কখনো পান নি।

উপরোক্ত উদাহরণ দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার এই নয় যে আমার বক্তব্য: দালাল কোম্পানির আর্ট ডাইরেক্টর সবাই উপরোক্ত বিশেষ চরিত্রের ভদ্রলোকের মতোই দাম্ভিক, অজ্ঞ, অন্ধ। তাঁর বিপরীত চরিত্রও দেখেছি ঐ জগতে। কিন্তু বড়ো কথা এখানে এই যে দালাল=কোম্পানির চিত্রকরদের নিজস্ব স্বাধীনতা কারো থাকে না, থাকতে পারে না, থাকলে কোম্পানি চলে না। এবং অন্যদিকে—স্বাধীনতা না পেলে চিত্রকরের সকল গুণ সকল শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ বাধা পেয়ে বিকৃতির পথে যেতে বাধ্য হয়—চিত্রকরের ব্যক্তিত্বকেও বিকৃত করে ফেলে। চাকুরে চিত্রকর নিত্য নতুন পণ্যের নিত্য নতুন চটক বাড়াবার তাগিদে চিত্রকে পণ্যের অলংকারে, পণ্যের সেবাদাসত্বে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। আজ এ দেশের শত শত প্রতিভাবান চিত্রকর সেই গোলামি করছেন এবং চিত্রকে ক্ষণিক মূল্যের অবজ্ঞার পণ্যে পরিণত করছেন। এককালে এদেশেরই শত শত চিত্রকর ভাস্করেরা অমর সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে গেছিলেন, সানন্দে সভক্তিতে তাঁদের সকল শক্তির চরম সদ্‌ব্যবহার করে গেছিলেন সংঘবন্ধ ভাবে। আজকের চাকুরে চিত্রকরেরা চিরঅতৃপ্ত, এবং আর্ট ডাইরেক্টর ভিন্ন অন্যান্য চাকুরে, এমনকি স্বাধীন চিত্রকরেরাও আর্থিক দিক থেকেও চির অপরিতৃপ্ত। তাঁদের প্রতিভা ও শ্রমের নিঃসার ক্ষীণ প্রাণ ফসল কিনে বেচে দালালেরা মোটা অংকের টাকা ঘরে তুলছে, রাজ সুখে জীবন কাটাচ্ছে।

একথা সর্বজন বিদিত—বিজ্ঞাপনদাতা বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলি বিজ্ঞাপন খাতে বছরে ২ ৩ লাখ থেকে ৫/৭ লাখ টাকা অবধি খরচ করেন কোন না কোন দালাল=কোম্পানির মারফতে। এবং শুনেছি কিন্তু বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না যে ঐসব মোটা টাকার ক্লায়েন্ট্‌ পাকড়াবার জন্যে ক্লায়েন্টের কর্তা ব্যক্তিদের প্রচুর খোশামোদিসহ বড়ো বড়ো হোটেলে প্রচুর ব্যয়ে প্রচুর সুখাদ্য সুপানীয় এবং রমণীয় রমণীদের দ্বারা সম্যকরূপে আপ্যায়িত করা হয়। শুনেছি এসব উৎসবগুলি বিজ্ঞাপনজগতে ঘটলেও যথাসম্ভব প্রাইভেটলি সম্পন্ন হয়। এসব কেচ্ছা আমি দালালকোম্পানির নিম্নতর বেতনের চাকুরে চিত্রকরদের মুখে শুনেছি, তাঁরা আবার তাঁদের স্টুডিয়োর বয়দের মুখে শুনেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউ তা নিয়ে ঈর্ষা বা গ্লানি বোধ করেন না, বরং দেখেছি তাঁরা উৎফুল্ল চিত্তে বলেন: 'মোটা টাকার ক্লায়েন্ট্‌ পাকড়েছে আমাদের কোম্পানি অমুক বড়ো দালাল=কোম্পানিকে টেক্কা দেখিয়ে।' বোধহয় তারা পসার বৃদ্ধি বা বোনাস লাভের আশায় উৎফুল্ল হন। শুনেছি, বড়ো ক্লায়েন্ট্‌ পাকড়ানো উপলক্ষ্যে কোম্পানি

তার স্টাফদের কেক বিস্কুট চা বা কফি খাইয়ে আপ্যায়ন করেন। তাদের মতো একজন তরুণ চাকুরে চিত্রকর বলেছিলেন : 'সে সব কেক বিস্কুট আগের রাতের হোটেলের উৎসবের উচ্ছিস্ট। আমি দূর করে ফেলে দিয়েছিলাম ঘেন্নায় চা অবধি।'

কিন্তু, চাকুরে চিত্রকরদের ভাগ্যে যাই কেন না জুটুক আসল কথা, চিত্রকরদের প্রতিভা এবং শ্রম বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলবার জন্যই ঐ সব দালাল-কোম্পানিগুলি সৃষ্টি হয়েছে, চিত্র সম্পদ সৃষ্টি এবং চিত্রকরদের সমঝদারি পৃষ্টপোষকতার জন্যে তো নয়। বিজ্ঞাপনের ব্যবসা আর দশটা আইন-সঙ্গত ব্যবসার মতোই ব্যবসা।

আরেক বিষয়ে ঐ কোম্পানিগুলি চিত্রকরদের জোরের ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছেন। অর্থবলের জোরে তাঁরা ছবি আঁকার সকল সরঞ্জাম রসদ বাজার থেকে প্রায় চেটে পুটে কিনে নেন। এবং তাঁরা সবাই বাঁধা খদ্দের। তাঁদের হাঁকাই মেটাবার পর রং তুলি ইত্যাদি দোকানে কদাচিত বাকি পড়ে থাকে। একে তো, এদেশের আর্ট-মূর্খ সরকার ছবি আঁকার রং তুলি ও অন্যান্য শিল্প কাজের রসদকে ট্যাক্সের তালিকায় বিলাস-দ্রব্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, ফলে বিদেশী রং তুলি ইত্যাদির দাম আইনতই অগ্নি-মূল্য দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই। তারপর আমদানি ছাঁটায়ের ফলে পরিমাণও অসম্ভব কমে গেছে এবং অবাধ কালাবাজারি দেখা দিয়েছে। গত বিশ্ব যুদ্ধের সময়েও স্ক্যাপার বোর্ড ছিলো ৪৲ টাকায় ভারি এবং পুরো এক শীট, আজ তার এক-চতুর্থাংশ আয়তনের অতি হাল্কা শীটের দাম ২০৲/২৫৲ টাকা তাও প্রয়োজন মতো সংখ্যায় এবং প্রয়োজনের সময়ে বাজারে মেলে না। বিদেশী পোস্টার কালারের মুখ দেখা যায় না, গেলেও নিত্য তার দাম বেড়ে চলেছে, ভালো কাগজ, ক্যানভাস, তুলি দুষ্প্রাপ্য এবং অগ্নিমূল্য। যে পেলিকান ওয়াটার প্রুফ ড্রইং কালির দাম গত বছরেও ২৲/২৷৷ টাকা ছিলো আজ তা ৩০৲ টাকা এবং বাজারে পাওয়া যায় না, বিজ্ঞাপন দালাল-কোম্পানি থেকে চুরি করে কিনতে হয়, এবং তার তুল্য ভালো বাজারে কালি এদেশে আজও তৈরি হয় না—যা হয় তাতে সকল শ্রেণীর এবং উচ্চশ্রেণীর কাজ করা যায় না। লিনো কাট, উড্‌কাটের সরঞ্জাম, স্ক্যাপার বোর্ডের কলম, নানান পয়েন্টের ভালো নিব—কিছুই এদেশে আজও তৈরি হয় না বিদেশ থেকে কদাচিত কোনো দোকান আনেন যেন দয়া করে। —এই তালিকা সম্পূর্ণ করতে গেলে একটি পুস্তিকা লিখতে হয়। স্বাধীন চিত্রকর আজ রং তুলি ইত্যাদির দুর্ভিক্ষ গ্রস্থ। কিন্তু দালাল কোম্পানিদের স্টুডিয়োতে ছবি আঁকার রসদে কখনো ঘাটতি পড়ে না। শুনেছি, কদ্দুর সত্য তা জানি না, দরকার হলে তাঁদের রসদ প্রাইভেটলি হাওয়াই জাহাজেও বিদেশ থেকে তুরন্ত এসে পেঁছয়। তা তাঁরা অর্থবান সৌভাগ্যবান লোকবলে বলীয়ান—তাদের সুযোগ সুবিধা স্বভাবতই অসীম, তাঁদের কথা থাক আপাতত। দরিদ্র শিল্প-ছাত্রদের, সদ্য পাশ করা প্রথম পেশাদার শিল্পীদের এবং স্বাধীন অনির্দিষ্ট আয়ের পরিণত শিল্পীদের বিলাস-দ্রব্যের এবং কালোবাজারের দামে কাজের রসদ সরঞ্জাম কিনবার পয়সা কোথায়? একখানি ভালো কাজ বার করবার প্রস্তুতি পর্বে যে দীর্ঘকালব্যাপী স্টাডি, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং সাধনা করতে হয় তার

জন্যে বেঁচে থাকার খরচ এবং প্রচুর কাজের রসদ সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়—এবং সে সব রসদ সরঞ্জাম সাচ্চা উচ্চ শ্রেণীর না হলেই চলে না। এবং তেমন ভালো রসদ সরঞ্জাম যদিই বা বাজারে আজ মেলে তার যা দাম দিতে হয় সে দামের টাকা একখানি ভালো কাজ বেচে তোলা দৈবের কৃপা না থাকলে সম্ভব হয় না—তাও কতো বছরে বিক্রি হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই—বিক্রি হবেই তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এদেশে আজও সখ করে বহুমূল্য দিয়ে দেশী শিল্পীর মৌলিক কাজ কেনার মতো শিল্প-প্রেমিক ধনীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। শুধুমাত্র ঘটা করে বছরে একবার মাত্র কয়েকজন শিল্পীকে সরকারি আর্ট আকাদামি যে অর্থ পুরস্কার ও মানপত্রাদি দান করেন তাতে সরকারের আত্ম গৌরব বৃদ্ধি হতে পারে এদেশে চিত্রচর্চার প্রসার এবং সুযোগ সুবিধা কিছুই বর্তায় না। বেশির ভাগ—শত শত শিল্পী দুর্দশার তিমিরে ডুবে থাকেন—ব্যবসায়ীদের গোলামিতে আত্ম-সর্বস্ব সমর্পণ করতে বাধ্য হন।

স্বদেশে আজও যে সব রং তুলি ইত্যাদি পয়দা হয় তা বড়ো জোর শিশুদের খেলায় লাগতে পারে, কোনো স্থায়ী মূল্যবান শিল্প সম্পদ সৃষ্টি সে সব দিয়ে করা অসম্ভব। এদেশে আজও ভালো পেন্সিল বা প্যাস্টেল তৈরি হয় না যা নাকি বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, জাপানী সামগ্রীর পাশে দাঁড়াতে পারে। বহু-প্রয়োজনীয় ড্রইং কাগজ যা পাওয়া যায় তা ব্লটিং কাগজের তুল্য। তুলি ভিজলেই পেথম ছড়ানো ন্যাতা বা ঝাড়ু। এ হেন দুরবস্থায় বিদেশী পেশাদারি কাজের উপযোগী শিল্পকাজের রসদ সরঞ্জামের দাম বাড়িয়ে দিলে, আমদানি কমিয়ে দিলে এবং দালাল কোম্পানিদের প্রায় একচেটে অধিকার দিলে এদেশের শিল্পীদের সর্বনাশ সাধন করা হয়, শিল্পচর্চাকে ব্যাহত করা হয়। আজও এদেশের যন্ত্র শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্যে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানি করলে যদি এদেশের যন্ত্রোৎপাদনের ক্ষতি না হয় তবে বিদেশ থেকে শিল্পীর একান্ত প্রয়োজনীয় রসদ সরঞ্জাম সব আমদানি করলে স্বদেশে সে সব তৈরি করার পথে কেন বাধা সৃষ্টি হবে? বরং বিদেশী মালের সঙ্গে পাল্লা দেবার সুস্থ প্রতিযোগিতায় দেশী মালের উৎকর্ষ দ্রুততর বৃদ্ধি পাওয়াই তো স্বাভাবিক। স্বদেশে যেদিন পেশাদারি কাজের উপযোগী শিল্পকাজের রসদাদি প্রস্তুত হবে সেদিন দেশের কোনো শিল্পীই বিদেশী মালের প্রয়োজন বোধ করবেন না।

আজ সরকারের আশু কর্তব্য—প্রথমত শিল্পকর্মে প্রয়োজনীয় রসদ সরঞ্জামাদিকে বিলাস দ্রব্যের পাংক্তেয় করা নাকচ করে তার দাম কমানো; এবং সেই সঙ্গে স্বদেশে উচ্চ-মানের এবং প্রচুর পরিমাণে শিল্প-সরঞ্জাম রসদাদি স্বদেশে যাতে সত্বর প্রস্তুত হয় তার জন্য যথা বিহিত করা; দ্বিতীয়ত—যথেষ্ট পরিমাণে উৎকৃষ্ট রসদ সরঞ্জামাদি অবাধে বিদেশ থেকে আমদানি করতে দেওয়া; তৃতীয়ত যতোদিন উচ্চমানের শিল্পসামগ্রী স্বদেশে তৈরি না হয়—বিজ্ঞাপনের দালাল-কোম্পানিগুলি ও অন্যান্য অর্থবলে বলীয়ান স্টুডিয়োগুলির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ শিল্প-রসদ-সরঞ্জাম আইন করে বেঁধে দেওয়া। এক কথায় শিল্পীদের আর্থিক দুরবস্থার কথা মনে রেখে এবং তাঁদের কাজের প্রয়োজনের

দিকে লক্ষ্য রেখে শিল্প-রসদ-সরঞ্জাম সরবরাহের বিধি ব্যবস্থা করা, আজ সরকারের জরুরি এবং গুরু দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য।

এ দেশের শিল্পীদের অর্থভাগ্য আজ সৌভাগ্যে পরিণত হতে পারে যদি এদেশের ধনী বিজ্ঞাপনদাতারা সরাসরি শিল্পীদের ডেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেন, যে টাকার মোটা অংক দালালদের তুলে দেন সে টাকা যদি শিল্পীরা পায় তবে এ দেশের শিল্পী ও শিল্পের অশেষ কল্যাণ হয়। এ দেশে আজ বিজ্ঞাপনদাতারাই শিল্পীদের সর্বাপেক্ষা বড়ো এবং সংখ্যায় বেশি পৃষ্ঠপোষক। তাঁরা যদি শিল্পীদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেন তাঁরা যতো উচ্চমানের কাজ শিল্পীদের কাছ থেকে পেতে পারেন তেমন দালালদের মারফতে পাওয়া অসম্ভব। এবং উচ্চমানের কাজ বিজ্ঞাপনে ব্যবহার হলেও দেশবাসীর শিল্পরুচি ও সুস্থ ও উন্নতস্তরে থাকতে পারে।—কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতারা আজ যে ভাবে সবাই দালাল-নির্ভর তাঁরাও প্রকারান্তরে দালালদের দয়া এবং রুচির অনুগত বৈ আর কিছু নয়। এবং দালালেরা যে ভাবে নানা রকমে তাঁদের ভর করে আছেন তা থেকে নিজেদের মুক্ত করাও তাঁদের পক্ষে খুব সহজ সাধ্য নয়। যাই হোক, অচিরে যে বিজ্ঞাপনদাতাদের হৃদয় বুদ্ধির পরিবর্তন হবে—রুচির পরিবর্তন সত্বেও—এবং শিল্পী প্রেম ও শিল্প-সৌন্দর্যপ্রীতি দালাল-মুক্ত হবে তা আশা করা খুবই সম্ভব। সূর্য পশ্চিমে উদয়ের আশার মতোই মূর্খ অলীক আশা।

তবু তরুণ শিল্পীদের হতাশ হবার কারণ নেই বলেই আমি মনে করি। নিজেদের প্রাণ, প্রতিভা এবং শিল্পচর্চা ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আর শিল্পের উচ্চমান বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তারা যদি দালাল ও দলাদলি এড়িয়ে সংঘবদ্ধ হতে পারেন এবং সরাসরি বিজ্ঞাপন দাতাদের অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে পারেন—তবেই তাঁদের ভাগ্য ফিরবে। কয়েকজন শিল্পী মিলিত হয়ে ছোটো ছোটো সমবায় সংঘ এবং সকল সমবায় মিলে বড়ো এক সংঘে তাঁরা যদি মিলিত হতে পারেন, বিজ্ঞাপনদাতাদের সকল কাজ সুরুচি সম্মতভাবে সরবরাহ করতে তো পারবেনই, সে সব কাজের পরেও তাঁদের সকলেরই স্বাধীনভাবে শিল্পানুশীল শিল্পচর্চা ও সৃষ্টির কাজে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সুযোগ মিলবে অপারসীম। এমন দিন তাঁরাই সংঘবদ্ধভাবে আনতে পারেন যেদিন পেশাদারি চিত্রকর শিল্পী হয়ে আর দালালদের গোলামী কারোকে করতে হবে না, বিজ্ঞাপনের জগতেও সত্যিকারের স্বদেশীয়তা এবং রেভোলিউশন আনতে পারবেন তাঁরা। সংঘবদ্ধ শিল্পীদের মধ্যে সানন্দ প্রতিযোগিতা দেখা দেবে, নানান সুস্থভাবের চিন্তার আদান প্রদান হবে, এদেশের বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও নিত্য নতুন স্থায়ী মূল্যের শিল্প সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে, সমাজে বিজ্ঞাপন শিল্পের সম্মানিত স্থান লাভ হবে। এবং তখনই শিল্পীদের পক্ষে 'মাস্টার পীস' সৃষ্টি করে জগদ্বিখ্যাত হবার অশেষ সুবিধা মিলবে। আমার মনে হয় আজ ঐতিহ্যময় এ দেশের শত শত প্রতিভাবান শিল্পীদের পক্ষে প্রাচীনদের 'সংঘং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্র গ্রহণ ছাড়া নিজেদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভার সম্পূর্ণ এবং সুস্থ সদ্ব্যবহারের—এমন কি মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার জন্যেও নানা পন্থা।

আমাদের প্রাচীনেরা তাঁদের সংঘবন্ধ জীবন ও কর্মের দ্বারা যে সব অমর সৌন্দর্য সৃষ্টির নিদর্শন এদেশের সর্বত্র তীর্থে তীর্থে রেখে গেছেন তার গৌরব আজ আমাদের শিল্পীদের একমাত্র এবং অক্ষয় পাথেয় করে জীবনে গ্রহণ করতে হবে তবেই আমাদের শিল্পী জীবন সার্থক করতে পারবো। বিজ্ঞাপন দালালের স্টুডিয়োতে বহু টাকার গোলামি করেও সে সার্থকতা কোনোদিনই লাভ করা সম্ভব হবে না—'হুজাম' হয়ে চিত্রবিদ্যার 'মাথা মুড়িয়েই' শিল্পী জীবনের অপচয় শিল্পীকে স্বচক্ষে দেখে যেতে হবে আজীবন, আর দেখে যেতে হবে শিল্পের - ক্রমশ নিম্নস্তরে অধঃপতন ও অপচয়। এবং একদিন শিল্পী ও তাঁর শিল্পও বিজ্ঞাপন জগত থেকে শূন্য পাত্রের মতো জঞ্জাল হিসেবে পরিত্যক্ত হওয়াও আশ্চর্য নয়। আমেরিকার বিজ্ঞাপনের কাজ আজ বেশিরভাগই ফোটোগ্রাফের দ্বারা সাধিত হচ্ছে—সে কথা আজ লক্ষ্য না করে উপায় আছে কি? □

কলিকাতা
অগষ্ট ১১, ১৯৬৬

গুহাচিত্র

ভারতবর্ষে আর্যজাতির আগমনের পূর্বে দ্রাবিড় জাতির আগমন ঘটে ; এই দ্রাবিড়ীদের পূর্বে যারা ভারতবর্ষের অধিবাসী ছিল তাদের পৌরাণিক নাম 'নিষাদ'। আধুনিক কোল, সাঁওতাল, হো, ওঁরাও প্রভৃতি জাতি এই নিষাদ জাতির বংশধর।

অনুমান পনর হাজার বৎসর পূর্বেও এই 'নিষাদ'গণ ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাস করেছে ; তাদের তৈরি বহু বহু পাথরের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গেছে বিন্ধ্যগিরির বহু গুহায়। তখনো মানুষ শস্যের ব্যবহার জানে নি, পশু মাংস অর্ধ দগ্ধ করে সেই খেয়ে জীবন ধারণ করত ; ঘর বাড়ি তৈরি করতে জানে নি, পার্বত্য গুহার আশ্রয়ে বর্ষাকালে দলবেঁধে কাটিয়ে দিত, আর অন্যান্য কালে তরুতলে কিংবা পাহাড়ের গায়ে ; পাত্রাদি তৈরি করতে জানত না, নদী আর ঝরণার কাছাকাছি জায়গায় থাকত যেন পিপাসার জল হাতের কাছে পায় ; বস্ত্র বয়ন জানত না, পশুর চর্মে শীত নিবারণ করত। পাথর ছুঁড়ে বা পাথরের বল্লমে শিকার ভিন্ন আর কোনো কাজই যখন মানুষের জানা হয়নি, তখনও মানুষ ছবি আঁকতে জানতো! পনর হাজার বছর আগে আঁকা বহু চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে দাক্ষিণাত্যে, বিন্ধ্য ও নীলগিরি পার্বত্যমালার বহু গুহাগাত্রে। বেল্লারী জেলার কাপ্‌গাল্লু গুহায় পাওয়া গেছে পাখী পশু মানুষের ছবি ; কালিকট থেকে প্রায় ৫৬ মাইল দূরে, উইনা আদ-এর এড্‌কাল গিরি গুহায় দেখা গেছে মানুষ এবং পশুর ছবি তার সঙ্গে স্বস্তিকা চিহ্নের মত চিহ্নও আঁকা দেখা যায় কয়েক জায়গায়, কতকগুলো লোক নাচ্ছে, মুখোস আর মাথায় টোপোর আঁটা তাদের বোঝা যায় ; বোধহয় কোনো পূজা পার্বনের ব্যাপার ছবিতে আঁকা হয়েছিল। সিংভূম জেলার ঘাটশিলা সহরের কাছে মৌভাণ্ডার গাঁয়ে কতকগুলি পাথরের গায়ে খোদাই করা ছবি আবিষ্কৃত হয়েছে ; বিরাট আকারে আঁকা মানুষের ছবি, যেন কোনো বিশেষ এক উদ্দেশ্যে আঁকা হয়েছিল, এখন উদ্দেশ্য বোঝা যায় না কিন্তু দেখবার মত সে ছবির সহজ অথচ সবল রেখার ভঙ্গীগুলি। কাইমুর গিরিশ্রেণীর প্রায় বিশ মাইল স্থান জুড়ে বহু গুহাগাত্রে আরো অনেকগুলি ছবি দেখা যায়, সে সব ছবির বয়স পনর হাজার বছরেরও বেশি, হয়ত বিশ হাজারও হতে পারে ; মির্‌জাপুর জেলার ভালডুরিয়া গুহায় বড় বড় শিংওয়ালা হরিণ শিকারের ছবি আঁকা হয়েছিল ; শিকারীর হাতে পাথরের বল্লম ; লোহ্‌রি গুহায় দেখা যায় বাঘের সঙ্গে মানুষের লড়ায়ের ছবি ; শোন নদের উপত্যকায় লিখুনিয়া পাহাড়ের গায়ে আছে এক শিকারী হরিণ শিকার করছে, ঘোড়্‌মানগড় গুহায় গণ্ডার শিকারের ছবি, ছজন শিকারী ভীষণ ভাবে আক্রমণ করছে জন্তুটাকে, কেউ

গণ্ডারের শিংয়ের গুঁতোয় উলটে পড়েছে, কেউ পেছন থেকে ছুটে এসে বল্লম ছুঁড়ছে, একজনের মাথায় প্রকাণ্ড এক পালক গোঁজা সে বোধহয় সর্দ্দার। এই রকমের গণ্ডার শিকারের ছবি আরো অনেক জায়গায় পাওয়া গেছে ; বুরহুর্ পরগণার রৌপ গ্রামের কাছে ; বিদ্জেইগড়ের কাছে হরিণহরণা গুহায় ; আরো অনেক গুহায়। আজকাল সে সব অঞ্চলে গণ্ডার দেখা যায় না, তবে পনর বিশ হাজার বছর আগে যে বিন্ধ্য আর নীলগিরির বনে গণ্ডারের আধিপত্য ছিল তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়।

বিন্ধ্য পর্বতের বেলেপাথরের গায়ে লাল রঙে আঁকা ছবি বেশির ভাগই শিকার অভিযানের বর্ণনা। এছাড়া আরো নানান্ বিষয়ের বর্ণনা, সেই বন্যজীবন যাপনের যুগের মানুষের নানান্ কাজের আভাষ আমরা পাই বিশেষভাবে মধ্যপ্রদেশের রায়গড় রাজ্যের অন্তর্গত সিংহনপুর গ্রামের কাছে কতকগুলি পর্বতগুহায়। বি এন রেলওয়ের নাহারপালি নামে একটি ছোটো স্টেশনে থেকে এক ক্রোশ উত্তরে ঐ পর্বতগুহাগুলি ; ১৯১০ খৃঃ অব্দে সি. ডবল্উ. এণ্ডারসন নামে এক বিজ্ঞ রেলওয়ে অফিসার এই গুহার চিত্রগুলি আবিষ্কার করেন ; তার কয়েক বছর পরে সদলবলে তিনি এবং কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল পার্শি ব্রাউন্ সে ছবিকে বিশেষভাবে পরখ করতে যান ; ফিরে এসে পার্শি ব্রাউন্ যে প্রবন্ধ লেখেন সে সব ছবি সম্পর্কে তা থেকে জানা যায় যে, ছবি আঁকার জন্য বিশেষভাবে পাথরের গায়ে কিছু লেপে নেওয়া হত না ; স্বাভাবিক পাথরের গায়ে কঞ্চির আগা থেঁতো করে দাঁতনের মত তুলি দিয়ে লাল রংয়ের মোটা মোটা রেখা টেনে ছবি আঁকা হোতো ; সে লাল রং লোহার খোয়া থেকে বার করা হোতো ; রং কিসে গোলা হোতো তা বোঝা আজ আর যায় না তবে বোধহয় পশুর চর্বিতে গুলে তারপর ব্যবহার করা হোতো। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার গুহার সবচেয়ে অন্ধকার যে দিকটা সে দিকেই ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল সেই অতি আদিম চিত্রশিল্পীদের ; শুধু তাই নয়, মানুষের নাগালের বাইরে অনেক উঁচুতেই বেশির ভাগ ছবি আঁকা হয়েছে ! শিকার অভিযানের বর্ণনা ত আছেই, আর আছে হিএরোগ্লিফিক্স্ বা চিত্র দিয়ে লেখা ভাষা, স্বতন্ত্র জীব জন্তু কুমীর প্রভৃতি। ছবিগুলির বেশির ভাগই এক রং দিয়ে আগাগোড়া ভরা, শিলুয়েট ; নাক মুখ চোখ নাই, শুধু পা থেকে মাথা অবধি দেহের একটা ভঙ্গি, এই ভঙ্গিমার রীতিতে বেশির ভাগ মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে ; কোনো কোনো পশুর ছবিতে গায়ের চামড়ার রেখা, কোনো কোনো মানুষের গায়ে মইয়ের মত কতকগুলি দাঁড়ি টানা ; কিন্তু চোখ মুখ নাক কান নাই ; শিং বা পশুর কান আর সর্দ্দারের মাথার টোপোর, শিকারীদের পরণে ঠেঁটি একটুকরো চামড়া, এসব বেশ স্পষ্ট ; মানুষগুলিকে বেশির ভাগই পেছন দিক থেকে দেখে আঁকা, পশুগুলি পাশ ফেরানো ; কুমীর বা গিরগিটির পিঠের দিক ওপর থেকে দেখে আঁকা।

'দেখে আঁকা' বল্লে ভুল বলা হয় এসব ছবিকে ; আদিম চিত্রকর কোনো কিছুই চোখের সামনে রেখে তা দেখে দেখে নকল করে আঁকে নি ; মনের থেকে, স্মরণ থেকে এঁকেছে। ছোটো ছেলেমেয়েরা যেমন মন থেকে যা কিছু আঁকে তা দেখে আসল বস্তুর

আভাষ পাওয়া যায় তবু আসল বস্তুর সঙ্গে সে ছবির হুবহু মিল পাওয়া যায় না, আদিম শিল্পীর ছবি—বিশেষভাবে ভারতবর্ষে—তেমনি আভাষমূলক ; এসব ছবিতে শিল্পীর মনের ছাপটাই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ফুটেছে ; শিল্পী মানুষের ছবি আঁকবে বলেই মানুষের ছবি আঁকে নি, এঁকেছে মানুষের বীরত্বের ছবি, পশু শিকারে মানুষের কীরকম সংগ্রাম করতে হয়, সেই সংগ্রামের এক বর্ণনা ; সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে মানুষকে আঁকতে হয়েছে বলেই যত সহজে পেরেছে মানুষের মত একটা আকার ভঙ্গীমার রীতিতে এঁকেছে ; যদি একা মানুষটার ওপর তার নজর থাকত, যদি তার সর্দারের চেহারাটা আঁকাই তার উদ্দেশ্য হোতো তবে সে তার চোখ মুখ আঁকার চেষ্টা করত, সে চেহারা নিখুঁত করে আঁকার দিকে নজর দিত ; এখানে নিখুঁত মানুষ আঁকার কোনো চেষ্টা নেই ; শিল্পীর মন এখানে শিকারীর ভীষণ সংগ্রামের কল্পনাতেই ব্যস্ত।

স্পেন আর ফ্রান্সের নানান গিরিগুহায় যে সব চিত্র বেশির ভাগই পশুচিত্র—দেখা যায় সে চিত্র ভারতবর্ষের গুহাচিত্রের তুলনায় হাজার গুণ নিখুঁত ; বাইসনের ছবি এঁকেছে আদিম স্পেনের চিত্রকর, দেখে মনে হয় জন্তুটাকে যেন চোখের সামনে জীবন্ত দেখছি ; সে ছবিতে চিত্রকরের নজর নিজের মনের দিকে নয়, মনের বাইরে জন্তুটার দিকে ; আসল বাইসনকে সে চিত্রকর তন্ন তন্ন করে দেখেছে তারপর এঁকেছে বাইসনের ছবি ; কিন্তু ভারতবর্ষের আদিম চিত্রকর গণ্ডার বা মানুষকে ভাসা ভাসা ভাবে দেখেছে, তার দেখার বস্তুগুলোর মধ্য থেকে সে পেয়েছে নিজের মনের মধ্যে যে সব ভাবের প্রেরণা, সেই প্রেরণার বশেই সে ছবি এঁকেছে।

কিন্তু তাই বলে ভারতবর্ষের আদিম শিল্পী যে স্পেন বা ফ্রান্সের আদিম শিল্পীর চেয়ে ছবি আঁকায় কাঁচা হাতের পরিচয় দিয়ে গেছে তা নয় ; তফাৎটা আঁকার ক্ষমতার নয় ; ভারতবর্ষের শিল্পীর ছবির ভঙ্গীর মধ্যে তুলি ধরার যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় ও দেশের আদিম শিল্পীর তুলনায় সে ক্ষমতা সমান ওস্তাদিরই পরিচয় দেয় ; তফাৎ শুধু দৃষ্টির, তফাৎ শুধু শিল্পীর মনের ; ভারতবর্ষের শিল্পী ছবি আঁকার সময়ে বাইরের বস্তু বিশেষের দিকে মন দেয় নি, মনের খেয়াল যা গেছে তাই এঁকেছে নিপুণ হাতে ; জাপানীদের ছবির মত এক আধটানে তার ভাব ফুটেছে ; অবিকল মানুষের মত' না হয়েও তার আঁকা মানুষের ছবি জীবন্ত, সুন্দর ; তার ছবি শুধু পশু বা মানুষের নিখুঁত ছবি নয়, শিকারের ছবি, ভীষণ সংগ্রামের ছবি, কোথাও বা নাচের ছবি, আনন্দে উল্লসিত মানুষের অনুভূতির ছবি ; স্পেন বা ফ্রান্সের আদিম শিল্পীর ছবি তা নয় ; সে ছবিতে জীবন্ত একটা পশুকেই শুধু হুবহু এঁকে রাখার চেষ্টা হয়েছে ; তুলির কসরতে ওস্তাদি, নিখুঁত কারিগরীর পরিচয় দিয়েছে তারা ; পশুর গায়ের চামড়ার প্রত্যেকটি ভাঁজ, এমন কি প্রত্যেকটি রোঁয়া পর্যন্ত স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা দেখি সে ছবিতে ; এখানে শিল্পীর নিপুণতার ওপর যত জোর দেওয়া হয়েছে, শিল্পীর খেয়ালের ওপর তত নয় ; ভারতবর্ষের আদিম শিল্পীর খেয়াল তার নিপুণতাকে ডিঙিয়ে গেছে, কষ্ট করে সবটা না এঁকেও সবটাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আভাষে, ওদের

শিল্পীর ছবিতে তার খেয়ালের সেই আবেগের কোনো পরিচয় নেই।

নৃতত্ত্বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন আজকাল আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় আর ভারতবর্ষে যাদের নিগ্রো, বুশম্যান, কোল, সাঁওতাল, হো জাতি বলে জানি তারাই পৃথিবীর আদিমতম শিল্পীদের বংশধর। এদের শিল্পকলা আজও সেই প্রাগৈতিহাসিক স্তর পার হয়ে বেশিদূর এগোতে পারে নি; কিন্তু নিগ্রো, বুশম্যান বা সাঁওতালরাই পৃথিবীর আদিমতম শিল্পীদের একমাত্র বংশধর নয়; সেই আদিম উৎসগুলির আরো অনেকগুলি ধারা পরবর্তী যুগের বড়ো বড়ো সভ্যতার মধ্যে উন্নততর শিল্পের ফসল ফলিয়েছে; ফ্রান্স ও স্পেনের আদিম শিল্পীদের মধ্যে একদলকে জানি আফ্রিকার অরণ্যবাসী নিগ্রো নামে, অন্য আরেক দল আফ্রিকার সেই দুর্গমে প্রবেশ না করে নীলনদের উপত্যকায় যে সভ্যতার মধ্যে আপনাদের শিল্প নৈপুণ্যকে নতুন এক রূপে বিকশিত করেছিল সে সভ্যতার নাম মিশরীয় সভ্যতা; মিশরের শিল্পী আদিম শিল্পীর বংশধর কিন্তু আদিম শিল্প পদ্ধতিকে সে নতুন এক পদ্ধতিতে পরিণত করে গেছে।

তেমনি ভারতবর্ষেও ঘটেছিল; অনেকে বিশ্বাস করেন, গুজরাট আর বাংলা দেশের মানুষের মধ্যে সেই আদিমতম ভারতবাসীর রক্ত, সভ্যতা, এমনকি শিল্পরীতি আজও বিদ্যমান্, তবে নানান পরিবর্তন ও বাইরের নানান্ প্রভাবে সে রক্ত, সে সভ্যতা, সে শিল্পরীতিকে আজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ভিন্ন বোঝা শক্ত। গুজরাট এবং বিশেষভাবে বাংলাদেশে আল্পনা নামে এক রীতির ছবি আঁকা আছে, সে রীতি সরাসরি আদিম শিল্পীর রীতি; এমন কি যে সব ব্রত বা পুণ্য অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই আল্পনা সংশ্লিষ্ট তা-ও আমরা উত্তরাধিকারী সূত্রে আদিমতম বন্যজাতির কাছ থেকে পেয়েছি; আর্য বা দ্রাবিড়ীরা বাঙ্গালী আর গুজরাটির পিতৃপুরুষ নন্; তাঁদের কাছ থেকে যা পেয়েছি তার সঙ্গে আমাদের আপন পিতৃপুরুষের দান আজও নিঃশেষে মিশিয়ে যায় নি; অন্ততঃ ছবি আঁকার বিদ্যা। ছোটোনাগপুরের হো জাতির সাঁওতাল আর সিংহলে বেদ্দা বাঙালীর আপন ভাই বলা চলে শিল্পী হিসাবে; আল্পনা যেমন মেয়েদের একচেটে বাংলায় আর গুজরাটে, হো, সাঁওতাল প্রভৃতিদের আল্পনার কাজ আর কুটিরগাত্রচিত্রন্ও তেমনি মেয়েদের নিজস্ব কাজ; এ ব্যাপার দেখে শুনে অনেক পণ্ডিত মনে করেন আদিম শিল্পীও হয়ত মেয়ে ছিলেন; হতেও পারে, নাও হতে পারে; আমার মনে হয় যে সব ব্রত আজ মেয়েরা করেন তা আদিমযুগে সমাজের সাধারণ ধর্ম ছিলো; অবশ্য আজকের ব্রতরূপটা সে ধর্মে ছিল না, থাকা সম্ভব নয়; নাচের কোনো কোনো ভঙ্গি, গানের কোনো কোনো ভাব, অনুষ্ঠানের কোনো কোনো আচরণ যেমনটি পনর হাজার বছর আগে ছিল এখন তেমনি আছে; আল্পনার কোনো কোনো নক্সা বিশেষ হয়ত সামান্য একটু অন্যভাবে ব্যবহৃত হোতো। এখন, সেই ধর্ম পুরুষ মহলে অচল হয়ে পড়তে লাগল ততই যতই সে মহলে বহির্জগতের প্রভাব আসতে লাগল, কিন্তু মেয়ে মহল পৌরুষের ক্ষেত্রের বাইরে থেকে নতুনকে গ্রহণ করার মতো বুদ্ধির অভাবে পুরানোকে আঁকড়ে রইল; ক্রমশঃ পুরুষের মধ্যে হয়ত শিল্পচর্চা নতুন রূপে দেখা দিল নয়ত

একেবারে বিদায় নিল।

আল্‌পনা আর ব্রত অনুষ্ঠানের উৎসের অন্য কোনো সন্ধান পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত ওপরের কথাগুলি মেনে নিতে আপত্তি নেই ; বিশেষভাবে ভাষা, মানুষের মূর্তি, সামাজিক কোনো কোনো রীতি-নীতি যখন অনার্য নিষাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ করেছে তখন আল্‌পনাটাও যে তাদের কাছ থেকে পেয়েছি, ভাষা আর গায়ের রক্তের সঙ্গে সঙ্গে, তা স্বীকারে অগৌরবের কিছু নেই, গৌরবেরই বিশেষ কিছু আছে : আমরা অনার্য, তাই ভারতের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী আমরাই ; আর্য-দ্রাবিড় এরা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে মাত্র।...

পুরাতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মত এই যে, ছবি বস্তুটা আদিম মানবসমাজে ধর্মানুষ্ঠানের একটা বিশেষ অঙ্গ ছিল, মেঝেয় আল্‌পনা দেওয়াটা যেমন আজকালও তাই বলে গণ্য করা হয়। ছবিকে গিরি গুহার গভীরতম বা উচ্চতম প্রদেশে আঁকার কারণটা ঐ বলে মনে করেন তাঁরা, আর ভারতবর্ষের গুহাচিত্রগুলির বেশির ভাগই যদিও শিকারের, স্পেনের এবং ফ্রান্সের ছবিগুলি বেশির ভাগই একক পশুর বা পশুজীবনের স্বতন্ত্র ছবি। মানুষের সঙ্গে সেসব পশুর যেন কোনো সংস্রব নেই ; যেখানেই মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে পশুকে বাদ দেওয়া হয়েছে ; এ থেকে আরো স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে শিল্পীর ব্যক্তিগত মনের খেয়ালে না হয়ে সমাজের ধর্মবিশ্বাসের প্রেরণাতেই ঐ সব ছবি আঁকা হয়েছিল ; এখনো আদিম নিষাদ জাতির বন্য বংশধরেরা ছবি আঁকাকে ধর্মানুষ্ঠান বলেই জানে এবং বিশেষ কয়েকটি বিষয় ভিন্ন অন্য কিছু তারা আঁকে না ; সে বিষয়গুলি তাদের চিরাচরিত 'ধর্মশাস্ত্রে'র দ্বারা অনুমোদিত।

প্রাগৈতিহাসিক বর্বরের 'সভ্যতার' যা কিছু আজও আফ্রিকায় অবশিষ্ট আছে, জর্মান অজ্ঞাতদেশ-সন্ধানী ও নৃবিজ্ঞানী লিও ফ্রোবেইউস্ তা আজ সভ্য জগতের সামনে টেনে এনেছেন বহু শ্রম ও বহু দুঃখ সহ্য করে ; তিনি ইউরোপে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে 'যেসব বর্বর সভ্যতা' পৃথিবীতে মানুষের পরিচয়কে পশু পরিচয়ের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল, সেসব 'সংস্কৃতির মধ্যে সারবস্তু আর প্রাণসম্ভার নিশ্চয় প্রচুর ছিল। আর সেসব 'সংস্কৃতি'র যদি মৃত্যু না ঘটে থাকে তবে তারা স্থান পরিবর্তন করেছে, কারণ ইউরোপে তাদের কোনো চিহ্ন আর নেই।' তাঁর এই ধারণা অন্যান্য নৃবিজ্ঞানীদের থেকে ভিন্ন কারণ তাঁরা মনে করতেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মৃত্যু ঘটে গেছে ; আর সে যুগের শবের ওপর নূতন যুগ গড়ে উঠেছে! লিও ফ্রোবেইউস্ ক্রমশঃ প্রমাণ করলেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ মরে নি শুধু ইউরোপ ছেড়ে গেছে আফ্রিকায় ; তাদের এই যাওয়ার পথের চিহ্ন আবিষ্কার তিনিই করলেন সাহারা এ্যাট্‌লাস আর লিবিয়ার মরুভূমে ; এই দুই মরু সেই সুদূর যুগে অরণ্য ছিল। আজ আফ্রিকার সুদান প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতায় সভ্য নিষাদরা পাথরের গায়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের রীতিতে ছবি আঁকে। লিও ফ্রোবেইউস্ এমন সব মানুষ দেখে এসেছেন যারা শিকারে যে পশুকে বধ করার আশা করে ছুটেছিল (কিন্তু আশা পূর্ণ হয়

নি) সে পশুর ছবি বালির ওপর আঁকে তারপর তীর দিয়ে সে ছবিকে বিন্ধ করে। আর এক জাতের মানুষ শিকারে নিহত পশুটাকে নিয়ে এমন সব কাণ্ড করে যার মানে হোলো পশুটাকে বুঝিয়ে দেওয়া যে সে সত্য সত্যই মরে নি; কোথাও বা রক্তমাংসের পশুর অভাবে পশুর পুতুল গড়ে সে পুতুলের গায়ে একটা শুকনো চামড়া পরিয়ে দিয়ে ঐ 'বুঝ্' দেওয়ার কাণ্ড সারা হয়। মূর্তিপূজা আর কার নাম? ভাস্কর্যের গোড়া-পত্তনের খবরও কি এখানে পাওয়া গেল না?

ভারতবর্ষের নীলগিরি পর্বত শ্রেণীর প্রাগৈতিহাসিক অনেক গুহায় মাটির তৈরি অনেক পশুর পুতুল পাওয়া গেছে; আকারে খুবই ছোটো ছোটো হলেও, ওগুলি রচনার উদ্দেশ্য সুদানের পূজারীদের মতই বড়ো; মনোভাব মূলত সব দেশেই এক, কারণ সব দেশেই মোটামুটি একই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষকে আপন জীবনকে গড়ে তুলতে হয়েছিল।

আফ্রিকায় হামুরাবি পর্বতশ্রেণীতে লিও ফ্রোবেঁইউস্ আর এক জাতের সন্ধান পেলেন যারা বিশেষ এক ধর্মানুষ্ঠানের সময়ে সোজা চলে যায় পাহাড়ের ওপর, গিয়ে লাল আর সাদা রং দিয়ে মানুষ পশু আর নানান্ তাবিজের ছবি এঁকে আসে; সেসব ছবি 'শাস্ত্রীয়' অনুশাসনের রীতি মেনে আঁকা হয়, যেমন আমরা পুজোর ঘটের গায়ে শাস্ত্রীয় রীতিতে মানুষ আঁকি, স্বস্তিকাচিহ্নের মতো গোটা কয়েক রেখা দিয়ে।

ভারতবর্ষের 'নিষাদ' সমাজে আজও ছবি আঁকা হয়ে থাকে কিন্তু তা তাদের ধর্মানুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ হিসাবে আঁকা হয় কিনা সে খবর এখনো সন্ধানে পাওয়া যায় নি; কারণ তা পাওয়া সহজ নয়; ভারতবর্ষের নিষাদেরা আফ্রিকান্‌দের মতো বহির্জগতের সকল সংস্রব-বর্জিত-প্রদেশে আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে নি; বাইরের প্রভাব এদেশের নিষাদের অন্তরে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে যুগে যুগান্তে; তবু তাদের ছবি আঁকার রীতিতে এখনো প্রাগৈতিহাসিক রীতির ছাপ বেশ স্পষ্ট আছে, এই শুধু আজ বলা চলে।

আরো এক কারণে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সঙ্গে এ যুগের নিষাদদের সম্বন্ধ চাক্ষুষ পাওয়া দুষ্কর। গুহাজীবন, যেমন আফ্রিকায় আজও সম্ভব, ভারতে তেমন নয়; গুহা ছেড়ে এদেশের নিষাদদের সমতলে কাঠখড়ের ঘর বাঁধতে হয়েছে বহু যুগ পূর্বেই; আর সেই ঘর ভেঙে অবিরাম স্থান পরিবর্তন করে বেঁচে থাকতে হয়েছে—বাইরের থেকে নিরন্তর তাড়নায়, নিত্য নূতন জাতির অভ্যুদয়ে ছবি আঁকার ক্ষেত্র বারবার শত্রুপদমথিত হয়েছে; আর সে ক্ষেত্রও অত্যন্ত সংকীর্ণ কারণ গাছের ডালপালা সাজিয়ে যে ঘর বাঁধা সে ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকা চলে না; মাটি লেপে দেয়াল দেয়ার রীতি অনেক নিষাদ জাতির মধ্যে দেখা যায়; তাদের রমণীরা সেই প্রাগৈতিহাসিক রীতিতেই আজও হাতির ছবি মানুষের ছবি মোটা সোটা ধ্যাবড়ানো রেখায় আঁকে; কিন্তু মাটির দেয়ালের ছবি বর্ষার হাতে মুছে যায়। সুতরাং কি ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে কি দেশ-প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে এদেশে টিঁকিয়ে রাখা অসম্ভব; জীবন-

পোষণের প্রধান উপায় যে পশু-শিকার তা ছেড়ে কৃষিকার্য অবলম্বন এদেশে যত শীঘ্র সম্ভব হয়েছিল তত শীঘ্রই এদেশের নিষাদের ধর্মশাস্ত্রেরও পরিবর্তন হয়েছিল। আফ্রিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় এমন কি ইউরোপেও তত শীঘ্র কোনো পরিবর্তন হয় নি। এদেশের প্রায় প্রত্যেক নিষাদ জাতি রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীদের খবর জানে, সে জানার মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় নেই ; ভক্তির যোগও অতি অল্প ; তাদের আপন ভক্তির পাত্র সর্দার বা পুরোহিত, আর ভাবনার পাত্র ভূতপ্রেত প্রভৃতি। ধর্মানুষ্ঠানগুলি তাদের হিন্দু এবং নিষাদ ধর্মের এক জগাখিচুড়ী ; কাজেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ, এদেশে অনুসন্ধান করা আজ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। শুধু বলা চলে, কৃষকের জীবন মুক্ত সমতল প্রদেশে হওয়ার জন্য পাহাড়ের সঙ্গে নিষাদের যোগসূত্র অতি দ্রুত ক্রমেই ছিন্ন হোলো ; যা কিছু ধর্মানুষ্ঠান তা মাঠে মাঠে অনুষ্ঠিত হতে লাগল , ছবি আঁকাও সমতল ভূমিতে নেমে আস্‌ল ; পরিণাম আল্‌পনা।

সিংহনপুরের গুহাচিত্রে পশুতাড়নার যত ছবি দেখি তাতে একটা কথা খুবই স্পষ্ট : পশুর চেয়ে মানুষই সে চিত্রের চিত্রকরের কাছে বেশি পরিচিত ; সে সকল চিত্রে পশুর চেয়ে মানুষ অনেক বেশি জীবন্ত ; পশুর চিত্রগুলি কষ্টকল্পিত বলা চলে মানুষের তুলনায় ; যে যুগে সে সব ছবি আঁকা হয়েছিল সে-যুগে পশুর সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ অনেক পরিমাণে সুদূর হয়ে পড়েছিল অনুমান করা শক্ত নয় ; বোধহয় মৃতের শেষ-শয়ন ভিন্ন গুহার সঙ্গে নিষাদের অন্য যা কিছু বন্ধন তা শিথিল হয়ে এসেছিল যখন তখনই মৃতের সংকারের আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান হিসাবে আঁকা হয়েছিল সে-সব ছবি ; আগে হয়ত মৃতের সঙ্গে শিকারে নিহত পশুও সে গুহায় দেওয়া হোতো, পরে শিকারের অভাবে ঐ চিত্র দিয়ে মৃত আত্মার উদ্দেশে কর্তব্য করা হোতো। তাই পশুর চিত্রগুলিতে আড়ষ্ট গতানুগতিক রীতির ছাপ স্পষ্ট ; পশু আঁকতে হয় বলেই আঁকা ; মানুষের ছবির বেলায় ঐ বাধ্যবাধকতা থাকলেও মানুষ চিত্রকরের জীবনে ঘনিষ্ঠতর পশুর চেয়ে ; কাজেই সে মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে অজ্ঞতার বাধা পায় নি, কল্পনাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পেরেছে মানুষের ছবিতেই ; শুধু সিংহনপুর নয়, দক্ষিণভারতের বিভিন্ন আদিম নিষাদ চিত্রিত গুহাতে এই সত্যের প্রমাণ দেখা যায় ; চিত্রের পশুগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই একই আড়ষ্ট ভঙ্গিতে আঁকা কিন্তু মানুষের ছবি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিচিত্র ভাবের আধার করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ; হাতি বা গণ্ডারের ছবি প্রায় সর্বত্রই এক ধরণের পাশ ফেরানো ভঙ্গিতে একই প্রকারের রেখায় আঁকা, কিন্তু মানুষের ছবি কখনো পিছন থেকে কখনো পাশ থেকে, কখনো নাচের ভঙ্গিতে কখনো যুদ্ধের ভঙ্গিতে, কখনো দ্রুতগতির ভঙ্গিতে, কখনো বা পতনের ভঙ্গিতে, কখনো সে তাড়া করছে, কখনো বিতাড়িত হচ্ছে ; কখনো আনন্দ কখনো ভয়, কখনো ক্রোধ ; চিত্রকরের মনে ধর্ম বা লোকাচারের প্রেরণার চেয়ে আপন সৃষ্টির ইচ্ছা যে প্রবলভাবে কাজ করেছে তারই পরিচয় এসব মানুষের ছবিতে। সেই সৃষ্টির ইচ্ছার প্রাবল্য ইউরোপের আদিম নিষাদের চিত্রে অনুভূত হয় অন্য একদিকে। অসাধারণ পরিশ্রম করে আঁকা ইউরোপের গুহাচিত্রগুলিতে সাধনার পরিচয় পাই, আল্‌টামিরার গুহায়

বাইসনের ছবিতে। সিংহনপুরের চিত্রকরের সেই পরিশ্রম স্বীকার দেখি না ; তার প্রবল সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে ছবি আঁকার উৎসাহের মধ্যে ; ছবিগুলি এলোমেলো ভাবে পাথরের গায়ে ছড়ানো ; ছোটো ছেলেরা যেমন দেয়ালে পেন্‌সিল্‌ ঘষে ছবি আঁকে যেখানে তার যেটা খুশি, মস্ত দেয়ালে ছবি আঁকার মস্ত ক্ষেত্রটা নিয়ে তার মন যেমন যেখানে সেখানে ছুটে বেড়ানোরই পরিচয় দেয় যেখানে সেখানে আঁকায়, দেয়াল ছাড়িয়ে জানলায় দরজায় থামের গায়ে মেঝেতে কোথাও তার পেন্‌সিলের গতি বাধা মানে না, তেমনি ঐ আদিম চিত্রকরের 'দাঁতন'ও যেন সব বাধা পার হয়ে ছুটেছে গুহার গায়ের ওপর ; তার ছবিতে ধারাবাহিক কিছু নেই, নেই থামবার সীমা, নেই আরম্ভের ঠিকানা ; ধর্মশাস্ত্রের বিধান তাকে গুহার আলোকিত দিকে কিংবা নীচে নামতে বাধা দিয়েছে কিন্তু তা পারেনি সর্বত্র বাধা মানিয়ে রাখতে। সৃষ্টিতে তার অদম্য আনন্দের পরিচয় ঐ অর্ধ-সমাপ্ত ছবিগুলিতেই স্পষ্ট হয়েছে ; সাধনার দুঃখ স্বীকার নেই ; মনের ভাবোচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল কি না একথা অন্য কারো মুখে শোনার অপেক্ষা না রেখেই সে চিত্রকর ছবিটা থেকে তুলি তুলে নিয়েছে।

ভারতীয় আদিম চিত্রকরের ছবি থেকে আমরা তার যে মনোভাবের পরিচয় পাই তা সম্পূর্ণভাবেই শিশুর স্বাধীন সতেজ স্বানন্দ মনেরই অনুরূপ ; তাই ভারতীয় নিষাদ চিত্রে আমরা চিত্রকরকে যত স্পষ্টরূপে দেখি চিত্রিত বস্তুকে তত নয়।*

□

* এই রচনাটির তারিখ লেখেননি চিত্তপ্রসাদ।

চিত্ত প্রসাদের টুকরো লেখা

কবিতায় চিঠি, নোট ইত্যাদি

দুল্ দুল্ দুলিয়া
তিন আংগুল তুলিয়া
কালের মাছি কালে যাও
মোর ফল্লায় নাও তলাও
এই চাক কাটিতে
যদি মাছি কামড়াও
তোর মুখ বন্দ করং ॥

(কোচবেহারী মৌচাক কাটার মন্ত্র। সংগ্রহ : শ্রী জীতেন্দ্র ঘোষ)

পত্র

৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯

বন্ধু সমর সেন
কেন চুপ করেচেন ?
...
...
এক রাতে দেবী জয়া
নিয়ে ভারতীয় দয়া
আর তার খোকা নিয়ে আর রুশী রং নিয়ে
হাসিখুশি মুখ নিয়ে আসলেন
আমি তো আস্তো গাধা
আজও জানিনে কো দাদা
বিধাতা হাসলেন কি কাসলেন !
মস্কো যাইনে কেন
আরো নানা হেন তেন

মন খোলা বাংলায়
পলিটিক্স হামলায়
...

আমি দাদা থক্ গিয়া
নানা ধারাপাত নিয়া
চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ে
যেদিকে তাকাও নানা পলিটিক্সরা
সুদ আর আসলেতে
বীজ আর ফসলেতে
পয়লাটা হয় আজ তিস্‌রা !!!
বিনু রায় গান ছেড়ে দর্শন কর্ষণ করে
আরো নানা হর্ষে সুখে আলিংগন করে বুকে
বিশ্বের মুক্তির ঝানু ঝানু দূতেরা
আজ বলি ঈশ্বরে ঃ—
'মানুষের ঘরে ঘরে
বেঁচে থাক ভাং গাঁজা ধুতুরা ॥'
× × × তারপর × × ×
চলছে হল্লা নয়া
'ঝিভাগো' নভেল নিয়া
চোঁয়া ঢেকুরের বাস পায়োরিয়া নিশ্বাস
উল্লুক রাজেদের মোচড়ায় পিলে
বিব্রত হেথা সেথা কৃষ্টির শকুনেরা
গোলাপী ও পাকা রাঙা সব হাড়গিলে।
হোক না সে কোটিতে এক
মরুক প্যাস্টারন্যাক
এ যুগেতে কে না জানে
একের কী কদর্থ মানে
বুর্জোয়ারা চেঁচামেচি করে পৃথিবীতে
জনগণ ভুলবে না টলবে না দুলবে না
নিজেদের মুক্তির পথ চিনে নিতে !!!
...
জানবেন সম্প্রীতি চিঠি আপাতত ইতি
সুহৃদের সুখে মোর চিত্তে প্রসাদ
আঁধেরি নগরবাসী খোদার রুগ্ন খাস

ভবদীয়
চিত্ত প্রসাদ

পত্র

আন্ধেরি
২৩-এ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

শুন শুন সুনীল জানা
পাইলাম তোমার পত্রখানা
যাইতাম উইড়া থাকলে ডানা,—
খুশির চাইতে হইলাম রে অখুশি।
ইচ্ছা করে ঐ হালাদের ধৈরা মারি ঘুশি ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধুয়া ॥

এংরাজ গিয়া চ্যাং-রাজ হৈছে
পুলি পিঠার ল্যাজ গজাইছে
ব্যাঙে সাপের পাঁচ পা দ্যাখছে ন্যাপায় মারে দৈ
গো-মাতার সন্তানেরা দেয় পাকা ধানে মৈ ॥
ভাইরে, খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

হের পরেতে লেখছ পত্রে
ব্যথা বেদন হৈছে গাত্রে
আমারো ঘুম হয় না রাত্রে
মনটা— বুড়া বুড়া লাগে

কী ছিলাম কী হৈলাম ভাইর‍্যা
মরি দুখে রাগে ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

এই তো সেইদিন আইলাম ভবে
যৈবনই বা আইলো কবে
গেলই বা সে কেমনে কবে
দেহতত্ত্ব বোঝন বিষম দায়
এখন দেখি একে একে দন্ত গুলান যায় ॥
ভাইরে, খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

ন্যাপারা সব দিল্লীবাসী
বরের পিসি বৌ-এর মাসী
পরের খাইয়া চড়ায় ঘরের মোষ
বাটপাড় হৈতে পারলানা ভাই
রামেরে দাও দোষ ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

মনের খেদে লেখ্‌ছ শেষে,—
'এই দেশ তেইজা যাও বিদেশে
রাখবে তারা ভালোবেসে
থাকবা রঙ্গে ঢঙে।'—
হায়রে— যদি যাই মুই বঙ্গে
আমার— কপালও যায় সঙ্গে ॥

বুড়া কালে ইউরুপ যামু
দাঁত নাই চোখ নাই কী সুখ পামু
সেখানেও সেই রামই খামু যদি কড়ি জোটে—
আরেক ল্যাঠা— কাঁটা চামচির
অভ্যাস নাই তো মোটে ॥

বয়স কালে সবই সাজে
বুড়া কালে লাঠি বাজে
বেইজ্জত হমু পর সমাজে কাজ কি অমন সুখে
বুড়া কালে খাওন ভাল ঝালটা পরের মুখে ॥

যায় না ঠেকান দিয়া ঠেকা
যার কপালে যেমন লেখা
আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা কই শোন,—
স্বয়ং ক্যাবল চন্দ্রের কীর্তি সাজান নয় কোন ॥

আগরতলার আমাগো সেই
ক্যাবল চান্দ বাল্য বয়সেই
কালচারে মন— ঘরে বসেই তবলডুগি্গ বাজায়

পাঠশালা পাট ফালাইয়া শেখে
দম দিতে গাঁজায় ॥

বয়স ষোল না হৈতে
গৃহ বন্ধন নারে সৈতে
গুরুর কাছে বিদ্যা লৈতে ফেরার হৈল কাশী
তবল বাজাইতে শেষে পোঁছায় দিল্লী আসি ॥

কালচার মন্ত্রী শুইনা তবল
ডাইকা দিলেন মুজরা ডবল
কইলেন ডাইকা— 'অহে ক্যাবল,—
পাঠামু ইউরুপে।'

ক্যাবল বলে— 'মস্কু গেলাম
কী দ্যাখলাম কী সুখ পাইলাম
কী কই দাদা ভট্‌কা খেলাম
বিশ্বাস যাইতে পারেন
সকাল হৈতে রুটি মাংস যত ইচ্ছা মারেন ॥

যাহারে কয় ভূরি ভোজন
চল্লিশ পাউন্ড বাড়ল ওজন
বার দিনে— বোঝেন কেমন —
প্যান্টের বুতাম ছেঁড়ে
গেলাম যখন চিকা যেমন
ফিরলাম বলদা এঁড়ে ॥'

['ব্যাড-টী দিয়া ঘুম ভাঙাইত
তাহার পরই ব্র্যাকফাস্ট হৈত
ভোর হৈতে মাঝরাত পার গাদনের পর গাদন
ছয় মাস থাকলে তেমন হালে
বৈতাম গন্ধমাদন' ॥—]

'তার উপরে— কি কমু— প্র্যাম— !

মস্কুতে সব ফিট গোর ম্যাম— !
সব্বাই জিগ্গায়— হোয়াট ইউর ন্যাম ?—
পরীর মতন মাইয়া
তেমনি সব স্বাস্থ্যবতী এইসান হাথের বাঁইয়া ॥'

'আমার রংটা দৈবাৎ কালো
অরা কালোই বাসে ভালো
আমায় লৈয়া কী যে করলো
সব্বাই টানাটানি
কী কয় যে বুঝি না ছাই ভাষাটা না জানি ॥'

'একজন তো সব্বার বেশি
আমারি গায়ে ঠেশাঠেশি
হাতেহাতে মেশামিশি
শেষে— খাইয়া বসল— চুম— !
বাইসরে বাইস সারাটা রাত চক্ষে নাই মোর ঘুম' ॥

'আসন কালে কৈলজা ফাটে
ছিলাম যেমন চান্দের হাটে
অরা সব্বাই কান্দে কাটে চক্ষের জলে ভাসে
সেই একজন তো আমার লগে পারলে চৈলা আসে ॥'

শুইনা'নি ক্যাবলের কথা
মনে শুধুই বাড়ে ব্যথা
আমার দৌড় ঐ কৈলকাতা কৈলে হৈব কি
ঠকঠকাইলে শূন্য ভান্ডে মেলে না তো ঘি ॥

নিজের দেশে বেশ আছি ভাই
ল্যাংটা ফিরলেও জিগ্গানের নাই
ধার ধোর কৈরা খিচুড়ি খাই
আর— তামশা দেখি কত
এমন কালচার কোথায় পাইবা
আমাগো দ্যাশের মত ॥

আসলে ভাই জন্মগত
কপাইল্যা ক্যাবলের মত
হৈলে চরতাম ইচ্ছা মত
কৈরা শিং বাঁকা
কিম্বা যদি রাইখা যাইত বাপে কিছু টাকা ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

যদির কথা শুধুই ছলা
কালা যদি হৈত ধলা
কাঁটাল গাছে ফলত কলা
হৈতাম আর্ট ডাইরেক্টর
মেদিনীপুরে সোনা ফলাইতাম
আইনা রুশি ট্র্যাক্টর ॥

যদি তোমরা থাকতে কাছে
যদি ফলত আর্টের গাছে
টাকার কাঁদি মাঝেমাঝে, যদি হৈতাম রাজা
যদি পাইতাম বোম্বায়ে রাম
আর-- রাধুর কাটলেট ভাজা ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

যদির কথা ছাড়ান দাও ভাই
হক্কের পাওনা তাও জোটে নাই
বাকি কয়দিন ক্যামনে গোঁয়াই রাইখা নিজের মান
সেইটুকু আইজ জানতে পারলে জুড়াইত পরাণ ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

ভেজাল ইতিহাসের দেশে
ভেজাল কাইন্দা ভেজাল হেসে
ভেজাল দেশপ্রেমে ভেসে
দিল্লি গিয়া হৈলাম না নবাব
ভারত স্বাধীন হৈল তবু না মৈল স্বভাব ॥

না শিখলাম দোকানদারী
না মোসাহেবী দরবারী
তাইতে বিপদ হৈল ভারি
অসময়ে গেলাম বুড়া হৈয়া
তোমরা আছ তাইতে বাঁচি প্রাণের কথা কইয়া ॥

হের পরেতে আইসাতেছে দিন
স্বাধীন দেশের বংশ নবীন
কি আমিরিক কি রুশি চীন বসাইবে সব পথে—
বনে যাইবা ? বালী বধ আজ অরণ্যে পর্বতে ॥

আমার প্যাঁচাল শেষ করি আজ
যদিও বেকার নাই কোনো কাজ
ছড়ায় ঢাকি দুশ্চিন্তা লাজ হাসির খোরাক গাই
কালচার লৈয়া ঘর করি ভাই তার বেশি কী চাই ॥
ভাইরে খুশির চাইতে হৈলাম রে অখুশি ॥ ধু ॥

নিয়ো না মোর দোষত্রুটি
করছি বৃহৎ ছোটাছুটি
বাঁচি এবার পাইলে ছুটি যাউক সব শখ সাধ
ভালোবাসা নিয়ো / ইতি
চিত্ত পেরসাদ ॥

[তাল ফেরতা]

পুনশ্চ ঃ ভাইরে ভেরি ভেরি সরি
এই পত্র ডাকে দিতে
ইতিপূর্বে
পাইলাম না কোনো অবসরই ।
খাজনার চাইতে বাজনা বেশি
দৈন চৈলা যায় লাভের মধ্যে
ফাঁকা দরাদরি
ভাইরে ভেরি ভেরি সরি ॥

পূজার কাটা দিন
এবার আমার কাইটা গেল
একলা ঘরে
স্বয়ম্ভু স্বাধীন
আরো পাইলাম শোক যেন
হৈলাম পিতৃহীন
পূজার কায়টা দিন ॥

ইচ্ছা ছিল মনে
ছবিটবি অনেক গুলান
বাইন্ধ্যা ছাইন্দা
পাঠামু এই পত্রখানার সনে
শুভ কর্মে শতেক বাধা
কহেন মুনি জনে
মনের ইচ্ছা রইলো আমার মনে ॥

বুঝি আর সকলি
বুঝলাম না রে কেমন আমার
পোড়া কপাল খানা
সে দুখ কারে বলি
আশার মেঘ ঘটা ঘনায়
বর্ষায় না আসে আর যায় চলি
বুঝি প্রায় আর সকলি ॥

থাউক হাবিজাবি
এই দুনিয়ার আজব কারবার
দৈখা শুইনা এখন কেবল ভাবি
দয়ামায়ার বেশি আমার
এই দুনিয়ায় আর কি আছে দাবি— ?
থাউক হাবিজাবি ॥

খাইতে আছি ঘোল
পাঁইদড় আর পাঠান হীরোর হাতে,—

ফিল্মী হাটেতে
বিজ্ঞাপনী ঢোল
বাজাইতে ডাক পড়েছে আবার—
না বাজালে জুটবে না এক বেলারও খাবার
বেজায় গণ্ডগোল
খাইতে আছি জোলো পচা ঘোল ॥
সুখের মধ্যে আছে শুধু
তোমাগো সব স্মৃতি
তোমরা সবাই নিয়ো আমার
বিজয়ার প্রেম প্রীতি
পত্র করলাম ইতি ॥

আন্ধেরি,
৫ অক্টোবর ১৯৬০

কলিকাতা রেডিয়োতে প্রত্যহ দিনে তিনবার 'বারোমেসে=বোম্বাইয়া=চালদা' প্রোগ্রাম ঃ গ্রামোফোন রেকর্ড ঃ (ইউরোপীয় অপেরা সংগীতের সিনথেটিক আবহ যন্ত্র-যন্ত্রণাসহ)—

১। পঞ্চাশোর্ধ মর্দানা হিরোর গানা ঃ— 'ম্যায় তেরা মুহাব্বতুঁসে দিবানা মর্দানা' ;
২। পঁয়তাল্লিশোর্ধ ঔরত হিরোইনের গানা ঃ— 'ও—ও ও— ও—, তু মেরি জওয়ানি বর্বাদ্ঁ কর্‌্যা রে যা—ও—ও ও—ও পরদেশী—',
৩। হিরো হিরোইনের ডুএট ঃ—
'আভি না যাও দিল আভি ভরা নাহি ঔর থোড়া প্যার করো', 'পয়লা মোলাকাৎ=সে নাজুক দিল ফট্‌ গিয়া ! হায়— হায় !— ফিরভি ঘাবরানা ক্যা ?' সুরের অঙ্গভঙ্গি যেমন কুৎসিত, চিৎকারের সীমা তেমনি ভয়ানক !— এবং প্রত্যহ দিনে তিনবার বাংলায় আধুনিক, 'ভালোবাসা=মামলেট' প্রোগ্রাম ঃ গ্রামোফোন রেকর্ড ঃ—বোম্বাই=ঘরোয়ানা ঃ চটচটে করুণ রসে সিদ্ধ করে বাঙালী=বাঙালী [স্বাদ বজায় রাখা হয়।]

১। কবুতর কণ্ঠে ঃ 'হাওয়ায় এখোনো তোমার গন্ধো ভুর ভুর ভুর করছে— আমার মাথা ঘুরছে—।'
২। কবুতরী কণ্ঠে ঃ 'তুমি সবই জানো সবই বোঝো তবু কেন অসময়ে আসো আর ঠিক সময়েই আসো না—'
৩। কবুতর : কেন তুমি জানালায় এসে দাঁড়াচ্ছো না আজকাল—'

৪। আমি কাঁদছি, পাতা নড়ছে, ফুল ঝরছে, পাখী ডাকছে— তোমার বাঁশী বাজছে না—আমি কাঁদছি—'

৫। মরদ ঃ 'আঁধার ঘরে তরী বেয়ে একা আমি যাই— যাই— আমার কিছু নাই ভালোবাসা চাই। তিনবার মালিশ— তোমার হপ্তায় বেলা ১১৷৷টায়— 'এবার বিদায় দে মা একবার ঘুরে আসি।'

১। 'রোজোনী এখোনো বা— কি'— প্রাত্যহিক রাবিন্দ্রিক পথ্য— চড়চড়ে রোদে— 'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—'

২। ভাদ্র দুপুরে—শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলী'

৩। বিকেলের রোদে—'মধু গন্ধে ভরা মৃদু, স্নিগ্ধ ছায়া—'

৪। রাত দশটায়—'আগুন জ্বালো—'

৫। রাত এগারোটায়—দূরে দেশী সেই রাখাল ছেলে—

৬। সকাল সাড়ে ছ'টায়—মিউমিউ গীটারে সুর—'ভাঙলো মিলন মেলা—'

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি—বর্ণনা ও তালিকা দেওয়া অসাধ্য।—যাঁরা প্রোগ্রাম ঠিক করেন তাঁরা কি নিজেদের মতোই শ্রোতাদেরও সংগীতের শত্রু মনে করেন? দেশের হাওয়া বিষাক্ত করে, দেশের ছেলেমেয়েদের রুচি বিকৃত করে, দেশের মানুষের কর্ণ মর্দন করে প্রোগ্রাম কর্তাশ্রেণী যেভাবে দেশের শত্রুতা সরবে করছেন তা রোধ করার উপায় কি? নিজের রেডিয়ো সেট না থাকলেও তো প্রতিবেশীদের আছে এবং তাদের প্রাপ্ত প্রায় বয়স্ক বালকবালিকাদের মর্কটজাতীয় ঔৎসুক্য আছে, সে বয়সে মেয়েদের বাড়ী থেকে বার হ'তে দেওয়া বন্ধ করা হয়। ছেলেরা বোম্বাইভক্ত হতে শুরু করে রেডিয়ো সেট ছেলেমেয়েদের নতুন খেলনা। যারা রেডিয়ো= গানা শুনতে চান না তাঁদের কান=বাঁচাবার উপায় কী?

কলিকাতা, অগস্ট ২৮, ১৯৬৬

স্বপ্ন*

অন্য নামের অভাবে তাকে স্বপ্ন বলি— আমি স্বপ্ন দেখি কর্মকোলাহলের পথে চলতে চলতে, কখনো বা অলস বেলায়—সে আমার নিজের জগত আমার মনে ঝরণার মতো বয়ে যায়, গাছের মতো আকাশের দিকে শাখাপ্রশাখা পত্রপুষ্প মেলে বেড়ে ওঠে,

*চিত্ত প্রসাদ এই রচনাটির কোনো শিরোনাম দেননি, তারিখের উল্লেখ নেই। স্কলার খাতাটিতে এটি ছিল। ওই খাতাতেই এই রচনাটির শেষে আছে 'বুড়ুং দাদার ছড়া' সেটি রচিত হয়েছে ১৯ আগস্ট, ১৯৬৬। বুড়ুং দাদার গল্প রয়েছে সম্বোধনহীন একটি চিঠিতে। ২০×৫ সে. মি. সাইজের খাতার ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী ফ্যান্টাসিতে সেইজগতের কথা বলা হয়েছে এখানে স্বপ্নের কথায়ও রয়েছে সেই একই জগত। ব্যক্তিগত রচনা, ছড়া ও কবিতায় নানাভাবে এই স্বপ্ন ঘুরে-ফিরে এসেছে।—সম্পাদক।

কখনো বা খণ্ড খণ্ড মেঘের মতো ছায়া ফেলে ভেসে চলে যায়, অথবা সে স্বপ্নের রাজ্য আমার যেন পাঁজী আর ঘড়ির বাইরে কোন এক অজ্ঞাত সময়ের মহাসমুদ্রের মাঝখানে একেলা একটি দ্বীপ মনে হয় যেন সুদূর অতীতে এই পৃথিবীতেই কোনো এক মহারণ্যে তেমন এক জগত ছিলো এক কালে — আমি জন্মেছিলাম সেই আরণ্যক জগতে আরো অনেকের মাঝখানে— অনেক মানুষ অনেক পশু-পাখী-কীট নানান প্রাণী আর ঈশ্বর সৃষ্ট অন্যান্য অনেক-কিছুর মাঝখানে, — আর মনে হয় আবার একদিন জন্মাবো নিশ্চয় সেই আরণ্যক জগতে— আমার স্বপ্নের দ্বীপে, জন্মাবো সেই দ্বীপে শুধু আমি নয় এই পৃথিবীতে সেকালে যারা জন্মাবে তারা সবাই জন্মাবে সেই জগতে — ততোদিনে আমার স্বপ্নের সেই দ্বীপখানি সারা পৃথিবী ব্যাপ্ত হবে— এই পৃথিবী সেই দ্বীপ হবে ততোদিনে।

সেই দ্বীপে মানুষ নিত্যনতুন বাক্য রচনা করবে না পুরাতন অনেক কথা অনেক কাব্যও ভুলে যাবে, মানুষে-মানুষে প্রাণীতে-প্রাণীতে প্রভেদ বোঝাবার প্রয়োজন থাকবে না, বোঝাবার বাক্যও থাকবে না চক্ষু-কর্ণ আর হৃদয় মন দিয়ে…অনুভব উপভোগ করা সহজ হবে, মানুষের কন্ঠে থাকবে শুধু সুর সাহায্যের সুর— সুখের সুর দুঃখের সুর বিস্ময়ের সুর ভয়ের সুর তৃপ্তির সুর সাহসের সুর— মানুষের চোখ হবে অন্তর্যামী আর আন্তরিকতার নীরব বাণীর প্রদীপের মতো, মানুষের কানে পেঁছিবে সকল জীবের ভাষা, নদীর কলতান তরু মর্মর, ঝড়ের মর্ম্মবাণী,— মানুষ কাব্য রচনা করবে না পৃথিবীর কাব্যের জগতে কবি হয়ে বাঁচবে কবি হয়ে মরবে, সে জগত বাক্যাতীত ছবির মতো নির্বাক জগত, নির্বাক সুরের ধ্বনির জগত, অনুভবের জগত। বাগবিস্তারে যা কিছু বোঝানো যায় না বরং ব্যর্থ গোলমাল সৃষ্টি করে মনকে উদভ্রান্ত করা হয় সে সকল কিছুকে বাক্যে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা কেউ করবে না। মতভেদের দলাদলি সে জগতে কেউ জানবে না।

সে জগতে মানুষ দৈহিক খাদ্যাদির প্রয়োজনে দৈহিক পরিশ্রম করবে— সে পরিশ্রম দেহের স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সে পরিশ্রম এড়াবার জন্যে যন্ত্রাদির সৃষ্টি করে আলস্য বাড়াবে না, আলস্যকে গৌরবান্বিত করবার জন্যে তাকে সভ্যতা নাম দেবে না। সে জগতে মানুষ দৈহিক প্রয়োজনকে সংযমের দ্বারা সরল এবং স্বল্পে তুষ্টির সীমায় নির্দিষ্ট রাখবে— লোভ উশৃংখলতার বশে বিলাসের অহংকারের জঞ্জাল সামগ্রীতে জীবন ভারাক্রান্ত করবে না, সৌন্দর্য বোধের প্রেরণায় সানন্দ উপভোগের বিচিত্র সম্পদ-সৃষ্টি দিয়ে জীবনকে কাব্যময় করে তুলবে। সেসব সম্পদ মানুষের সঙ্গে বাঁচবে মানুষের সঙ্গেই মরবে অমরত্বের দম্ভ যে সম্পদকে স্পর্শ করবে না। আদি অন্তহীন বিশ্বের অনন্ত মহিমা বোধকে কল্পিত অমরত্বের দম্ভে অসাড় অন্ধ বধির করে দেবে না। মানুষের নৃত্যগীত অলংকার সমগ্র বিশ্বের রহস্যের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য বিস্ময়ার্ঘ্য-রূপে রচিত হবে। নিজের জীবনের সরল সহজ উপভোগ ও পূর্ণতা সম্বন্ধে সানন্দ চেতনা থেকে মানুষের উৎসব সৃষ্টি হবে। □

With best compliments from :

A. TOSH & SONS LIMITED,

'Trading House' recognised by the Government of India.
Tea Merchants and Exporters

'TOSH HOUSE'

P-32 & 33, India Exchange Place, P. O. Box 2444,
Calcutta-700 001.

Branches : Siliguri, Cochin, Coimbatore.

Cable : 'PAYASI' Calcutta
Telex : 021-4393 TOSH IN
Phone : 26-2191 / 92 26-5236 26-7543.

হাংরি বেঙ্গল

(১৯৪৩-এর নভেম্বরে চিত্ত প্রসাদের মেদিনীপুর সফর)

মেদিনীপুর যাওয়ার পথে ট্রেনের ভিড়ঠাসা কামরায় বসে থাকতে থাকতে বারবার আমার মনে ফিরে আসছিল কলকাতার ফুটপাতের রোজকার দৃশ্যগুলো। সেই ক্ষয়ে-যাওয়া, নিঃসহায় জ্যান্ত কংকালের মিছিল – কোন একদিন যারা গড়ে তুলেছিল গ্রাম-বাংলার গোটা সমাজ। জেলে, মাঝি, কুমোর, তাঁতি, চাষী। পরিবারের পর পরিবার। শিয়ালদা স্টেশন আর আমহার্স্ট স্ট্রিটের মাঝের এই ছোট্ট সড়কটিতে একদিন ভোর বেলা স্বচক্ষে দেখা পাঁচ পাঁচটা শবদেহ। এবং আরো নানা ভয়ংকর দৃশ্য সে-সময় শহরের দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে উঠেছিল সে-সব। আর, মৃতদের ও মৃত্যুমুখীদের এই ভিড়ের মধ্যে শতকরা আশি ভাগই যে সম্ভবত মেদিনীপুর থেকে আসা— এ-কথাটাও মনে আসছিল।

বস্তা-পিছু আধ-সের

আমার উল্টোদিকেই সম্পন্ন গোছের দু-জন মাঝবয়েসী ভদ্রলোক বসে বসে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কথা বলছিলেন। একজনের পরনে ছিল ধোপদুরস্ত ধুতি আর 'পাঞ্জাবি'; আরেকজনের খাকি পোশাক, একটি 'আই. ই.' ব্যাজ সম্বলিত। ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার সংগে সংগে বাধ্য হয়েই তাঁরা একটু গলা চড়িয়ে কথাবার্তা আরম্ভ করলেন। আর আমি শুনতে পেলাম ধুতি-পরা ব্যক্তিটিকে বলতে— 'খুব কম করেও ধরো বস্তা-পিছু আধ-সের। তাহলেও দাঁড়াচ্ছে প্রায় পাঁচশো সেরের মতো— মানে সাড়ে বারো মণ। এখন তুমি যদি মণ-পিছু তিরিশ টাকা দাম করো তো লোকে হামলে পড়বে। আর মাল পাঠানো নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না— ওটা আমি দেখবো 'খন।'

খাকি পরা ব্যক্তিটি বললেন— 'বড়বাবুর সংগে কথা বলা এক প্রচণ্ড ঝকমারি। তা ছাড়া আমি যেই ওঁর কাছে যাবো, অমনি ওনার দাঁওটাও যাবে বেড়ে।'

—'আরে বাড়তে দাও না!' বললেন ধুতি-পরা ভদ্রলোক— 'উনি কত চাইবেন? পঞ্চাশ টাকা? একশো টাকা? দেড়শো? তাহলেও আমাদের ঢের লাভ থাকবে। আর, তা ছাড়া, আমার অসুবিধের কথাটাও ভাবো! আমার ওপর ইতিমধ্যেই ওদের নজর পড়েছে।...'

এরপর কামরার চারপাশটা একবার খুব সযত্নে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক আবার তাঁর গলা নামিয়ে আনলেন ফিসফিস শব্দে। বাকি পুরো পথে ওঁদের ওই গভীর ও

গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার একটা শব্দও আমি ধরতে পারিনি। আর শেষ পর্যন্ত ওঁদের মধ্যে বোঝাপড়ার খসড়াটা যে কী দাঁড়াল তার বিন্দুবিসর্গ আঁচ করতে পারিনি।

ট্রেন মেদিনীপুর পেঁছোল রাতে। শুনলাম একটা ব্যাংকে নাকি আমার বাবাকে ট্রেনে করে পাঠানো চাল ও আটার খালাস ও বিলির দায়িত্ব দিয়েছে। এ-বিষয়ে বাবা আমাকে যে কথাটা প্রথমেই বলল, সংগে সংগেই সেটা বেশ নাড়া দিল আমাকে— প্রতিটি কন্সাইন্মেন্টে যা পাঠানো হয় তার চেয়ে নাকি অনেকটা কম রিসিভ্ করা হয়। তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়ে গেল ট্রেনে শোনা সেই রহস্যময় আলোচনাটির কথা। আর, এই লম্বা জার্নিতে কতগুলো 'হাফ্ সের' যে বস্তাগুলো থেকে চুরি হয়ে গেছে তাই ভাবতে লাগলাম।

এদিকে এমনকি আমরাও প্রতিদিন ভাত খেতে পাবার মতো সৌভাগ্যবান ছিলাম না। রেশনে চালের বদলে আটা দেওয়া হচ্ছিল। হপ্তায় অন্তত দুবার আমাদের বাধ্য হয়ে দু-বেলাই আটা খেতে হত।

আশাও নয়, লজ্জাও নয়!

পরদিন সকালে শহরটা একটু ঘুরে দেখতে বেরলাম। ঘূর্ণিঝড়ের চিহ্নগুলো তখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি। পথের পাশে পাশে তখনও ভেঙে-পড়া বাড়ি আর উপড়ে-পড়া গাছ পড়েছিল। ঘরছাড়া ভিখিরির দল তখনও দরজায় দরজায় ভিক্ষে চেয়ে ফিরছিল, যদিও তাদের অধিকাংশকেই এর মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে। ওইসব লঙ্গরখানাগুলোয় তখনও আসছিল প্রায় সাতশো কি আটশো লোক— যেখানে এই সংখ্যাটা কিছুদিন আগেই ছিল দু-হাজার। সরকার জোর করে সমস্ত 'আমন' ধান কেড়ে নেবে কি-না এ-নিয়ে চায়ের দোকানগুলোয় চলছিল গরম আলোচনা।

কয়েকজন উদ্বাস্তুর সংগে কথা বললাম আমি। তাদের বেশিরভাগই মেদিনীপুর ও খড়্গপুর শহরের ছ-সাত মাইল এলাকার গ্রামগুলোর বিভিন্ন পরিবার থেকে এসেছিল। আর সবাই একই কথা বলছিল— 'খুব শিগ্গিরই— কাল বা পরশুই— আমরা গ্রামে ফিরে যাব। আমন পেকেছে। আমরাই ভাগচাষ করে ফলিয়েছি এই ধান। আর খুব ভাল ফলনও হয়েছে এ-বছর। আমাদের ফিরতেই হবে।' তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল শুধু একটা জিনিসের। আসছে পূর্ণিমায় মল্লিকবাবুরা নাকি বিনা পয়সায় কাপড় বিলি করবেন। ধানকাটায় একটু দেরি হলেও, এ-সুযোগ কি করেই বা ছাড়ে ওই অর্ধনগ্ন, কম্পমান মানুষজন?

ঢের জিজ্ঞাসাবাদ করে তবেই এদের একটি পরিবারের গোটা বৃত্তান্ত জানতে পারি। ওরা এসেছিল মেদিনীপুর শহর থেকে ন-মাইল দূরের চন্দ্রা গ্রাম থেকে। জুন মাসে বাড়ি ছেড়েছিল ওরা— স্বামী স্ত্রী আর তিন বাচ্চা। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছিল

ওদের গল্পটায় কোথায় যেন একটা খুঁত রয়ে যাচ্ছে। অবশেষে, অনেক দোনামনার পর, যখন নিশ্চিত হল আমি সরকারের লোক নই তখন মহিলাটিই জানাল সত্যিকারের গল্পটা।

'— সত্যি বলতে কি বাবু, কী টা আশা করে আমরা গ্রামে ফিরব ? গেলবারেও খারাপ ফলন হয়নি, কিন্তু তবু নিজেদের গ্রামে আমরা কিছুই খেতে পাইনি। ধানকাটার দু-দিনের মধ্যে সব ধান হাওয়া হয়ে গেল। আমরা যে গ্রামে যাব বলছি সে কেবল মিলিটারির ভয়ে। কেউ জানে না আমাদের ধরলে ওরা আমাদের কোথায় পাঠাবে—আমাদের বাচ্চাদেরই বা কোথায় পাঠাবে। ওরা যদি আমাদের গ্রামেই ফেরত পাঠায় তাতেই বা কী লাভ ?'

'— তোমরা কি তাহলে এই শহরে দয়ার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে চাইছ ? তোমরা কি তাহলে শেষ পর্যন্ত নিজেদের ভিখিরি হিসেবে দেখতে চাইছ ?'— জিজ্ঞাসা করলাম।

'মোটেই না।' দৃঢ় জবাব আসে। 'কেন আমরা নিজেদের ভিকিরি হতে দেবো ? আমরা তো এখনও কারুর দয়ার ওপর বেঁচে নেই। আমরা দু-জনেই খাটি। মিলিটারির জন্যে পাথর ভাঙি, মালগাড়িতে কাঠ বোঝাই করি, ওদিকের জমিদারবাবুদের বাগানে যে-সব পুকুর খোঁড়া হচ্ছে সেগুলোয় কাজ করি। আমরা প্রত্যেকেই দিনে ছয় থেকে আট আনা পাই। আর শহরে তাও একটু ভাত পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামে টাকা দিলেও কিছুই পাওয়া যাবে না। ক্ষেতগুলোয় এত সুন্দর ফলন হয়েছে—আপনি কি ভাবছেন ধান-কাটা হয়ে গেলে এগুলো আমরা, আর চোখের দেখাও দেখতে পাবো গো বাবু ?'

এরা হল শুধু একটা পরিবার—আরো পাঁচ-ছটি পরিবারের সংগে রেল স্টেশনের কাছে পথের ধারে গাছতলায় বাসা বেঁধেছিল ওরা। আমি বউটির কাছে আরো জানতে চাই— 'এরা সবাই কি মিলিটারির ভয়ে তোমাদের মতোই আসল কথাটা লুকোচ্ছে ?'—

তা জানি না বাবু, কিন্তু ওরা সকলেই আমাদের মতো খেটে খাচ্ছে।

আরেকটি উদ্বাস্তু গোষ্ঠীর কথা বলি, এরা সববাই মেয়ে। দু-জন বৃদ্ধা, তিনজন মাঝবয়েসী বিধবা, একটি কিশোরী। বিধবাদের মধ্যে একজনের কোলে ছিল একটি এগারো-দিনের শিশু; আরেকজন ছিল অন্তঃসত্ত্বা। একটা বিরাট আমগাছের তলায় আগুন জ্বালিয়ে ওরা একটা মালসায় করে জল গরম করছিল। এতসব আয়োজন শুধু কোথাও থেকে যোগাড় করে আনা সের খানেক না-ভাঙা গম সেদ্ধ করার জন্য। বাড়ি ফেরার ব্যাপারে তাদের প্রশ্ন করতে, বিড়বিড় করে তারা কিছু একটা উত্তর দিল, যার মানেটা সে-মুহূর্তে আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমি যেটুকু বুঝলাম তাতে মনে হল যে তাদের জন্য বাড়ির লোকেরা সবাই অপেক্ষা করছে, কিন্তু মল্লিকবাবুদের কাপড় বিলি না-হওয়া অবধি তারা থেকে যেতে বাধ্য। বিধবাদের একজন বলল, তার কেউ নেই; সে নিজেই আর কজনের সংগে ভাগচাষীর কাজ করে কিছু ফসল ফলিয়েছে। কিন্তু এই মহিলাটির সম্বন্ধেই একটু পরে আরেকজন জানালো, 'ওর সোয়ামি স্টেশনে কুলিগিরি করে। একটু পরেই সে ফিরবে।' আর সদ্যোজাতটির

মা বলল, 'আমি কালই ফিরে যাব। আমার ভাই আসছে গরুর গাড়ি নিয়ে।'

প্রায় পক্ষকাল বাদে ওই একই রাস্তা দিয়েই ভোর তিনটের রিকশা করে স্টেশনে যাওয়ার সময়ে এমন কিছু দেখলাম যা এই ভাগ্যহীনা মহিলাগুলির ওই তড়িঘড়ি বৃত্তান্তের সমস্ত অসামঞ্জস্য ও সমস্ত বৈপরীত্যের পরিষ্কার ব্যাখ্যা এনে দিল। দেখি একটি পুলিস কনস্টেবল রদখদ দেখতে দুই যুবক আর এক কিশোরীর (আমি মেয়েদের যে দলটির সঙ্গে কথা বলেছিলাম এই কিশোরীটি সেই দলে ছিল।) সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। রিক্শাওলা বুঝিয়ে বলল,— 'বুঝলেন না বাবু এই মেয়েলোকগুলো শরীর বেচতে শুরু করেছে। আর করবেই বা কী ? দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা উপোস দিতে হলে মান-সম্মান লাজ-লজ্জার বালাই আর থাকে না। এদেরকে আমি রোজ রাতে এই রাস্তা দিয়ে ভাড়া নিয়ে যাবার সময়ে দেখতে পাই।

স্থানীয় পার্টি কম্‌রেডরা আমাকে বোঝালেন বর্তমান খাদ্য-সংকট নিয়ে সব রকম জনসভার ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞাই এখন তাঁদের সামনে প্রধান অসুবিধা। কিছুদিন আগেই, নভেম্বর-সপ্তাহের সময়ে সি. আই. ডি.-র একটা লোক নাকি প্রকাশ্য দিবালোকে আমাদের 'ইউনিটি' পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দিয়েছিল এবং মহল্লার বাসিন্দাদের শাসিয়ে গিয়েছিল এই বলে যে, এ-অঞ্চলে ফের ওই রকম পোস্টার দেখলে পুলিস খুব কড়া অ্যাক্‌শন নেবে।

পোস্টারের বিষয়টা কী ছিল ? দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালানোর জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান, দেশীয় নেতাদের মুক্তি দিয়ে অচলাবস্থার অবসান ঘটানোর দাবি, আর এই মর্মে এক উদ্দীপক ঘোষণা যে জনগণ তাঁদের স্বদেশের পক্ষ নিতে চান।

এ-ব্যাপারে যখন পুলিস সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্‌টের কাছে নালিশ জানানো হয়, তিনি ব্যাপারটি নিয়ে তদন্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। কোনো তদন্ত করা হয়েছিল কি-না জানা যায়নি, কিন্তু এর দু-দিন পরেই সি. আই. ডি.-র ওই একই অফিসারকে এই তল্লাটে দেখা যায় আবার পোস্টার ছিঁড়তে (যে পোস্টারগুলি ছিল আমনের ফলন বিষয়ে) এবং স্থানীয় লোকজনকে হুমকি দিতে।

আমলাতন্ত্রের এ-হেন পরিস্থিতিতে, শুধু এক মুঠো খাবারের জন্য কয়েকটি স্ত্রীলোককে নিজেদের শরীর বিক্রয়ে বাধ্য হতে দেখে আমি একটুও অবাক হইনি। মেদিনীপুরের জনগণ, বাংলায় জাতীয় আন্দোলনে সর্বদাই অগ্রগামী ছিলেন, সেই জনগণকে, স্থানীয় আমলাদের নগণ্য শাসানিতে সন্ত্রস্ত হতে দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কষ্টদায়ক হলেও সত্যি কথাটা হল পোস্টারগুলো ছিঁড়ে ফেলার সময় ন্যূনতম প্রতিবাদ জানাননি একজনও।

উল্টো হুন্টন

চৌঠা নভেম্বর আমি কাঁথির উদ্দেশে রওনা দিলাম বহুদিনের পরিচিত কৃষককর্মী

মেদিনীপুরের কমরেড্ তারাপদ চক্রবর্তীর সংগে। খুব ভোরে আমরা পেঁছিলাম বেলদা স্টেশনে। কলকাতার ফুটপাথ ছেড়ে গ্রামের লোকেরা একজন দু-জন করে ফিরে আসছিল। 'ওরা আমাদের তাড়িয়ে দিলে, বললে বোম্ পড়বে, রোগ হবে, লোক মরবে—কে জানে আসলে কী চায় ওরা!' অন্ধকারে একটি খেতমজুর বিড়বিড় করছিল। 'আজ তিন মাস হল গ্রাম ছেড়েছি। ভগবানই জানেন ফিরে গিয়ে কী দেখতে হবে।' আমনের ভাল ফলনের সম্ভাবনার কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। অবিশ্বাস-ভরা 'হুম্!' উচ্চারণ করে অন্যত্র চলে গেল লোকটি।

বেলদা থেকে ভোরবেলা কাঁথির বাস ছাড়ে। আমরা যেদিন যাই সেদিন মাত্র দুটো বাস ছিল—প্রতিটিতে সত্তরজন করে লোক এবং সঙ্গে অন্তত দু-মণ ওজনের মাল। শুনলাম কপাল ভাল থাকলে কোন কোন দিন তিনটে বাসও পাওয়া যায়, তবে তার বেশি কখনোই না। দিন দু-য়েক আগে নাকি এস. ডি. ও. এসেছিলেন তদারক করতে এবং বেশি লোড্ নেওয়ার জন্য বাস-মালিকদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ জানাচ্ছিলেন। অবশ্য তিনি বাস বাড়ানোর কোন প্রতিশ্রুতি দেননি; আর পেট্রোল-ঘাটতির জন্য তেমন কোন আশাও নেই।

রাস্তার হাল একেবারে যাচ্ছেতাই। যত্রতত্র ধাক্কা। আর গর্তে ভর্তি। ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে আর কোন মেরামত হয়নি। ফলে আমাদের যাত্রাপথে কম করে বার দশেক ব্রেকডাউন হল। তিন ঘণ্টার যাত্রায় সময় লাগল তার প্রায় দ্বিগুণ।

পথে এগরায় আমরা দেখলাম নির্মীয়মাণ উদ্বাস্তু-শিবির। এর মধ্যেই অনেক উদ্বাস্তুর ভিড় হয়েছে সেখানে। কিছুদিন আগে একটি হাসপাতালও খোলা হয়েছিল। ওই সময়ে সেখানে প্রায় আশি-নব্বই জন রুগী ছিল। এই রুগীদের মধ্যে মৃত্যুর হার তখন দৈনিক পাঁচ থেকে দশ। সব ব্যবস্থা-ট্যাবস্থা খুঁটিয়ে দেখার জন্য নামার সময় আর পেলাম না।

পাঁচমাইল ফেরিঘাটে নৌকা ধরা এক কঠিন সমস্যা। উদ্বাস্তুদের বিশাল ভিড়ই এর কারণ। বেশিরভাগই ছিল কুমোর। কয়েকজনকে দেখলাম কাদার মধ্যে ঠেলাগাড়ি থেকে ঝরে পড়া খাদ্যকণা কুড়োতে। বাস থেকে নামামাত্রই একটি ছ'-সাত বছরের বাচ্চা মেয়ে আমার পায়ে এসে পড়ল। অনেক কষ্টে তাকে কাটিয়ে, ভিড় ঠেলে, নৌকায় উঠলাম আমি। দেখি সেখানেও সেই মেয়েটা ঠায় আমার মুখ চেয়ে রয়েছে। এক বগ্‌গাভাবে সে নদীর ওপার অবধি আমাকে অনুসরণ করল।—'বিনি পয়সায় যেখানে খাবার দেয় সেখানে যাচ্ছিস না কেন?'—জিজ্ঞেস করলাম। 'আমাদের গ্রামে নাই।' জবাব দিল মেয়েটি। 'আরেকটা গ্রামে যেতাম, সেখানেও বন্ধ হয়ে গিছে।'

দেব্‌তারা বাসা বদ্‌লান

আমরা কাঁথি পেঁছিলাম, দুপুর গড়িয়ে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে কিছুদিন খুব উদাসীন

ছিলাম। কিন্তু এখন, অনেকগুলো রাত জেগে, বিচ্ছিরি রাস্তায় লজ্‌ঝড়-মার্কা বাসের ভয়ংকর ঝাঁকুনি আর কাঁপুনি সহ্য করার পর, ক্লান্তিতে আমি প্রায় আধমরা। শুধু তারাপদর উৎসাহ এখনও আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর মতে কাঁথিতে ওর অসংখ্য বন্ধুদের কাছে আমরা নাকি দারুন অভ্যর্থনা পাব। সেসবের লোভনীয় বৃত্তান্তও আশা জাগাচ্ছিল। বাস্তবে কী পেয়েছিলাম সে-কথায় আসছি।

সেদিনটা ছিল কাঁথির হাটবার। দোকান আর খদ্দেরের কোনো ঘাটতি ছিল না; কিন্তু চালের ছিটেফোঁটাও চোখে পড়ল না কোথাও। বজরা আর কলাইয়ের ডালের দোকানগুলোয় কিছু ভিড় ছিল ঠিকই, কিন্তু স্যাকরা আর কাঁসার বাসনের দোকান-গুলোয় ছিল ঢের বেশি ভিড়। স্যাকরাদের দোকান ঠিক কতগুলো ছিল গুণে উঠতে পারলাম না। তবে, কাঁসার বাসনের দোকান ছিল এগারোটা। বাঁশ আর মাদুর দিয়ে বানানো মাচার ওপর সাজানো হয়েছিল দোকানগুলো; আর, মহাজনেরা বসেছিল মাটিতে, ক্যাশ-বাক্স আর হালখাতা নিয়ে। প্রতিটি দোকানেই প্রায় দশ-পনেরোজন লোক ভিড় করে আছে। বেশির ভাগই চাষী। অপেক্ষা করছে নিজেদের বাসনপত্তর বেচবে বলে। বাসনের মধ্যে শুধু নিত্য-ব্যবহার্য থালা-ঘটি-বাটিই ছিল না, পেতলের পিলসুজ, ঘণ্টা, প্রদীপ, তামার কোষাকুষি ইত্যাদি পুজোর সাজ-সরঞ্জামও ছিল। এমনকি এক জায়গায় পেতলের তৈরি বেনারসী শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমাও দেখলাম। ওটা বিক্রি হল দু-টাকা বারো আনায়।

দেব্‌তারা চলে যাচ্ছেন গরিব আশ্রিতদের ছেড়ে। পেটমোটা হিন্দু বেনিয়া ভক্তদের ধামে। আমার মনে হল মহাসভার কিছু নেতা 'হিন্দু সংগঠনে'র যে প্রতিশ্রুতি দেন তার ধাঁচও খুব সম্ভব ওরকমই। মেদিনীপুর রিলিফ সেন্টারে আগেই আমরা দেখেছিলাম এক পুরোহিতকে, সপরিবার ভিখিরি হয়ে গেছেন। এক সময় তাঁর পঞ্চাশ বিঘে জমি ছিল— আর ছিল দু-শোটি যজমান পরিবার। সে সবই হারিয়ে গিয়েছিল; আর, পুরোহিত পরিণত হয়েছিলেন ভিক্ষুকে।

গত বছরের ঘূর্ণিঝড়ের চিহ্ন কাঁথিতে এখনো বেশ দৃষ্টিগোচর ছিল। বোমা-বিধ্বস্ত চট্টগ্রামে যা দেখেছি তার থেকে খুব একটা আলাদা ছিল না সেসব দৃশ্য।

এখন পলিটিক্‌সের বাইরে

আশ্রয়ের আশায় প্রথমে আমরা গেলাম জনৈক প্রবীণ কংগ্রেসী কর্মীর বাড়িতে। তারাপদ বলেছিলেন, উনি খুব বড়লোক এবং আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। বাড়িটা দেখে সত্যিসত্যি খুব বড়লোকের বাড়ি বলেই মনে হল। তাঁর অভ্যর্থনার উষ্ণতায়ও কোন সন্দেহই রইল না যে তিনি তারাপদকে বেশ স্নেহ করেন। কিন্তু তারাপদ আমার পরিচয় দেওয়ামাত্র তিনি একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না ভাই,

আমার আবার আজ কোর্টে বিশেষ কাজ পড়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পারি আমাকে ওইদিকে দৌড়তে হবে।'— এই বলে, কোন উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

আধঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর সেই ঠিকানাটিতে পৌঁছলাম। এটি আগে কংগ্রেসের অফিস ছিল। এখন হিন্দু-মহাসভা কেন্দ্র। দরজায় 'মহাসভা নারী সমিতি' বা ওইরকম কিছু একটা সাইনবোর্ড ঝুলছিল। অনেকক্ষণ ধরে দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোন উত্তর না পেয়ে আমরা সোজা ভেতরে চলে গেলাম। গিয়ে দেখি আহাররত এক মাঝবয়েসী ভদ্রলোক (তারাপদর কাছে পরে জানতে পারি, ভদ্রলোক আগে কংগ্রেসী ছিলেন— কিন্তু এখন মহাসভাপন্থী হয়ে গেছেন)। খেতে-খেতে ভদ্রলোক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন এবং আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও খোঁজখবর নিলেন। খাওয়া শেষ হতেই বললেন, 'আপনাদের জন্যে খুব কিছু করতে পারব বলে মনে হচ্ছে না ভাই— আমি এখন পলিটিক্সের বাইরে চলে এসেছি মোটামুটি। তা ছাড়া কোর্টে একটা কেস নিয়ে আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। আমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে।··· তা যাই হোক, কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনাদের একটা ছোট্ট ত্রুটি হয়েছে। এটা একটা মেয়েদের আশ্রম। এখানে অনুমতি ছাড়া ঢোকা নিষেধ।' 'না ঢুকে কোন উপায়ও ছিল। কারণ আমরা দরজায় কড়া নেড়েও কোন উত্তর পাইনি।' ব্যাখ্যা করলাম আমরা। 'তাছাড়া আপনারা যেমন জনগণের সেবক আমরাও তো তাই।'

কোন উত্তর না দিয়ে তিনি শুধু জুতো পরতে শুরু করলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'কজন মহিলা থাকেন এখানে? তাঁদের কী ধরনের কাজ দেওয়া হয়?' 'বাঁধাধরা কোন সংখ্যা নেই।' উত্তর এল, 'কখনো বাড়ে, কখনো কমে। কাজ বলতে বোনাটোনা এইসব। আচ্ছা বেশ, আসুন তাহলে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।' এই বলে সাত তাড়াতাড়ি রওনা হলেন ভদ্রলোক।

তারাপদর জানপহ্চান আরেকজনের কাছেও একটু চেষ্টা-চরিত্র করলাম আমরা। ইনিও একজন কংগ্রেসী; প্রায় স্থানীয় নেতার পর্যায়ে; নাম সতীশ জানা। বর্তমানে ইনি জনকল্যাণ-সংস্থাগুলির প্রায় প্রতিটির সংগেই যুক্ত; এবং বিশেষ করে মহাসভার সংগে।

রিলিফ কমিটির অফিসেই তাঁকে পেয়ে গেলাম আমরা। আমরা এসেছি বলে খুব উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন তিনি। তারপর মৃত্যুর হার, সেবাকর্মের পরিধি এবং এ-বিষয়ে তাঁর কার্যকলাপ প্রভৃতির ওপর একটা বেশ লম্বাচওড়া বক্তিমে ঝাড়লেন। বক্তিমে শেষ হলে আমাদের বললেন, পাশের বাড়িতে গুজরাট সেবা সমিতির অফিসে গিয়ে জনৈক কংগ্রেস-কর্মীর সংগে দেখা করে থাকার ব্যবস্থাদি করতে।

গুজরাট সেবা সমিতির কংগ্রেস-কর্মীটি কিছু হিসেবপত্র নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। লেজার থেকে এক মুহূর্তের জন্য চোখ তুলে তাকালেন তারাপদর দিকে। চিনলেনও সংগে সংগেই!

তারপর, প্রায় পনেরো মিনিট ধরে, তারাপদ যা-কিছু বলল সে-সবেরই উত্তরে তিনি শুধু জানালেন 'হুম্' । আমি এদিকে গা-ছাড়াভাবে একটা মাদুরের ওপর ইতিমধ্যেই একটু গড়িয়ে নিয়েছি । এতক্ষণে তারাপদরও খুব রোখ্ চেপে গেছে দেখলাম । আর বেশি কিছু না বলে ও সটান স্নানের যোগাড়যন্তর শুরু করে দিল । কংগ্রেসী-কর্মীটি কোন একটা দরকারে বাইরে বেরোলেন । দু-তিনজন যুবক এগিয়ে এলেন আমাদের সাহায্যার্থে । দেখে মনে হল এঁরা গুজরাট সেবা সমিতির কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক ।

স্নানের পর সবে আমরা খাদ্য-সমস্যা নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা শুরু করেছি, এমন সময় মাঝবয়েসী কংগ্রেসী কর্মীটি ফিরে এলেন । এসেই একটি খবরের কাগজ হাতে তুলে নিয়ে বলে উঠলেন, 'এবার বলুন আপনাদের কী বলার-টলার আছে ।' অসীম ধৈর্য নিয়ে তারাপদ গোড়ার থেকে শেষ অবধি ইতিমধ্যে বলা কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করল । খবরের কাগজ থেকে চোখ না তুলে ভদ্রলোক আগের মতোই 'হুম্, হুম্' করে যেতে লাগলেন । শেষে হঠাৎ ছুঁড়ে নামিয়ে রাখলেন কাগজটা এবং টেবিলের ওপর একটা চড় মেরে চিৎকার করে উঠলেন, 'আপনাদের সবকিছু সহ্য করতে আমরা রাজি ; কিন্তু যে ব্যাপারটায় আমাদের রক্ত জ্বলে ওঠে তা হল আপনাদের এই বিরাট উৎসব করে ব্লাড্ ব্যাংকে রক্তদান করার ব্যাপারটা । আর কাদের জন্যে ? যে মিলিটারি আমাদের দেশে এত অনাহার ও দুর্দশার কারণ স্বয়ং তাদেরই জন্যে । এটা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে । সত্যিই এটা সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে । জেলে থাকার সময় আমি স্বচক্ষে দেখেছি এসব ।'— এতদূর বলেই আবার তিনি খবরের কাগজটিতে ডুব দিলেন ।

তারাপদ বুঝিয়ে বলার যথাসাধ্য চেষ্টা করছিল ; কিন্তু উত্তেজিত কংগ্রেসী কর্মীটি কিছু শুনছিলেন বলে মনে হল না । তারাপদ যখন ত্রাণকার্যে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপের পরিধি নিয়ে সংখ্যা-টংখ্যা উদ্ধৃত করতে শুরু করল, তিনি বললেন, 'ওসব প্রচার, ভিত্তিহীন প্রচার ।' তারাপদ ন্যাশনাল ইউনিট প্রসংগে এল । ভদ্রলোক বললেন, 'আপনাদের এই ইউনিট-টা আসলে নিছক একটা অশ্বডিম্ব, যেমন গান্ধীজীর অহিংসা ।' তারাপদ বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করল । উত্তর এল, 'ওসব নেহাৎই প্রচার ।' ভদ্রলোকের মতে জাপান আমাদের শত্রু না মিত্র তা স্থির করা অসম্ভব । কারণ জাপানীরা বোমা ফেলছে স্রেফ ব্রিটিশরা এখানে রয়েছে বলে । আর ব্রিটিশরা এখানে রয়েছে বলেই আমাদের এতসব দুর্দশার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে । শেষমেষ তিনি আচমকা তাঁর চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন— আমাদের পক্ষে ওখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না । এই বলে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন, ভাবটা যেন আমাদের বাইরে অবধি এগিয়ে দেবেন । একজন দেশসেবকের কর্তব্য আরেকজন দেশসেবককে সাহায্য করা— এমন কথাতেও টলানো গেল না তাঁকে । শেষে অগত্যা আমাদের বেরোতেই হল । তিনিও বেরিয়ে এলেন, দরজায় তালা দিলেন এবং কোন একটা কাজের দোহাই দিয়ে অন্যত্র প্রস্থান করলেন ।

তারাপদ তো অবাকের একশেষ। পথে নেমে বলল— 'ভদ্রলোক কখনো এমন ছিলেন না। কমিউনিস্টদের সম্পর্কে ওঁর ধ্যানধারণা একেবারেই অন্যরকম ছিল।'

অবশেষে আমরা বাধ্য হলাম একটা চায়ের দোকানে আশ্রয় নিতে। ঠিক হল যে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আমরা তারাপদর পরিচিত আরেকজন কংগ্রেসী নেতার সংগে দেখা করব। যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে যেতে হলে ছ-মাইল হেঁটে একটা গ্রামে যেতে হবে।

গুজরাট সেবা সমিতির এক স্বেচ্ছাসেবককে পথপ্রদর্শক হিসেবে পাওয়া গেল। বিশ বছরের এক উজ্জ্বল যুবক ; নাম শ্রীপতি। মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের এই যুবকটি বেশ শিক্ষিত। উৎসাহী কংগ্রেসী দেশপ্রেমিক হিসেবে সে আমাদের ও আমাদের পার্টির প্রতি একটু যেন কৌতূহলীও হয়ে উঠেছে মনে হল। যে কংগ্রেসী নেতাটির সংগে আমরা দেখা করতে যাচ্ছিলাম, শ্রীপতি খুব ভালই চিনত তাঁকে। কিন্তু তাঁর গ্রামে যাবার রাস্তাটা তত ভাল চিনত না। সেটা ধরা পড়ল পরে।

রাস্তায় তারাপদর আরেক পরিচিতের সংগে দেখা। গ্রামের এক মাঝবয়েসী ডাক্তার। তারাপদ তাঁকে ডাকা মাত্রই ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেদিকে এগিয়ে এলেন। এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কংগ্রেস না মহাসভা ?' তারাপদ বলল, 'কিষাণ সভা। কমিউনিস্ট।'— 'যাক, তাও বরং ভাল !' একগাল হেসে মন্তব্য করলেন ডাক্তারবাবু, 'আরে দাদা, ভগবানের দিব্যি দিয়ে বলছি, আজকাল যেন কংগ্রেসের নাম শুনলেই আঁতকে উঠি।' চারপাশে সতর্ক চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি আরো বললেন, 'বিশ্বাস করুন ভাই, এই স্বদেশী-স্বদেশী খেলাটাকে আর প্রশ্রয় দেওয়াটা আমার পক্ষে বড্ড বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে ইদানীং। ···আচ্ছা বেশ, চলি তাহলে, পরে আবার দেখা হবে'খন। আমার আবার কোর্টে একটা কাজ আছে।' ত্বরিত প্রস্থান।

পেতল কাঁসার দোকানগুলোর ভিড় বেলা দু-টোর মধ্যেই পাতলা হয়ে এল। শুনলাম প্রতিদিনই নাকি কোলাঘাট থেকে একটা পেতল কাঁসার মালভর্তি স্টিমার ছাড়ে, এবং কখনো কখনো সংগে কিছু মালভর্তি দিশি নৌকাও থাকে। গত এক মাস যাবত এই চলছে। আমি ভাবতে লাগলাম, কত চাষীই না এইভাবে বাধ্য হয়েছেন ঘরের শেষতম কাঁসার বাসনটিও বেচে দিতে।

সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে প্রায় মেলার মতো ভিড় ছিল। শুনলাম প্রতিদিন নাকি বেশ কয়েকশো জমি-হস্তান্তর-দলিল নথিভুক্ত হচ্ছে। এসব দলিলে কী ধরনের দামটাম লেখা হচ্ছিল সে-সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিল না ; তবে তার একটা উদাহরণ শুনলাম যে এক বিঘে সুফলা আবাদী জমি নাকি বিক্রি হয়েছে আধ মণ চালের বিনিময়ে !

যেখানে শকুন আর লুটেরাদের রমরমা

কাঁথি থেকে বড়জোর আধ মাইলটাক দূরের একটি গ্রাম। প্রথমে সেখানেই গেলাম।

এরপর আমাদের কী ধরনের দৃশ্য যে দেখতে হবে এখানেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত পেলাম। পুকুরপাড়ে বাঁশঝোপের তলায় পড়ে আছে মানুষের একটা খুলি, আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু হাড়গোড়। শ্রীপতি সবে ঘূর্ণিঝড়ের বর্ণনা দিতে আরম্ভ করেছে। যে জন্য আমি ভেবেছিলাম ঘূর্ণিঝড়ে নিহত মানুষের দেহাবশেষ ওই হাড়গোড়। শ্রীপতিই শুধরে দিল, 'না, না, ঝড়ে নয়, হয়তো এ বেচারা ম্যালেরিয়া কিংবা অনাহারে মারা যাওয়া হতভাগ্যদেরই একজন। লাশটা বোধহয় কোথাও পড়েছিল। কেউ সৎকার করেনি। কুকুর আর শকুনে খেয়ে হাড়গোড় ছড়িয়ে রেখেছে।'

পুকুরের ওপারেই দেখলাম খাঁ-খাঁ করছে বেআরু ও জনমানবশূন্য একটি গ্রাম।

খানিক দূর এগিয়ে আরেকটি গ্রামে পেঁছিলাম। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বিধবা মহিলা। শতছিন্ন চটে নিজের শরীর যথাসম্ভব ঢেকেঢুকে। তাঁর কাছে থেকে জানা গেল, ওই এলাকায় শুধু গতমাসেই জ্বরে ভুগে মারা গেছে ডজনখানেক লোক। জানা গেল, মহিলাটি খেতে দিনমজুরের কাজ করে নিজের খরচ নিজেই চালাচ্ছেন ; আর তাঁর পরিবারের তিন মরদ ও এক মেয়ে গেছে কাঁথিতে— চাকরির খোঁজে।

ঘূর্ণিঝড়ের চিহ্নগুলো তখনও এত টাটকা যেন ঠিক আগের দিনই ঘটেছে। উপড়ে-পড়া গাছ-গাছালির শুকিয়ে-যাওয়া ডালপালা, এখানে-ওখানে হাওয়ায় কাঁপছিল খড়কুটো। বড় বড় কুঁড়েঘরের মাটির ভিতের ওপর তখনও গজায়নি ঘাস। পবিত্র তুলসি-ঝোপ তখনও সাজিয়ে রেখেছে উঠোনটাকে। এই উঠোন প্রায় এক শ্মশানের মতো অনাবৃত ও সমতল।

ঝড়ে আর বন্যায় সবকটি কুঁড়েঘরই কিন্তু উড়ে যায়নি বা ভেঙে পড়েনি। যে ঘরগুলো তখনও দাঁড়িয়েছিল তাদের ছাউনিগুলোয় বন্যায় ভেসে আসা কাপড়চোপড়ের টুকরো-টাকরা পড়ে পড়ে রোদ্দুরে পচছিল। গ্রামের চওড়া পথগুলো বহুমাস যাবৎ জনহীন থেকে থেকে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ঘাস আর বুনো ঝোপের তলায়।

নভেম্বরের সেই বিষণ্ণ গোধূলির নীরবতায়, ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল যেন চারপাশে স্তূপীকৃত এই মানব দুর্দশার গভীরতাকে ঠিকভাবে উপলব্ধি করার সমস্ত শক্তিই হারিয়ে ফেলেছি আমি।

পাঁচটা নাগাদ যে গ্রামটিতে আমরা পেঁছিলাম তার নাম জানুবসন। গোটা পাঁচেক বড়সড়ো কুঁড়েঘর তখনও দাঁড়িয়ে ছিল— আর আশপাশের ছড়ানো ধ্বংসস্তূপ ইঙ্গিত দিল আরো গোটা পাঁচেক ঘরের। বিশাল বিশাল গাছ ওপড়ানো অবস্থায় পড়েছিল কাছেই একটা সাময়িক ত্রাণ-শিবির থেকে সমস্ত লোকই চলে গেছে দেখা গেল। গাছের

ফাঁক দিয়ে অর্ধনির্মিত ত্রাণ-শিবিরটির মাটির দেয়ালগুলো দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওই দেয়ালগুলো পেরিয়ে বাকি পুরো এলাকাটাই জনমানবশূন্য ও পরিত্যক্ত মনে হল। আমরা সবে কুঁড়েঘরগুলো ঘুরে দেখতে শুরু করেছিলাম, এমন সময় প্রায় আকাশ থেকে পড়ার মতো আবির্ভূত হল এক দম্পতি। মেয়েটির পরনে ছিল নতুন কোরো শাড়ি— সম্ভবত লঙ্গরখানাগুলো থেকে বিতরণ করা সাধারণ কাপড়গুলির একটি; আর পুরুষটির পরণে ছিল খাটো একখানা ধুতি। বড়জোর গামছার চেয়ে একটু বড়। মনে হল তারা যেন সংগে করে নিয়ে চলেছে তাদের সমস্ত পার্থিব সম্পত্তি। অর্থাৎ কিনা, একটি ছোটো পোঁটলা আর একজোড়া মাটির মালসা। তারা আমাদের দেখতে পেয়েছে বলে মনেই হল না। যেন তারা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিয়ে এতটাই ব্যস্ত যে আর কোনকিছুর জন্য কোন সময় দেওয়াই সম্ভব নয় তাদের পক্ষে। আমরা ডাকাডাকি করতে বলল, তারা চলেছে কাঁথির দিকে। ধীরে আরো গুটিকয় প্রশ্ন করে ওদের পুরো বৃত্তান্ত জানা গেল। গ্রামটায় নাকি তিনশো লোকের বাস ছিল। বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে একশোরও বেশি লোককে। তারপর ম্যালেরিয়া আর এই অনাহারের ফলে মারা গেছে আরো বেশ কিছু। এখন নাকি শুধু তারা দুজনই বেঁচেবর্তে আছে। বাদবাকিরা বেঁচেছে শহরে পালিয়ে।

কিন্তু এই অসময়ে তারা কেন শহরের দিকে চলেছে? এর একটা লাগসই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তারা চলে যাচ্ছে ডাকাতের ভয়ে। দশদিন আগে এক রাতে ভিক্ষের চাল ফুটিয়ে নিচ্ছে তারা এমন সময় নাকি প্রায় জনা চল্লিশেক ডাকাত তাদের ওপর চড়াও হয়। দু-জনকেই বেধড়ক পেটায় ডাকাতরা। তারপর দু-দুটো দিন লোকটা নাকি মাথা তুলতে পারেনি এমন পিটুনি দিয়েছিল। ডাকাতের লুটের মাল বলতে ওই আধসেদ্ধ চাল আর শেষ দুটি কাঁসার বাসন। দম্পতির শেষ সম্বল। তাদের পরনের অপরিষ্কার কাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়েছিল ডাকাতেরা। টানা দুদিন লজ্জা নিবারণের একটা ত্যানা পর্যন্ত জোটেনি মেয়েটির।

ডাকাত আসার সময় ওরা যে কুঁড়েঘরটিতে ছিল সেটা দেখলাম। একেবারে ভাঙা-চোরা। ছাদের একটা অংশ উড়ে গেছে— আর দেয়ালে রচিত হয়েছে বড় বড় গর্ত।

দম্পতিটি দাঁড়াল না আর। আমরা গেলাম ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরগুলি ঘুরে দেখতে। উত্তরদিকের ঘরটি ছিল দোতলা। তখনও গোয়ালঘরের খুঁটিগুলোয়-বাঁধা ছেঁড়া দড়িগুলো দেখা যাচ্ছিল। ছিল জাবনা রাখার বিরাট বিরাট মাটির গামলা। তুলসিতলার পাশে ঢেঁকিটা প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছে বড় বড় ঘাসের তলায়।

মৃত্যুর ছায়া এসে প্রতিটি কুঁড়েঘরকেই করে তুলেছিল বিষণ্ণ। ভেতরে মানুষের ব্যবহার্য কোন জিনিসের চিহ্নমাত্র নেই। ছিল শুধু অন্ধকার। আর বিশ্রী একটা গন্ধ। ম্যালেরিয়ার চেয়ে আরো সাংঘাতিক কোন রোগ ওইসব জায়গায় দানা বাঁধছিল শুনলেও অবাক হতাম না আমি।

শ্রীপতি কথা বলছিল ডাকাত নিয়ে। বলল কোন্ একটা পল্লীতে নাকি বাইশ দিনে চল্লিশটা ডাকাতি হয়েছে।

অনামা সেইসব দেশপ্রেমী প্রাপ্য সম্মানটুকুও যাঁদের জোটেনি

'সরকারকে ধানের একটি দানাও নয়'— এ-ই ছিল গত অগাস্টে মেদিনীপুরের জনগণের সংকল্প। আর তাই কাঁথিতে, এক জোতদারের তিন-তিনটি গোলায় হাজার হাজার মণ ধান আগুনে পুড়েছিল একটানা সাত-সাতটা দিন ধরে। পরে, বাসে এক সহযাত্রী আমাকে বলেছিলেন যে তিনি নিজে নাকি পাঁচ শ' মণ চাল মাটির তলায় পুঁতে নষ্ট করেছিলেন। আরেকজন শোনালেন, 'আমার মজুত কত আছে তা সরকার যাতে জানতে না পারে সেজন্যে আটশোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।' আরেক জায়গায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা বাজারে যাওয়ার পথে বেশ কয়েক হাজার মণ চাল ফেলে দিয়েছিলেন নদীতে।

শুধু বিদেশী শাসনের প্রতি ঘৃণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মেদিনীপুরের জনগণ তখন বুঝতে পারেননি যে তাঁদের এই ক্রোধে সরকারের কোনই ক্ষতি হচ্ছে না— শুধু নিজেদের অনাহারের পথটা তৈরি করছিলেন তাঁরা। সরকারের হাতে চাল তুলে দেব না পণ করে সেই চাল তাঁরা তুলে দিচ্ছিলেন মজুতদারদের হাতে। সরকারের সংগে লড়তে গিয়ে তাঁরা এভাবে ঘরের শত্রুদের হাতই আরো মজবুত করে তুলছিলেন। স্বদেশপ্রেম এইসব মজুতদারদের ঘোলাটে লেনদেনগুলো ঢাকার পক্ষে ছিল খুব সুবিধাজনক একটা মুখোশ। কিন্তু এই 'দেশপ্রেমী'-রাই পরে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেনি একমুঠো খাদ্যের জন্য হাহাকার করতে থাকা ক্ষুধার্ত চাষীদের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দিতে।

খালধার দিয়ে যাবার সময়ে এক মিনিট অন্তর অন্তর হয় শ্রীপতি নইলে তারাপদ 'ওই যে, আরেকটা'— বলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল মাটিতে পড়ে থাকা খুলিগুলোর দিকে। শ্রীপতি ব্যাখ্যা করে বলল,— 'আজকাল আর পোড়ানোর বালাই-ই নেই। লাশগুলো স্রেফ খালে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন তো অন্ধকার হবার আগেই ঠিক দেখতে পাবেন নিদেন এক-আধটা লাশ ভেসে আসছে।'

'এই লোকটা নিশ্চয়ই খুব ধার্মিক ছিল!' বলল শ্রীপতি। আমাদের ডানদিকে কিছুদূরে জ্বলতে থাকা একটা চিতাকে লক্ষ করেই তার এই উক্তি। 'অবশ্যই ধার্মিক ছিল', বলল তারাপদ, 'তা নইলে এই দুর্দিনে মরেও কী করে কপালে সৎকার জুটল?'

গ্রামগুলো সবই পরিত্যক্ত। হাজারে হাজারে লোক খাদ্যের খোঁজে সব ছেড়ে চলে গিয়েছে। যারা পড়ে আছে তারা ভুগছে ম্যালেরিয়া, কলেরা আর অনাহারে। অন্যান্য বছর নভেম্বরে মাঠগুলো দেখে মনে হয় ধানের হাসিভরা সমুদ্র। 'ধানভরা খেত তো নয়, যেন সোনার পরাত…' উৎসাহে বর্ণনা করে যাচ্ছে শ্রীপতি,— 'ধানের একেকটা

শিষ পাকা কলার একেকটা কাঁদির চেয়েও বড়।' সেই একই কাঁথিতে খেতগুলো এখন মরুভূমির মতো ধু ধু করছে— আর দিগন্তে-দিগন্তে জ্বলছে শুধু চিতার আগুন। সামগ্রিকভাবে এরকমই ছিল কাঁথির ছবি।

যে পথ দিয়ে আমরা হাঁটছিলাম বিরাট একটা বিলের ধার ঘেঁষে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সেই পথ। মেরামতি না হওয়া বাঁশের সাঁকো, বাঁধানো পাড় এসব দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে রাস্তাটা গ্রামের কোন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। যাই হোক, ছ-টি ঘণ্টা ওই রাস্তা দিয়ে ঠায় হেঁটে আমরা মোট আটজনের বেশি লোকের দেখা পেলাম না। এদের মধ্যে দু-জন ভিন গাঁয়ে তাদের আত্মীয়ের সংগে দেখা করে বাড়ি ফিরছিল; আর বাকি ছ-জনকেই দেখলাম বিলের নোংরা হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে মাছ ধরায় ব্যস্ত। প্রায় পুরো পথটাই ঢেকে গিয়েছিল ঝোপেঝাড়ে। গেল বর্ষার পর এই পথ দিয়ে কেউ হেঁটেছে বলেই মনে হচ্ছিল না।

আমরা হাঁটছিলাম দক্ষিণ অভিমুখে। রাস্তায় দু-জন জানাল, আমাদের গন্তব্যস্থল অর্থাৎ গোপালপুর যেতে হলে প্রথমে মাইল দু-য়েক বড় রাস্তা বরাবর পশ্চিমে যেতে হবে, এবং তারপর দক্ষিণের দিকে আরো পাঁচ কি ছ-মাইল হাঁটতে হবে।

এই পথনির্দেশ অনুযায়ী পশ্চিমের দিকে প্রায় আধ-মাইল হাঁটার পর আমরা খেজুর আর নারকোল গাছে ঘেরা একটা জায়গায় এসে পেঁছিলাম। মনে হল কোনো এক সময়ে এখানে বসতি ছিল। কিন্তু এখন এখানকার রাস্তাঘাটে গজিয়ে উঠেছে কোমর অবধি উঁচু ঘাস আর ঝোপ। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে কিছুদূরে কাদাভর্তি একটা নিচু জমির দিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ— কিন্তু কোন পায়ের চিহ্ন পেলাম না সেখানেও। আমাদের উপস্থিতিতে ভয় পেয়ে কয়েকটা বড়সড় ব্যাঙ কাদার ওপর লাফিয়ে পড়তে লাগল। তারাপদ প্ল্যান করল গ্রামের ভেতর ঢুকে পরিত্যক্ত কোনো কুঁড়েঘরে রাতটা কাটাবে। আর শ্রীপতি ওদিকে তেষ্টার কথা বলছে। কিন্তু আমরা কিছুতেই রাস্তা খুঁজে পেলাম না। তারাপদ চিৎকার করতে লাগল। যাতে কেউ শুনতে পায়। কিন্তু কোন উত্তর নেই। তবু হাল ছাড়বে না তারাপদ। শেষকালে পরামর্শ দিল, অন্য একটা রাস্তা খুঁজে বের করা উচিত।

অন্য রাস্তা ধরে কিছুক্ষণ এগিয়ে আমরা যে জায়গাটায় এসে পেঁছিলাম সেটা শ্মশান বলেই মনে হল। একটা খেজুর গাছ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। গাছটার মাথা সম্ভবত ঝড়ে উড়ে গিয়েছে। তার নিচে ভাঙা কলসী, ছেঁড়া মাদুর, বিছানার চাদর-টাদরের টুকরো— অর্থাৎ শবদাহের শেষ চিহ্নগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। আর ছিল অসংখ্য হাড়ের টুকরোর সংগে পড়ে থাকা কম করে সতেরোটি নর-করোটি!

'গ্রামের ঘরগুলোতেও নির্ঘাত দেখব কিছু কংকাল শুয়ে আছে।'— একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করল শ্রীপতি।

আমার আর ইচ্ছেই করছিল না এগোতে। মনে হচ্ছিল যেন ভুলেই গেছি কোথায়

যাব। সন্দেহ হচ্ছিল এইভাবে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত অবধি হেঁটে গেলেও আর কোন জীবন্ত মানুষের সংগে আমাদের দেখা হবে কি না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আকাশে দেখা যাচ্ছিল একটি-দুটি তারা। সন্ধ্যাকাশের আলোর শেষ রেশটুকুও ঢাকা পড়ে যাচ্ছিল হেমন্তের কুয়াশায়। শ্মশানঘাটের ওদিকের কুঁড়েঘরগুলিতে কোন্ আলো জ্বলছে না। সাধারণত বছরের এই সময়ে গ্রামের ধর্ম-পরায়ণা গৃহবধূরা মৃত পূর্বপুরুষদের স্মরণে বাঁশের আগায় জ্বালিয়ে রাখেন আকাশ-প্রদীপ। আর শাঁখ ও ঘণ্টার আওয়াজ সান্ধ্য পরিবেশে এনে দেয় আশ্চর্য এক ইন্দ্রজালের ছোঁয়া। প্রতিটি মসজিদ থেকে ভেসে আসে আজানের প্রলম্বিত সুর। আর খেজুর-রস পাড়ানিরা ব্যস্ত হয়ে পড়ে খেজুর গাছগুলো থেকে রস যোগাড় করতে। কিন্তু এখানে সবই নিশ্চুপ! একটিও জীবন্ত ব্যক্তি চোখে পড়ে না! গ্রামের পথের ধুলো এতটুকুও আন্দোলিত করে না কারো পায়ের ছাপ!

যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও জনবসতির চিহ্নমাত্র খুঁজে পেলাম না। চারদিকে শুধু আদিগন্ত ধূ-ধূ মাঠ। হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা ব্যথা অনুভব করছিলাম আমি। কীভাবে কাঁদতে হয় আমি জানি না। তবু চারদিকের এই গভীর সন্তাপ দেখে বিচলিত হবার প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতাটুকু আমি হারিয়ে ফেলি নি। চারদিকে অমূল্য মানবজীবনের এই অবাধ বিনাশের চিহ্নগুলি ফুটে উঠতে দেখে, এক মুহূর্তের জন্য মনে হল খোদ জীবনের প্রতিই সব বিশ্বাসটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছি আমি।

মেদিনীপুরের জনগণ তাঁদের জীবন-রক্ত দিয়ে লিখে গিয়েছেন আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কয়েকটি গৌরবময় পৃষ্ঠা। এই গতকালই যাকে তাঁরা 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলে মনে করেছেন তার জন্য নিজেদের শেষ করে ফেলতেও পেছপা হননি। শৌর্য ও চরম ত্যাগের এই কাহিনী আমাদের জাতীয় আন্দোলনের মহত্তম ট্র্যাজেডিগুলির অন্যতম।

আর আজ সেই তাঁরা এবং তাঁদের সন্ততিরাই তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছেন একেবারে আমাদের চোখের সামনে। এই অজ্ঞাত যোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের সামান্য দেশপ্রেমিকসুলভ কর্তব্যটুকুও কি আমাদের জাতি আজ হারিয়ে ফেলেছে? মেদিনীপুরের গেরিমাটির এই সন্তানেরা আজ হাজারে হাজারে মারা যাচ্ছেন। তাঁদের শবদেহ সৎকারের জন্যও পাশে কেউ নেই। গতকাল আমাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন এই এঁরাই, আর তাঁদেরই দেহ আজ কুকুর আর শকুনের খাদ্যে পর্যবসিত হয়েছে। একটা গোটা জাতি তার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কি এভাঁবেই সম্মান জানায়?

আমরা সবাই একজোট হয়ে যদি এঁদের সামনে দুমুঠো অন্নও তুলে ধরতে না পারি মৃতেরাই তখন উঠে আসবেন আমাদের ধিক্কার দিতে।

ছোট্ট কালো পুতুল

আমরা এগোতে থাকলাম। হঠাৎ ছোট একফালি জমিতে সোনালি ধান দেখতে

পেয়ে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম, মৃত্যু আর ধ্বংসের মাঝে জীবনের এই ছোট্ট মরূদ্যানটিকে কারা এভাবে ফেলে রেখে চলে গেছে! মনে পড়ে গেল শহরে দেখা সেই ভাগ্যহীনদের কথা যারা খুব স্নেহভরে বলছিল ফসলের কথা। নিজেরাই ভাগচাষে ফলিয়েছিল যে ফসল। ফসল কাটার সময় অবধি গ্রামে থাকতে পারেনি তারা। কে জানে কোন্ শহরে একমুঠো খাবারের জন্য নিজেদের দেহ পর্যন্ত বিকিয়ে দিচ্ছে ওই হতভাগ্যরা? এই সোনালি ফসল তো তারাই ফলিয়েছিল মেহনত করে।

নির্জন গ্রামটির অপরদিকে লোকজনের থাকার সম্ভাবনা নিয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শ্রীপতি, কিন্তু তারাপদ হঠাৎ চিৎকার করে উঠল— 'আরে দ্যাখো দ্যাখো, ধানখেতে কী একটা নড়াচড়া করছে?' একটি বাচ্চা ছেলে, বছর ছয়েকের হবে, বসেছিল ওই পাকা ফসলের মাঝখানে। বেলাশেষের নেমে আসা অন্ধকার প্রায় পুরোপুরি ঢেকে ফেলেছিল তাকে। শুধু তার ছোট্ট ভীতু-ভীতু চোখ দুটো জেগে আছে, জ্বলজ্বল করছে। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না সেই দৃশ্য! আমাদের ডাকে এগিয়ে এল ছেলেটি —হাড়ের তৈরি একটি ছোট্ট কালো পুতুল।

তার কাহিনী জানা গেল ক্রমে, ধীরেসুস্থে একের পর এক প্রশ্ন করে। বাবা মারা গেছে জ্বরে, মা কলেরায়। বড় ভাই কোন হদিশ না রেখে বেপাত্তা। দশ বছর বয়সের আরেক ভাই দক্ষিণে আরেকটা গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চাকরের কাজ নিয়েছে। অ্যাদ্দিন ওই ভাই যা পেত, তা থেকেই ভাগ করে খেত দুই ভাই। কিন্তু গত দুদিন তাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। সে খিদেয় কাঁদছিল বলে তাকে মারা হয়েছে। এখনও তার বাঁ-হাতে ব্যথা। শেষকালে সবাই মিলে তাড়িয়ে দিয়েছে তাকে। তার কেউ নেই। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সে যেতে পারে। দুপুর রোদের গরমে ক্লান্ত হয়ে সে বসেছিল ওই ধানখেতে—যেখানে তাকে খুঁজে পেলাম আমরা।

'হ্যাঁরে, খোকা, তোর দাদার কাছে ফিরে যাবি?' তারাপদ প্রশ্ন করে।

'যাবনি।' সজোর আপত্তিতে মাথা নাড়িয়ে বাচ্চাটি জবাব দেয়।

'ওকে আর ওখানে ফেরত পাঠিয়ে কী লাভ?' বলে ওঠে শ্রীপতি, 'ওরা ফের তাড়িয়ে দেবে ওকে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে মনে পড়ল আমরা যে কংগ্রেসী নেতার সংগে দেখা করতে যাচ্ছি তিনি তাঁর গ্রামে একটা অনাথ আশ্রম খুলেছেন। বাচ্চাটিকে আমরা অনাথ আশ্রমের কথা বোঝালাম 'খিচুড়ি', কাপড় আর থাকার জায়গার কথা বললাম। সে সংগে সংগেই রাজি হয়ে গেল যেতে।

বাচ্চাটির নাম অনন্ত। ওর বাবার নাম ভরত।

কবরখানার মতো অন্ধকার ও বিষণ্ণ এক পরিত্যক্ত মাঠে এই একরত্তি জীবন্ত মানুষ আবিষ্কার করে আমি খুবই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। তাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলাম আমি। ব্যাজারভাবে জবাব দিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। কিছু পরে বুঝলাম এইসব ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ও খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা বহুবার ওকে আমাদের কোলে উঠতে বললাম, কিন্তু একগুঁয়েমি করে কিছুতেই রাজি হল না।

তারাপদ বলল, 'যা হয় হোক, এবার প্রথম যে ঘরটা চোখে পড়বে সেখানেই রাত কাটাব।'

আশ্রয়ের সন্ধানে

এতক্ষণ আমাদের ধারণা ছিল পশ্চিমমুখো থেকে রাস্তাটা দক্ষিণ দিকে বেঁকবে। কিন্তু ওটা বাঁক নিল উত্তর দিকে। একটা পুকুরকে পাশ কাটিয়ে রাস্তাটা সোজা প্রায় মাইল দেড়েক চলে গেছে দেখলাম। প্রথম যে কুঁড়েঘরটি আমাদের পথে পড়ল তার সামনে কাঠাচারেক জমিতে ধান ফলে ছিল।

'কে ওখানে? কী চাই?' আমাদের সাড়া পেয়ে গম্ভীর গলায় কে একজন বললেন।

'একটু খাবার জল…' বলল শ্রীপতি।

'জল নাই।' কিছুক্ষণ পরে জবাব এল।

গোপালপুর কোনদিকে যদি একটু বলে দেন!' চেঁচিয়ে জানতে চাইল তারাপদ।

'প্রথমে পশ্চিমে যান, তারপর দক্ষিণে।'

'আমাদের অল্প একটু খাবার জল দিতে পারবেন না?'

শ্রীপতি আবার অনুনয়ের সুরে বলল।

কোন উত্তর নেই; শুধু খুব নিচু গলায় কে যেন দু-একবার কাশলেন।

আরো মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর ভাঙাচোরা বাড়ি ও উপড়ে পড়া গাছপালার স্তূপে ঘেরা এক চিলতে উঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট একটা কুঁড়েঘরের সামনে এলাম। ভেতরে আগুন জ্বলছিল। ডাকামাত্র সাড়া পেলাম। বেরিয়ে এলেন দুজন মাঝবয়সী মহিলা। তাঁরা শ্রীপতিকে জল দিলেন। জল খেয়ে শ্রীপতি মন্তব্য করল—'কী দুর্গন্ধ জলে! আর তেমনি বিচ্ছিরি খেতে!'

কুঁড়েঘরটিতে পুরুষ বলতে একজন, জ্বরে ভুগছেন তিনি। মহিলাদুটি আপাতত মাছ বেচে চালাচ্ছিলেন—যদিও তাঁরা কৃষক। তাঁদের নিজেদের প্রায় বিশ বিঘে জমি রয়েছে—কিন্তু বর্তমানে সে সবই পড়ে আছে অনাবাদী। প্রায় তিনমাস পরে মাত্র হপ্তা-খানেক আগে তাঁরা মেদিনীপুর শহর থেকে ফিরেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে এখন কিছু সাহায্য পাচ্ছেন।

ওই ঘরটিতে রাত কাটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব হল না। কুঁড়েঘর না বলে ওটিকে হোগ্‌লার ছাউনি বলাটাই ঠিক হবে।

আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম। আরো কিছুটা যাওয়ার পর দেখলাম অন্য একটা রাস্তা দিয়ে কাঁথির হাট থেকে ঘরে ফিরছেন দুজন গ্রামবাসী। একজনের কাঁধে বাঁক, বাঁকের

একদিকে আধটিন কেরোসিন ও আরেকদিকে আধটিন গুড়। আরেকজন মাথায় করে বইছে একগোছা কাপড়। আমাদের রাতের আশ্রয়ের সমস্যাটার কোন সুরাহার আগেই অবশ্য আবার তাদের আর আমাদের পথ আলাদা হয়ে গেল। তবে আমাদের ছেড়ে যাবার আগে তারা একটা উপায় বাত্‌লে দিয়ে গেল : কাছেই নাকি প্রধানদের বাড়ি যাঁরা স্থানীয় জমিদার এবং আতিথেয়তার জন্য নাকি এ-অঞ্চলে অনেককাল যাবত তাদের সুনাম আছে। আগেকার দিনের লোক যদিও প্রায় কেউই আর বেঁচে নেই, তবু তাঁদের অল্পবয়সী নাতিরা নাকি এখনও পরিবারের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সদাই প্রস্তুত। এই সুখবরে তারাপদ আর শ্রীপতি দুজনেই শিশুর মতো খুশি হয়ে উঠল। অনন্ত নামে যে শিশুটি আমাদের সংগে ছিল তার মধ্যে কিন্তু বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

কেরোসিনের আলোয় একটি একতলা বাড়ির বারান্দায় মাদুরের ওপর বসেছিলেন কয়েকজন। থামের গায়ে হেলানো তিনটি কালো থেলো হুঁকোও চোখে পড়ল। তারাপদ আর শ্রীপতি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল; কিন্তু অনন্ত চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইল রাস্তায়। বড়ো বড়ো বাড়ি থেকে তাড়া খাওয়াটা হয়তো এরমধ্যেই বেচারির ছোট্ট জীবনে সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতাগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে!

তারাপদ এবং গৃহস্বামীদের মধ্যে কি কথা হল আমি জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে নিজেই আমাদের বারান্দায় ডাকল। বলল মাদুরের ওপর গিয়ে বসতে। অল্প বয়সেই বুড়োটে হয়ে যাওয়া এক যুবক (—যিনি, পরে শুনলাম, ওখানকার স্থানীয় ডাক্তার এবং প্রধানদের এক বন্ধু) বাচ্চাটার কাহিনী শুনে মন্তব্য করলেন, 'এরকম কতোই না হচ্ছে— কেউ আর গা-ই করে না!'

আমরা ওঁদের জানালাম যে আমাদের গন্তব্য গোপালপুর ওঁরা-জানালেন— 'সে তো এখান থেকে অন্তত চার মাইল দূরে!' —তারপর বললেন, 'যদি চান তো এখানে না হয় কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে যান! তারপর হেঁটে চলে যেতে পারবেন— খুব একটা বেশিক্ষণ লাগবে না···আর এই বাচ্চাটা? এর জন্য কিছু করার ক্ষমতা সত্যিই নেই।'

এ তো নয় কংগ্রেসের পথ

এদিকে, জনাকয়েক যুবক, এর মধ্যেই কাছে এসে বসেছে (প্রধান পরিবারের লোকজনও ছিল) এবং কথার ফাঁকে-ফাঁকে তাঁরা আমাদের কাগজপত্র, স্কেচ্ এইসব দেখতে লাগল। দেশের হাল এই কঠিন সময় প্রভৃতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। ডাক্তারটি থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। যেন আলোচনার বিষয়টা নয় অন্য কিছু ব্যাপারেও তিনি খুব উদ্বিগ্ন। প্রায়ই থেকে-থেকেই আনমনা হয়ে পড়ছিলেন তিনি।

আধঘণ্টার ভেতরেই ওঁরা আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের মোটামুটি একটা ধারণা পেয়ে গেলেন। হঠাৎ টের পেলাম একটা জানলার ওপাশ থেকে এক বৃদ্ধা আমাদের দিকে

ঠায় তাকিয়ে আছেন। প্রধানদের ভেতর যে যুবকটি বয়সে সবচেয়ে বড়ো বন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে একবার উঠে গেল সে। কিছুক্ষণ বাদে ফিরে এসে চুপ করে বসে রইল।

এদিকে বাচ্চাটির জন্য আমি খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলাম। কিছু না খেয়ে কী করে রাত কাটাবে ও? যথেষ্ট বিনয়ের সংগে আমি আবেদন করলাম 'বাচ্চাটাকে দয়া করে কিছু খেতে দিন!'

ডাক্তার খুব শান্তভাবে জবাব দিলেন, 'দেবার মতো কিছুই তো নেই আমাদের। সন্ধের আগেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যায়। তাছাড়া আপনাদের ভাগ্য ভালো যে আজ এ সময়ে আমাদের পেয়েছেন। আজকাল সাধারণত আমরা গ্রামে রাত কাটাই না।' প্রধান-ভায়েদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বড়ো তিনি অবশ্য বললেন: 'যাইহোক, অন্দরে ওরা দেখছে অপনাদের সবার জন্যে কিছু রাঁধা-টাঁধা যায় কিনা'। ডাক্তার কিন্তু বলেই চললেন তাঁর কথা, যেন কিছুই তিনি শোনেননি।

'আসলে ফসল কাটার সময় কাছে বলেই আমাকে মাঝেমাঝে এক-আধবার আসতে হয়; তা নইলে আজকাল কেউ গ্রামে থাকতে চায় না— চারদিকে এইসব ডাকাতদের মাঝখানে।' একটু থেমে ভদ্রলোক বললেন, 'যত নষ্টের গোড়া মশাই ওই কংগ্রেস। কংগ্রেসই পথ দেখিয়েছে চোর-ডাকাতদের। আর কংগ্রেসের জন্যেই আমাদের আত্মরক্ষার শেষ সম্বল যে বন্দুক সেটাও হাতছাড়া হয়েছে। আর, এ বছর তো মনে হচ্ছে ফসলটাও ঘরে তুলতে পারব না।...'

তারাপদ আর আমি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই অন্যায় গালিগালাজে যথেষ্ট বিরক্তিতে শিহরিত হতে লাগলাম। আর বেচারা শ্রীপতি অসহায়ভাবে সকলের দিকে তাকাতে লাগল। না, না, কংগ্রেস কখনোই চোর ডাকাতকে রাস্তা দেখাচ্ছে না! আপনারা কি খবরের কাগজ পড়েন না? আপনারা কি গান্ধীজীর প্রতিবাদ, সরোজিনী নাইডুর বক্তব্য এসব পড়েননি?'

আমাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ডাক্তারকে ধাক্কা দিতে পারল মনে হল। প্রায় ঘণ্টা দুই লেগে গেল ডাক্তারসমেত সবাইকে এ-কথাটা বোঝাতে: কিছুদিন আগে যে 'স্যাবোটেজ' দেশটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল সেটার সংগঠক গান্ধীজী নন, কংগ্রেস নয়, বরং কংগ্রেস নামধারী কিছু অসাধু লোক, সি. এস. পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। আমরা তাঁদের একথাও বোঝাতে সক্ষম হলাম আজ যারা ভিখিরির হাত থেকে তার শেষ একমুঠো খাবার ছিনিয়ে নিচ্ছে, সর্বহারা স্ত্রীলোকের অংগের শেষতম চটটুকুও ছিনিয়ে নিচ্ছে, তারা ডাকাত নয়, নিছকই সাধারণ চাষী-টাষি। স্রেফ খিদের তাড়নায় এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বন্দুক দিয়ে এদের থামিয়ে রাখা যাবে না; এদের ক্ষুধার্ত হাতের মুঠো থেকে ভাতের থালা বাঁচানো বন্দুকের কম্মো নয়। শুধু এক মুঠো খাবারই তাদের শান্ত করতে পারে। খিদের তাড়নায় মরিয়া হয়ে উঠে, এরা যাদের খপ্পরে পড়েছে তারা দেখতে চায় দেশটা জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাক। আমাদের কর্তব্য হল সত্যিকারের সৎ এই দেশসেবকদের ওই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে উদ্ধার করা। এদের জন্য দুমুঠো

অন্নের ব্যবস্থা করে। সামনের আমন-ফলনের সময়ই তা না করতে পারলে আপনাদের মতো লোকদেরও আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না। শুধু তাই নয়— রক্তগঙ্গা বইবে সারা দেশে। সঙ্গে থাকবে আমাদের প্রভুর গুলি, জাপ-আগ্রাসন আর বোমা।

প্রত্যেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং উৎসাহের সংগে প্রশ্ন করে করে পরিষ্কার করে বুঝে নিচ্ছিলেন নানান প্রশ্ন ও খটকা। জীবনের সমস্যা তাঁদের কাছে এতটাই বাস্তব হয়ে উঠেছিল যে সমস্ত একাগ্রতা নিবন্ধ হয়েছিল কোন-না-কোন সমাধানের ওপর, নিছক দলাদলির ওপর নয়।

'আজ অনেক কিছুই একটা নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখলাম।' বললেন ডাক্তারটি। ভদ্রলোক আমাদের কাগজগুলো উৎসাহ নিয়ে পড়া শুরু করলেন। কিন্তু আলোচনা শেষ হবার কিছু পরেই তাঁর মুখে আবার নেমে এল সেই অসহায়তার ছাপ। একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝিমিয়ে পড়লেন। প্রধানদের বড়ো ভাইয়ের চোখে অবশ্য একটা নতুন আভা দেখা যাচ্ছিল। শ্রীপতি তাঁকেও এই জমাটি আলোচনাটার মধ্যে টেনে আনতে পেরেছিল। শুধু ডাক্তারটিই সমস্ত আত্মবিশ্বাস, স্বাধীনভাবে এগিয়ে চলার সমস্ত শক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছিল। হাঁটু মুড়ে, দু-হাতে হাঁটু-দুটি জড়িয়ে ধরে বসে বসে তিনি বাইরের অন্ধকারের দিকে ফাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। দেশপ্রেম যে শক্তির সঞ্চার করে সেই শক্তি কখন যে তিনি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছিলেন তা জানি না। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল পরাজয়বাদ ও আদর্শচ্যুতির এক প্রতিমূর্তি বিশেষ। মানুষকে এই অবস্থায় দেখলে করুণার চেয়ে বড় বেশি লজ্জা হয় আমার। কিন্তু এ-কথা স্বীকার না করেও উপায় নেই, ওই ডাক্তারটি ছিলেন মেদিনীপুরের মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রতীক-স্বরূপ—অন্তত ওই নভেম্বরে আমি তাঁদের যেমন দেখেছি। ভবিষ্যতের কথা আলাদা।

রিলিফের একটি দানাও ওরা নষ্ট করে না!

পরদিন ভোরে সূর্যোদয়ের আগেই আবার পথে নামলাম আমরা। আরো চার মাইল যেতে হবে। ভেবেছিলাম বাচ্চাটাকে সকলেই কোলে করে-করে নিয়ে যাব। কিন্তু একগুঁয়েভাবে ও নিজেই রাজি হল না কোলে চড়তে।

প্রথম যে লোকটিকে আমরা রাস্তায় দেখি সেই মাঝবয়সী মানুষটি ছিল সম্পূর্ণ উলঙ্গ। জাল দিয়ে খাল থেকে মাছ ধরছিল সে। হয়তো কাছেপিঠে কোথাও গামছাখানা খুলে রেখেছে। কাজ সেরে গা শুকিয়ে পরবে বলে। যদিও সেই মুহূর্তে, খালের ধারে, ঝোপঝাড়ের মাঝখানে, উলঙ্গ মানুষটিকে দেখে অতি প্রাচীন যুগের কথা মনে পড়ে গেল। আর মনে হল এ-যেন যা-কিছু এখনো আগামী এ কেবল তারই এক পূর্বাভাস। যেন সমাজের ত্বরিত ভাঙনের একটি দৃষ্টিকোণ মাত্র।

মাছ ধরায় ব্যস্ত এমন আরো কিছু পুরুষ ও স্ত্রীলোকের দেখা পেলাম রাস্তায়।

প্রায় সকলেই উলঙ্গ, কালো চামড়া ঠেলে ফুটে ওঠা কয়েকটি হাড়ের শরীর। তাদের কোটরগত চক্ষু নিবন্ধ কর্দমাক্ত জলের ওপর— আর শিশুদের লোভাতুর দৃষ্টি নিবন্ধ তাদের মায়েদের ব্যস্ত হাতগুলির দিকে। অবশ্য এরকম লোকজনও খুব বেশি দেখতে পেলাম না। চার মাইলের ভেতর বড়জোর দশ কি বারোজন।

নতুন ফসল, যার প্রতিটি শিষ প্রায় কলার কাঁদির মতো লম্বা, সেই নতুন ফসল— ফলে আছে— তবে এখানে-ওখানে ছড়ানো সামান্য কয়েক কাঠা জমিতেই। আর বিঘের পর বিঘে পড়েছিল অনাবাদী।

অতি-লাজুক তিনজন চাষী-বৌ কলসী করে জল বয়ে আনছিল। কোথা থেকে? মাইল দেড়েক দূরের গোপালপুর থেকে। আরো মাইল খানেক গেলে তবে তাদের ঘর।

পরে আমরা জেনেছিলাম যে গোটা কাঁথি মহকুমায় নাকি পানীয় জলের ভীষণ অভাব— বিশেষ করে ভেতরের গ্রামাঞ্চলগুলিতে। বন্যার পর পুকুরগুলোর জল হয়ে গিয়েছিল নোংরা ও তেতো। অনেকগুলো পুকুরে বড় বড় গাছ পড়ে পচছে দেখেছিলাম। আর ত্রিশ-চল্লিশটা করে গ্রাম নিয়ে গড়া একেকটা ইউনিয়নে ছিল মাত্র তিনটি, চারটি কি বড়জোর ছ-টি টিউবওয়েল। ফেরার পথে আমরা একটা ভাঙা টিউবওয়েল দেখতে পাই। আরো কতো টিউবওয়েল ওইরকম ভেঙে গেছে তা কেই বা জানে!

অনাহার আর ম্যালেরিয়ার ওপর জলাভাব! দুর্বল ও ক্ষীণ শরীরে ক-জন পারে মাইলের পর মাইল জলভরা কলসী বইতে? একটা দেশলাই-এর দাম যখন ছ-পয়সা, ক-জন পারে তখন খাবার জল ফুটিয়ে নিতে?

শুনেছিলাম কলকাতার মেয়রের তহবিল থেকে নাকি এক লক্ষ টাকা নলকূপ-খননের জন্য ধার্য হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি কিছুই। কয়েক জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে ত্রাণকার্যের জন্য পুকুর খোঁড়া হয়েছিল ঠিকই তবে তা নামকাওয়াস্তে, অযত্নে কাটা সেইসব পুকুরের পাড় বারকয়েক বৃষ্টির পরেই ধ্বসে গিয়েছিল— আর বাইরের জমা বৃষ্টির জল ঢুকে সেই পুকুরগুলোকে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলে শুধু। এছাড়া আর কোন কাজই হয়নি।

আমি কখনও ভুলব না পথে দেখা তৃষ্ণার ছোট্ট অথচ মর্মস্পর্শী সেই ছবিটি। মরা একটা বটগাছের তলায় বসে আছে অবিন্যস্ত এক বৃদ্ধা— তাঁর হাড় বের-করা হাতদুটি একটি কলসীর ওপর রাখা— মাথার ওপর জ্বলছে মধ্যাহ্নগগণের খর সূর্য – আর একফোঁটা জলের চিহ্ন নেই কোথাও···

অসাধারণ কিছুই নয়! হয়ত বৃদ্ধার শুকিয়ে যাওয়া ও কোঁচকানো চামড়া, ফুলে-ওঠা শিরা-ধমনী আর জ্বলন্ত, টকটকে লাল চোখ আমার পক্ষে একটু বেশিই মর্মস্পর্শী হয়ে থাকবে! কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই যে বৃদ্ধাটিকে দেখে আমি হৃৎপিণ্ডের কাছে তীক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম।

একফোঁটা খাবার জলও যেখানে নেই—সেখানে যে ভিখিরির শেষ অন্ন, স্ত্রীলোকের

লজ্জা-ঢাকার শেষ বস্ত্রখণ্ডটাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এতে অবাক হবার কী আছে !

হায়, মেয়র সাহেবের ত্রাণ তহবিলের লক্ষ টাকা !…

সকাল আটটা নাগাদ আমরা গোপালপুর পেঁছিলাম। গাছপালার আড়ালে ঢাকা একটি গ্রাম যার চারপাশ দিয়ে সাত-আট কিউবিকফুট গভীর ও দশ-পনেরো কিউবিকফুট চওড়া একটি খাল বয়ে গেছে। দক্ষিণে, দূর দিগন্তের কাছে সমুদ্রকে সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে দেখা যাচ্ছে যেন রূপোর তৈরি একটি সরু তার। ডানদিকে প্রায় মাইল তিনেক দূরে দেখা গেল ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত একটি গ্রাম আর, ধ্বংসস্তূপের মাঝে ইতস্তত উপড়ে-পড়া গাছের নিস্পন্দ শাখা-প্রশাখা। একদিকে বেশ অনেকটা জায়গা জোড়া বালি-জমি চোখে পড়ল। আমাদের বলা হল, একসময় ওখানে নাকি বড়ো একটা গ্রাম ছিল—ঘূর্ণিঝড়ের পর শুধু ওই বালিই রয়ে গেছে চিহ্ন হিসাবে।

এখানে-ওখানে ছোট ছোট দু-এক টুকরো জমি ভরে আছে ধানে। সেপ্টেম্বরে বোনা বীজ নভেম্বরের গোড়াতেই পাকা ফসল ফলেছে।

আর রাস্তার ধারে বসে এক বুড়ি বিধবা তাঁর শীর্ণ আঙুলে করে শ্যামাঘাসের বীজ তুলছিলেন। তিনঘণ্টা চেষ্টা করেও তিনি একমুঠোও জড়ো করতে পারেননি। খাবার বলতে ওইটুকুই এখন বৃদ্ধার সম্বল। মাঠের মাঝখান দিয়ে এক পুরুষ ও নারী মাথায় করে শাপ্‌লার ফুল আর লতা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এদেরও খাবার বলতে এখন আর কিছুই নেই নেই।

আর আশ্চর্যের কথা হল, সরকার এই সব জায়গার জন্য ত্রাণের কোন বন্দোবস্তই করেননি ! কারণ রিলিফের চাল আটা তাঁরা একফোঁটাও নষ্ট করতে রাজি নয় !

ছিনিয়ে নিয়েছে পতাকাটা

এমন কিছু মানুষ আছে কোন কিছুতেই তাদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায় না। এমনকি ঘোরতর নৈরাশ্যের চাপের মধ্যেও তাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায় না।

গোপালপুরের কংগ্রেসী নেতাটি ঠিক এই ধরনের মানুষ। এখানে আমরা তাঁকে যতীন্দ্র দাস বলেই উল্লেখ করব। প্রায় বছর চল্লিশ বয়স ভদ্রলোকের। দোহারা চেহারা, গায়ের রঙ বেশ উজ্জ্বল। ছোটভাই এবং মাঝবয়সী দুজন প্রতিবেশীর সংগে ভদ্রলোক বসেছিলেন তাঁর নতুন তৈরি কুঁড়েঘরের বারান্দায়। আমাদের দেখামাত্রই তিনি দুহাত বাড়িয়ে তারাপদকে অভ্যর্থনা জানালেন।

আসতে-আসতে ভদ্রলোক সম্পর্কে অনেক কথাই তারাপদ বলেছিল রাস্তায়। ঘূর্ণিঝড় এবং তারপরেই বন্যায় সবকিছু, এমন কি একমাত্র শিশুটিকেও, হারানোর পর তিনি ও তাঁর স্ত্রী কোনক্রমে পালিয়ে বেঁচেছিলেন। কাঁথিতে পদার্পণ করা মাত্র তাঁকে বন্দী করা হয়। ভিজে কাপড়গুলো বদলাবার সময়টুকুও দেওয়া হয়নি তাঁকে। নিজেই

পরে আমাদের শোনালেন এসব, এবং সেই একইরকম হাসি মুখে, যেন সমস্ত ব্যাপারটা ছিল একটা নিছক তামাশা। মাত্র কয়েকদিন আগে ছাড়া পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের গ্রামে ফিরে আসেন এবং ফিরেই দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের ঠিক কেন্দ্র-স্থলে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই অনাথ আশ্রমটি তাঁর সেই কঠিন সংগ্রামের ধরাছোঁয়ার মতো প্রথম ফল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আলাপ জমিয়ে ফেললেন ভদ্রলোক। মনে হল কতকালের চেনা যেন।

গোড়া থেকেই ভদ্রলোক চেষ্টা করছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক আলোচনা এড়িয়ে যেতে। যে-মুহূর্তে আমরা রাজনীতি সংক্রান্ত কোন কথা বলতে যাচ্ছিলাম— তৎক্ষণাৎ উনি হেসে কোন বুদ্ধিদীপ্ত বক্রোক্তি করে ভেঙে দিচ্ছিলেন আলোচনার বিষয়টাকে।

আমরা প্রথমটায় বুঝতেই পারিনি ভদ্রলোক কংগ্রেসী নেতা, তদুপরি খুবই জনপ্রিয় এবং নিজের অঞ্চলে বিশেষ গণ্যমান্য হলেও হাজারো লড়াই আর টানাপোড়েনের ফলে রাজনীতি তাঁর কাছে এখন একটা ব্যাধির মতো হয়ে উঠেছে। 'কোন রাজনীতি নয়, দোহাই আপনাদের। বরং যদি পারেন তো বলুন কী করে আরো আরো বেশি সাহায্য যোগাড় করা যায়।' বলছিলেন তিনি। আর, কথাগুলো উচ্চারণ করার সময়ে তাঁর মুখের হাসি দেখে আমার মনে হচ্ছিল যে ত্রাণের নামে বাংলায় যে অনন্য প্রহসন অভিনীত হয়ে চলেছে তারই উল্লেখ করছিলেন তিনি। নিজের ভুলটা আমি বুঝতে পারলাম যখন আমাদের আলোচনাটা ঘুরে গেল 'সংগ্রাম'-সংক্রান্ত প্রশ্নের দিকে। তিনি বললেন, 'সত্যিকারের সংগ্রাম আদৌ শুরুই হয়নি। সংগ্রামের নামে যা সব ঘটছে তার সংগে কংগ্রেসের সম্পর্ক ততটাই যতটা থাকে একজন স্ত্রী আর তার দেওরের মধ্যে। জওহরলাল আর সুভাষবাবুর সম্পর্কটা কেমন সেকথা তো আপনাদের জানা-ই। চোখের পলক পড়তে না পড়তে যাদের আমরা দেশের শত্রু বলে মনে করি তারাই আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে কংগ্রেসের পতাকাটা। তার পরে কি-সমস্ত অবমাননাকর ঘটনা ঘটেছে তাও জানেন আপনারা। কংগ্রেসের নাম নিয়ে ওরা যথার্থ ও সৎ কংগ্রেসীদের ঠেলে দিয়েছে আত্মহননের পথে। আমিও ওদের ফাঁদে পড়েছিলাম। ···তো যাইহোক, এ-সব নিয়ে কথা বলে কোন লাভ নেই। আশার আর কোন জায়গাই নেই। ঘা সারাবার নামে পা-টাই যে কেটে বাদ দিয়েছি।

ভদ্রলোকের মুখমণ্ডলে তখনো ছড়িয়ে ছিল সেই উজ্জ্বল হাসির আলো কিন্তু তাতে তাঁর কণ্ঠস্বরের নৈরাশ্য আর ঢাকা পড়ছিল না।

"আপনি যাকে 'সংগ্রাম' বলে দেখতে চাইছেন সেটাই কি আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির একমাত্র পথ ?" শান্তভাবে জানতে চাইলাম।

'তা জেনে আপনার কাজ কী ?'—তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন হাসতে হাসতে।

কাজ আপনাকে জানাতে পারা যে আরো একটা পথ রয়েছে, যে পথে গোটা পৃথিবীকে আমরা পাশে পাব যে পথে কোন শত্রুই, যতো শক্তিশালীই হোক না সে আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।'

"…'পথ' ?? আবার ! ? ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন আরো আরো সব 'পথ' থেকে ! জানেন মশাই, 'পথ' আর 'ফাঁদ' আলাদা করার সমস্ত ক্ষমতাটাই ইদানিং আমি হারিয়ে ফেলেছি !" হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন তিনি। আরো বললেন, "ওই বৃদ্ধটি— ওই গান্ধীজী যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন আমার আর কোন 'পথ' নেই। উনিই আমার 'পথ'— আর কেউ না।"

আমি নিজের অজান্তেই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলাম। বললাম, 'মহাত্মাজীই আমার পথ' এই বলে চুপটি করে বসে থাকা, কংগ্রেসের পতাকা শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়েছে এই অজুহাতে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়া এই-ই কি আজকের একমাত্র পথ? এই-ই কি মহাত্মাজীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধার বাস্তব অভিব্যক্তির একমাত্র উপায় বলে মনে করেন? তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কারাবরণ করেছেন, যাতে জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবার জনগণের সেবায় লাগতে পারেন। আপনি কি মনে করেন যে আপনি তাঁর মুক্তির জন্য যথাসাধ্য করেছেন; অথবা, আমাদের দেশের বর্তমান সময় বা পরিস্থিতি কি আপনাকে রাজনীতি ত্যাগ করার অনুমতি দিচ্ছে?"

জয়ের পথে না রয় সংশয় !

এর পরে, আলোচনার শেষ অবধি ভদ্রলোককে আর তাঁর সেই স্বভাবগত হাল্কা মেজাজে দেখা গেল না। তাঁর গম্ভীর মুখ দেখে আর কোন সন্দেহই রইল না— আমার কথাগুলো তাঁকে ভাবিয়েছে। আমাদের বই ও কাগজপত্র থেকে প্রাসংগিক কিছু অংশ তুলে ধরলাম, তিনিও খুব মনোযোগ দিয়ে সেগুলো পড়লেন, এবং বেশ জোর গলায়, যাতে সকলেই শুনতে পায়। তাঁর ছোটভাই একবার আমাদের সংগে ঠাট্টা করতে শুরু করলেন আমাদের স্লোগান 'করেংগে ইয়ে জিতেংগে'-র বাঁকা মানে করে। যতীনবাবু তাঁকে থামিয়ে দিলেন, এবং বললেন— 'আজ আমাদের সংকল্প এটাই হওয়া উচিত। —আমাদের আজ অবশ্যই চলা উচিত এমনভাবে যাতে জয়ের পথে আর কোন সংশয় না দেখা দেয়।'

ফিরে আসার সময়ে ভাবছিলাম মেদিনীপুরের এক সত্যিকারের দেশপ্রেমিকের কথা, যতীনবাবুর মধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম। অদম্য শক্তি, অসীম ত্যাগ ও রাজনীতির জটিলতা থেকে ঠিক ও ভুলকে চিনে নেবার মতো ধৈর্যসম্পন্ন এক দেশসেবক। এই ধরনের দেশসেবকের কাছে অন্য সবকিছুর চাইতে বড়ো হল কাজ— জনগণের জন্য কাজ, তা সে যত কঠিন, যত বিপদসংকুলই হোক না কেন— কারণ জনস্বার্থে নিজের জীবন বিনাবাক্যে বিসর্জনে প্রস্তুত সে।…দুঃখের কথা হল এই অন্ধ দেশভক্তিই বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্রের সহজতম শিকার হয়ে ওঠে।

হাজতবাসের সময়ে যতীনবাবুর মাথার মধ্যে কেউ এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে কমিউনিস্টরা হল ব্রিটিশ সরকারের দালাল এবং ব্রিটিশ স্বার্থের মুখ চেয়েই তারা

জাপশক্তির ধ্বংস কামনা করে। দু-ঘণ্টা ধরে এ-ব্যাপারে তিনি মুখ বুজেছিলেন পাছে তাঁর এই সংশয়ে আমরা ক্ষুব্ধ হই। অবশেষে, নিজের সব সংশয়ের নিরসনের পর তিনি নিজেই কথাটা জানালেন। শেষকালে, আমাদের চলে আসার সময়ে, তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন লাহিড়ীবাবুর '৯-ই অগাস্টের এক বছর', বিভূতি গুহর 'পঞ্চমবাহিনী কাহারা' এবং যোশি-র 'দেশপ্রেমিকদের জাগাও' এসব বইগুলি— নিজে পড়ার জন্য, এবং তাঁর অনুগামী কিছু দেশপ্রেমিক যুবককে পড়ানোর জন্য।

ম্যালেরিয়া প্রসংগেও তাঁর সংগে কথা বলেছিলাম আমরা। বারবার উনি আমাদের বলছিলেন ম্যালেরিয়া নিয়ে কোন ভয়ডর তাঁর নেই। নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে অমন আস্থা খুবই আনন্দদায়ক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা আলোচনা শেষ হবার আগেই তিনিও আক্রান্ত হলেন জ্বরে। তৎসত্ত্বেও তিনি 'জনগণের সংগ্রাম' থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে যেতে লাগলেন এবং প্রবল উৎসাহে আলোচনা চালিয়ে গেলেন।

উপরের অনুচ্ছেদগুলি লেখার উদ্দেশ্য এ-কথা প্রমাণ করা নয় যে এই কংগ্রেসী নেতাটিকে আমি কমিউনিস্টে পরিণত করেছিলাম। মনে পড়ছে আমি নিজেই বলছিলাম ওঁকে 'একজন প্রকৃত কংগ্রেসী হওয়া যতটা কঠিন, আমার মনে হয় একজন প্রকৃত কমিউনিস্ট হওয়া তার চেয়ে কিছু কম কঠিন নয়।' না, কমিউনিস্ট হয়ে যাননি ভদ্রলোক। আমরা শুধু পেরেছিলাম তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে যেটুকু হতাশার প্রমাদ মিশে যাচ্ছিল তা থেকে মুক্ত হতে তাঁকে কিছুটা সাহায্য করতে। আমরা শুধু পেরেছিলাম একজন কংগ্রেসীকে আরো সচেতন করে তুলতে সমসাময়িক পরিস্থিতিতে কংগ্রেসীদের ক্ষমতা ও দায়িত্বের ব্যাপারে। দেশের সামনে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে সেই ভবিষ্যত সম্পর্কে তাঁকে সচেতন করতে। এর চেয়ে বেশি গৌরবের আজ আর আমার কীই-বা থাকতে পারে?

ভিড়ে ঠাসা অনাথ আশ্রম

অনাথ আশ্রমটা দেখতে গেলাম। একেবারে কাছেই— তিনদিকে ও পেছনে খাল দিয়ে ঘেরা একটা একতলা বাড়ি। সামনে একটা টিউবওয়েল— বহুদূর থেকে গ্রামবাসীরা সেখানে এসেছেন জল নিতে।

অনাথদের সংখ্যা প্রথম দিনে ছিল পাঁচ, দ্বিতীয় দিনে পঁচিশ এবং তৃতীয় দিনের প্রথম দু-ঘণ্টার মধ্যেই তিরিশ। প্রায় সকলেই এসেছিল কোন আমন্ত্রণ ছাড়াই। বয়স্ক চাষীরা আসছিলেন আগেভাগেই তাঁদের সন্তানদের ওখানে রেখে যেতে। তাঁদের একজন বললেন— 'নিজে জ্বরে ভুগছি। দু-পা হেঁটে খাবারটাও যোগাড় করতে পারি না। এর মা এই জ্বরেই মারা গেছে। মনে হয় আমারও সেই একই দশা হবে। ছেলেকে তাই আপনাদের কাছেই রেখে যাচ্ছি। দেখবেন, যেন না খেতে পেয়ে মারা না পড়ে বেচারা।'

আরেকজন— তাঁর মুখে রা-টি নেই। দুই ছেলে ও একটি মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। অনাথ আশ্রমের সামনে বাচ্চাদের দাঁড় করিয়ে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। একজন স্বেচ্ছাসেবক এসে ভেতরে নিয়ে গেল বাচ্চাদের। লোকটি কিন্তু একভাবেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন— ধুতির কানায় গা ঢেকে, আশ্রমটির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন তিনি। আমরা জানতেই পারিনি কখন!

দশজনেরও বেশি শিশুর বয়স ছিল তিন কি চার। প্রায় পনেরজনের বয়স ছয় কি সাত। আর বাকি সকলেরই বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে। বেশিরভাগই চাষীদের ছেলে। একজনের বাবার ছিল আশি বিঘে জমি— গেল বর্ষায় তিনি জ্বরে ভুগে মারা যান। আর তারপর ওদের জমিগুলোও অনাবাদীই পড়ে থাকে। মা কোন এক পরিবারে পরিচারিকার কাজ করছিলেন— আর ওই পরিবারটির দাক্ষিণ্যের ছেলেটি বেঁচে থাকতে পেরেছে এতদিন। ছেলেটা শেষকালে এক সপ্তাহ ধরে জ্বরে ভোগার পর এই অনাথ আশ্রমটির কথা জানতে পেরে তারাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে এখানে।

আরেকটি ছেলে। তার বাবা নুন তৈরি করে হাটে বেচতেন, দিন পাঁচেক আগে তিনি যথারীতি হাটে গিয়েছিলেন— কিন্তু আর ফেরেননি। ছেলেটাকে উপোস দিতে হচ্ছিল। অবশেষে সে নিজেই খুঁজতে খুঁজতে এখানে চলে এসেছে।

দুটি শিশু। ভাই আর বোন। মেয়েটার গায়ে একটা নোংরা কম্বল। রাতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটা কম্বলের একটা কানার জন্য মেয়েটার সঙ্গে নির্ঘাত লড়াই করে থাকবে; আর কম্বলের একটু ভাগও না পেয়ে মেয়েটার মুখে খিমচিও কেটেছে হয়ত। খিমচি কাটার দাগ এখনও লেগে আছে মেয়েটার মুখে।

বিছানা বলতে ছিল একজোড়া মাদুর। আর বেশিরভাগ বাচ্চাই ছিল পুরোপুরি ন্যাংটো— এই নভেম্বরে, চারদিকে বিষাক্ত মশার মধ্যে!

অনাথ আশ্রমটির খরচ চালাচ্ছিল গুজরাট সেবা সমিতি। কিন্তু জিনিসপত্রের জোগান ছিল খুবই কম। খুব অল্প পরিমাণ চাল আসছিল— আর তা-থেকেও আবার চুরি হচ্ছিল। এক স্বেচ্ছাসেবক আমাকে জানালেন যে একবার নাকি ছ-মণ চালের জায়গায় তাঁরা প্রায় বারো সের কম পেয়েছিলেন!

ত্রাণ নয় সকলের তরে

মেদিনীপুর শহরে সমস্ত পার্টি ও ত্রাণকর্মীরা বঙ্গীয় ত্রাণ সমিতির তলায় ঐক্যবদ্ধ হলেও নভেম্বরে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ যে সস্তা চাল (সাড়ে পাঁচ টাকা দরে) পাঠিয়েছিলেন তা পাঠানো হয়েছিল গিরিশ দাস নামে জনৈক মহাসভাপন্থী ব্যবসায়ীকে, এবং ত্রাণ সমিতিকে নয়। কাঁথিতে অবশ্য বঙ্গীয় ত্রাণ সমিতি শ্যামাপ্রসাদের কাছ থেকে সস্তা চাল ও অন্য কিছু সামগ্রী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। সমিতিটিতে মহাসভাপন্থীদের সংখ্যা ও প্রভাবের আধিক্যের জন্যই হয়তো তা সম্ভব হয়েছিল।

তমলুক সাব-ডিভিশনের ত্রাণ সমিতিটিও গড়া হয়েছিল সর্বদলীয় প্রতিনিধি নিয়ে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ এখানেও কোন সাহায্যই পাঠাননি; যতকিছু পাঠিয়েছিলেন সে সবই আর্য সমাজ আর মহেন্দ্র স্মারক সংঘের কাছে। প্রথমটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক গোষ্ঠী; কিন্তু দ্বিতীয়টির ওপর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণের কথা আর অপ্রকাশিত ছিল না।

ফেরার পথে আমরা পেলাম পায়রাছালি বলে একটা গ্রাম। গ্রামবাসীদের একজন বললেন এখানে নাকি পাঁচশো লোকের বাস ছিল; আরেকজন বললেন তিনশো। তর্কটা অবশ্য অবান্তর। কেননা বর্তমানে গ্রামটিতে ছিলেন মাত্র পঁচিশজন! বছরখানেক আগেও তাঁরা উৎসাহভরে ৯ অগাস্টের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন এবং সাহসের সঙ্গে মুখোমুখি হয়েছিলেন বেয়নেট ও মেশিনগানের। পরে, আমলাতন্ত্রকে শিক্ষা দেবার জন্য, নিজেদের সমস্ত খাদ্যসম্ভার তাঁরা সমর্পণ করেছিলেন মজুতদারদের হাতে। আর তার পরেই অনিবার্যভাবে শুরু হয়েছিল একমুঠো ভাতের জন্য শহরাভিমুখে পদযাত্রা, উপোসের ওপর এসেছিল ম্যালেরিয়া। আর এখন মাত্র পঁচিশ জন পড়ে আছেন!

ব্যক্তিটির নাম ক্ষেত্রমোহন নায়েক। অন্যান্যদের মতোই একজন কৃষক। অনাহার আর ম্যালেরিয়া শেষ করেছে তাঁর স্ত্রী ও শিশুকে। আর মৃতের সৎকার সারার আগেই তিনিও আক্রান্ত হয়েছেন ম্যালেরিয়ায়। আমরা যখন তাঁকে প্রথম দেখলাম, শকুন আর কুকুরেরা তখন তাঁর আত্মীয়ের মৃতদেহের বখরা নিয়ে ঝগড়া বাঁধিয়েছে। আগের রাতে শ্মশানঘাটে বয়ে নিয়ে আসা হয়েছে সেই মৃতদেহ। কিন্তু চিতা জ্বালার আগেই শবযাত্রী-দের প্রত্যেকেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। বাধ্য হয়েই তাঁরা তখন মৃতদেহ ফেলে রেখে নিজের-নিজের ঘরে ফিরে যান। ভাবছিলাম ওঁদের মৃতদেহগুলি অন্তত শ্মশানঘাট অবধি নিয়ে আসার মতো লোকও বেচারাদের কপালে জুটবে না!

ক্ষেত্রমোহনের মতো নিয়তি আজ আর বাংলার জেলাগুলিতে বিরল নয়। অথচ যারা ক্ষেত্রমোহনদের মুখের খাবার ছিনিয়ে নিয়ে মোটা মুনাফা কামাচ্ছে তাদের আমরা শুধু ক্ষমাই করি না— বরং উৎসাহ দিয়ে যেতে থাকি।

কিন্তু এই অবস্থা আর চলতে পারে না! এ-বছরের আমন ধান যদি মজুতদারদের থাবা থেকে বাঁচানো না হয় তাহলে সারা দেশজুড়ে জ্বলে উঠবে আগুন।

কাঁথি সাব-ডিভিশনের দক্ষিণাঞ্চলগুলি, যেখানে ধানের খেত 'যেন সোনার পরাত' সেসব জায়গার দশ শতাংশ জমিতেও চাষ হয়েছে কিনা সন্দেহ। জনৈক কৃষক আমাদের বলেছিলেন যে তাঁর পঁচাত্তর বিঘে জমির মধ্যে তিনি চাষ করেছিলেন মাত্র ন-বিঘেয়। বীজ, বলদ, সার, খাদ্য ও অর্থের চূড়ান্ত অভাবের ওপরে জুড়ে বসেছিল ম্যালেরিয়া। নেই খেতমজুর।

আর, এইসব লোকের জন্য সরকারি কোন সাহায্যই আসেনি, যেহেতু ধরেই নেওয়া হয়েছিল এরা 'সক্ষম'।

কে দেখাবে পথ ?

মেদিনীপুর থেকে কলকাতা ফেরার পথে মনে পড়ছিল মেদিনীপুরের রাস্তায় দেখা সেই চাষী বৌটির কথা— 'সত্যি বলতে কি বাবু, কী-টা আশা করে আমরা গ্রামে ফিরব ? গেলবার খারাপ ফলন হয়নি, তবু নিজেদের গ্রামেই কিছু খেতে পাইনি আমরা··· ।

এছাড়াও মনে পড়ছিল শীর্ণকায় ও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত দুটি কৃষক তরুণের কথা। তারা কাঁথির একটি শ্মশানঘাটের অনতিদূরে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ছোট্ট একটা চানাচুরের দোকান খুলে বসেছিল। বলল, 'কী বলব আপনাদের বাবু ? আপনারা পরিষ্কার জামা-কাপড় পরেন, ইংরেজি জানেন— আপনারা তো আমাদের নিয়ে ভাবেনই না। আমাদের দুঃখকষ্ট দেখে আপনারা হয় দূর থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আর তারপর সব ভুলে যান, আর নয়তো বাইরে দয়ার ভান করে ভেতরে ভেতরে আমাদের সব কিছু হাতিয়ে নেবার ফন্দি আঁটেন···হ্যাঁ, আমরা কৃষক সমিতির কথা শুনেছি···আমরা জানি যে, এককাট্টা না হলে আমাদের কোন উপায় নেই, কিন্তু কে দেখিয়ে দেবে কিভাবে সেটা হবে ? আপনারা তো কখনোই আমাদের কাছে আসেন না···নইলে আমরা কী টা না করতে পারি ? এই কিছুদিন আগেই আপনাদের ডাকে সাড়া দিয়ে মরতেও তৈরি ছিলাম আমরা। কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে আমরা তো ঠিকই করতে পারি না কীভাবে এগোব। আপনারা পথ না দেখালে আমরা তো কোনভাবেই এগোতে পারি না।'

ওদের পথ দেখাতে পারে এমন কেউ কি নেই ? □

অনুবাদ : সোমেশলাল মুখোপাধ্যায়

HUNGRY BENGAL

Chittaprosad
Contai

Bowbazar St. Calcutta

chittaprosad

Chittaprosad
5 Nov 43
Contai

Chittaprosad

chittaprosad
7 Nov 43 MIDNAPUR

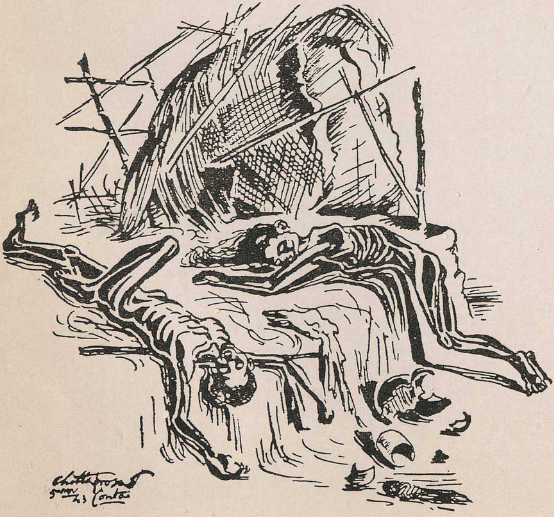
Chittaprosad
Contai

chittaprosad
Contai

Chittaprosad

"জাতির মৃত্যুকে রুখিবার জন্য আরও অগ্রসর হও,"

মেদিনীপুর মৃত্যুকে রুখিবে।

দেশপ্রেমিক জন-সাধারণের নিকট আবেদন।

আজ সারা মেদিনীপুরে অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য। একদিকে হাজার হাজার রক্ত হীন কঙ্কাল সার মৃতপ্রায় নরনারী শিশু মৃত্যুর হাতে অপেক্ষা করছে পথে, ঘাটে, রোদে, বৃষ্টিতে ঘুরে। প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যু এসে তাদের বীভৎস মূর্ত্তি দিয়ে দিচ্ছে। পথে, ড্রেনেই মরছে। পচেছেও সমস্ত শহর মল দুর্গন্ধে ভরে উঠছে। কলেরা রাক্ষসী সেই পথে নিয়ে আসছে ব্যাপক ধ্বংস। নীচ থেকে উপর পর্য্যন্ত আজিত নরক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এদিকে বাজার থেকে চাউল উধাও হয়ে লুকিয়েছে অতরাজ গুদাম ঘরে। সরকার সন্ত্রাসের আইন কংলো—তার সুযোগে দেশকে বাঁচাতে দিবেনা লোভী মহাজনের দল। তারা চায় জনসাধারণের রক্ত দিয়ে টাকা বানাতে।

আর একদিকে দীর্ঘ এক বৎসরের পর মেদিনীপুরের আত্মা আজ জেগে উঠেছে, মেদিনীপুরের গৌরব ময় দেশপ্রেম আজ এমন ভাবে জেগে উঠেছে, যা দুমাস আগে কল্পনা করা যেতনা।

কংগ্রেস সেবী, কমিউনিষ্ট, হিন্দুমহাসভা মুস্লিমলীগ, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ধনী, দরিদ্র সবার কাছ থেকে একটী দৃঢ় সঙ্কল্প জেগে উঠেছে। আমলাতন্ত্রের অপদার্থতায়, মুনাফাখোরীর লোভের কবলে আমার দেশ, আমার ভাই-বোনকে, আমার কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তকে, আমার স্কুল-কলেজ-ছাত্রকে আমি ধ্বংস হতে দেব না।

মেদিনীপুর শহরের পুরাতন জেলখানায়, [illegible] তলায়, কোতয়ালী বাজারে, মীরবাজারে, [illegible] বাজারে, বড়বাজারে, বল্লভপুরে সিভিকগার্ড, মনিমালা প্রভৃতি অন্নসত্রগুলি এই বলিষ্ঠ দেশপ্রেমের সাড়া। আজ শহরে যে কোনও পাড়ায়, এমনকি যে কোন মেসে, বাড়ীতে, দোকানে যে কোনও ভাবে এই কাজ চলছে। এই কাজে যে কোনও পাড়ায় নারী ও শিশুদের উদ্যোগ আজ প্রশংসার বস্তু। (এ, আর, পি, কে অগ্রসর হতে হবে)

জেলার বিভিন্ন অঞ্চল ও আজ পিছিয়ে নেই। তমলুক, খড়্গপুর, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল প্রত্যেক এলাকার স্বদেশ প্রেমিকগণ আজ আর হতাশয় বসে নেই। উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসছে দেশকে বাঁচাতে। সব জায়গায় মিলিত সাহায্য শক্তি গড়ে উঠছে।

মেদিনীপুর টাউন কমিটির ইস্তেহার

"জাতির মৃত্যুকে রুখিবার জন্য আরও অগ্রসর হও"
মেদিনীপুর মৃত্যুকে রুখিবে।
দেশপ্রেমিক জন-সাধারণের নিকট আবেদন।

আজ সারা মেদিনীপুরে অভূত-পূর্ব্ব দৃশ্য। একদিকে হাজার হাজার রক্তহীন কঙ্কালসার নগ্নপ্রায় নরনারী শিশু মৃত্যুর দ্বারে অপেক্ষা করছে পথে, ঘাটে, রোদে, বৃষ্টিতে ঘুরে। প্রতিদিন তিল তিল মৃত্যু এসে তাদের বীভৎস মুক্তি দিয়ে দিচ্ছে। পথে, ড্রেনেই মরছে। পচছে ও সমস্ত সহর মল দুর্গন্ধে ভরে উঠছে। কলেরা রাক্ষসী সেই পথে নিয়ে আসছে ব্যাপক ধ্বংস। নীচ থেকে উপর পর্যন্ত জাতির নরক যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। এদিকে বাজার থেকে চাউল উধাউ হয়ে লুকিয়েছে অন্ধকার গুদাম ঘরে। সরকার সস্তাদরের আইন করলে— তার সুযোগে দেশকে বাঁচতে দিবে না লোভী মহাজনের দল। তারা চায় জনসাধারণের রক্ত দিয়ে টাকা বানাতে।

আর একদিকে দীর্ঘ এক বৎসরের পর মেদিনীপুরের আত্মা আজ জেগে উঠেছে, মেদিনীপুরের গৌরবময় দেশপ্রেম আজ এমনভাবে জেগে উঠেছে যা দু মাস আগে কল্পনা করা যেত না।

কংগ্রেসসেবী, কমিউনিষ্ট, হিন্দু মহাসভা, মুশ্লিম লীগ, মহাজন, ব্যবসায়ী, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ধনী, দরিদ্র সবার কাছ থেকে একটী দৃঢ় সংকল্প- জেগে উঠেছে। আমলাতন্ত্রের অপদার্থতায়, মুনাফাকারীর লোভের কবলে আমার দেশ, আমার ভাইবোনকে, আমার কৃষক-মজুর-মধ্যবিত্তকে, আমার স্কুল-কলেজ-ছাত্রকে আমি ধ্বংস হতে দেব না।

মেদিনীপুর সহরে পুরাতন জেলখানায়, বাসন্তীতলায়, কোতালী বাজারে, মীর-বাজারে, সঙ্গতবাজারে, বড়বাজারে বল্লভপুরে সিভিক্ গার্ড, মণিমালা প্রভৃতি অন্ন-সত্রগুলি এই বলিষ্ঠ দেশ-প্রেমের সাড়া। আজ সহরে যে কোনও পাড়ায়, এমনকি যে কোন মেসে, বাড়ীতে, দোকানে যে কোনও ভাবে এই কাজ চলছে। এই কাজে যে কোনও পাড়ায় নারী ও শিশুদের উদ্যোগ আজ প্রশংসার বস্তু। (এ, আর, পি, কে অগ্রসর হতে হবে)

জেলার বিভিন্ন অঞ্চলও আজ পিছিয়ে নেই। তমলুক, খড়্গপুর, কাঁথি, ঝাড়গ্রাম, ঘাটাল প্রত্যেক এলাকার স্বদেশ প্রেমিকগণ আজ আর হতাশায় বসে নেই। উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসছে দেশকে বাঁচাতে। সব জায়গায় মিলিত সাহায্য শক্তি গড়ে উঠছে।

[২]

জাতীয় আন্দোলনে মেদিনীপুর চিরদিন পুরোভাগে ছিল—আজও সেই স্থান চ্যুত হবে না।

এই আন্দোলন এখনও একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করে হচ্ছে না বলে এতখানি চেষ্টায় যে ফল হতে পারতো, মেদিনীপুরের চেহারা আজ বদলিয়ে দেওয়া যেত তা এখনও সম্ভব হচ্ছে না অথচ বিপদ এত বেশী যে মিলিত উদ্যোগে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা ছাড়া জয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প। তাই আমরা নিম্নলিখিত কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

১। মেদিনীপুর সহরে সমস্ত অন্নসত্র ও সাহায্য দান ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনবার জন্য একটি মিলিত সক্রিয় কমিটি গঠন।

২। সমস্ত পাড়ায় ১টি করে পাড়া কমিটি গঠন।

৩। একই সময় সর্ব্বত্র খাবার দেবার ব্যবস্থা করে যথোপযুক্ত খাবার দেওয়া ও পরিবেশন ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। ভাল ভলাণ্টিয়ার ব্যবস্থা করা।

৪। খাওয়াবার সময় সর্ব্বপ্রকার রূঢ় ব্যবস্থা বর্জ্জন।

৫। অধিক সংখ্যক শিশু রক্ষার জন্য দুধ বার্লির পরিকল্পনার ব্যবস্থা এবং তার জন্য গোরক্ষার ব্যবস্থা চাই। এজন্য প্রত্যেক পাড়ায় মহিলাদের বিশেষ করে অগ্রসর হতে হবে। মেয়েরা আজ কাপড়ের অভাবে বন্য পশুতে পরিণত হতে চলেছে। তাদের জন্য অবিলম্বে কাপড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে মেয়েদের এ দায়িত্ব নিতেই হবে।

৬। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অন্নসত্র করে সহরের সকলের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে মিলিত করে সেগুলি চালানো।

৭। ৩০০০/৪০০০ নরনারীর আশ্রয়যোগ্য স্থান বিশেষ করে প্রধান প্রধান অন্নসত্র-গুলির কাছে। য্যাতে করে আশ্রয়হীনগণ রাতে থাকতে পারে। দিনে রোদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এবং ঐখানে কুটির শিল্প প্রবর্ত্তন করে তাদের আত্মনির্ভর করে তোলা।

৮। আশ্রয়হীন দলের মলমূত্র ত্যাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা করা সহরের বাহিরে।

৯। প্রত্যেক পাড়ার জন্য পাড়া কমিটি ১টি মেথর রাখবে প্রতিদিন রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার জন্য। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ব্লিচিং পাউডার (অভাবে চুন ও গোবর) ব্যবস্থা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে নতুবা অচিরেই তাদের ছেলেপিলে ঘর বাড়ী বিপন্ন হবে। পাড়া কমিটি প্রতিদিন পাড়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবলম্বিত ব্যবস্থা গুলির তত্ত্বাবধান করিবে।

১০। অসুস্থদের জন্য হাসপাতালে ডাক্তারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সহর রিলিফ কমিটি এই ব্যবস্থা করিবেন। ডাক্তারগণের জন্য ভলাণ্টিয়ার সার্ভিস চাই।

১১। শিশুদের ও প্রসূতির জন্য অবিলম্বে আশ্রয় স্থান চাই।

১২। পথের মৃতদেহগুলি অবিলম্বে সৎকার করিবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা।

[৩]

১৩। সহরের 'সস্তা দোকান'গুলি সম্পর্কে নানা অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সেখানে অবিলম্বে স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করা।

১৪। সহরে চাউল উধাও হয়ে প্রচণ্ড বিপদ এনেছে। প্রতি পাড়াকমিটি ও ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর কাজ হবে গোপন চাউলের আড়ৎ খুঁজে বার করা ও নিয়ন্ত্রিত দরে তাহা বিক্রয়ে বাধ্য করা।

১৫। বরাদ্দ প্রথায় সমস্ত জনসাধারণের খাদ্য সরবরাহের জন্য আন্দোলনের সৃষ্টি করতে হবে। একমাত্র এই প্রথা দ্বারা মজুতকারীদের সায়েস্তা করা যায় ও চাউলের মূল্যকে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়।

১৬। সহরে কলেরা দেখা দিচ্ছে সুতরাং ব্যাপকভাবে কলেরা ইন্‌জেকশানের ব্যবস্থা করতে হবে ঘরে ঘরে বিশেষ করে আশ্রয়হীন নরনারীর।

১৭। এই সমস্ত কাজ সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ভলাণ্টিয়ার ব্যবস্থা চাই প্রতি বাড়ী থেকে অন্তত একজন ভলাণ্টিয়ার হওয়া চাই। ইহাই সাফল্যের গোড়ার কথা। আমরা কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় কাজের তালিকা দিলাম। জনসাধারণের উদ্যোগে ও প্রয়োজনে এইগুলি অনায়াসেই সম্ভব।

আমরা যে কাজ আরম্ভ করেছি তাহার পূর্ণ সাফল্য হবে উপরের কাজগুলি সুষ্ঠভাবে পালন করতে পারলে।

আজ জাতীয় কংগ্রেসের নেত্রী সরোজিনী নাইডু আমাদের, আহ্বান দিয়েছেন। বাংলার কংগ্রেস সভানেত্রী লাবণ্যপ্রভা দত্ত (ভূতপূর্ব) ডাক দিয়েছেন। হিন্দু মহাসভা লীগ ব্যবসায়ী সমিতি মহিলা সমিতি ছাত্র ফেডারেশন এমনকি কিশোর বাহিনী পর্য্যন্ত এই জাতীয় প্রচেষ্টায় হতাশা দূরে করে ফেলে এগিয়ে এসেছে।

আমলাতান্ত্রিক বাধা সত্ত্বেও আমরা মেদিনীপুরকে বাঁচাইব, জাতির উৎপাদনের মেরুদণ্ড কৃষক, মজুর জনসাধারণকে বাঁচিয়ে দেশ রক্ষার ব্যবস্থাকে দৃঢ় করবো। জাতীয় মনবল সুদৃঢ় করবো। এর মধ্য দিয়ে যে সক্রিয় একতা গড়ে উঠবে, তার বিপুল শক্তির জোরেই জাতীয় নেতাদের মুক্ত করে আনবে। এই শক্তির জোরেই আমরা কিছু কংগ্রেস নেতাদের আমাদের সাথে পাচ্ছি। জাতীয় গভর্ণমেন্টের দাবী আদায় হবে।

বর্ষা শেষে জাপানের বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে
হত্যাস্রোত বহানোর স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে।

দলাদলি নয়—হতাশ নয়—মিউনিসিপ্যালিটি
বা মন্ত্রিত্বের ঝগড়া নয়।
জাতীকে বাঁচাবার পবিত্র দায়িত্ব।
প্রত্যেক নরনারী, ছাত্রছাত্রী, কংগ্রেস লীগের
মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হও।

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি
মেদিনীপুর টাউন কমিটি।

সরস্বতী প্রেস, মেদিনীপুর।

□

সেনা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ : জনৈক গ্রামবাসীর বিবরণ

১৩৪৯ সালের ভাদ্র মাস (ইং ১৯৪২ সালের আগস্ট মাস)। তখন আমার বয়স প্রায় সাড়ে এগারো বছর। দেশে তখন ইংরেজ শাসন, দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ চলছে। গ্রামের লোক পুলিশ দেখলেই ভয়ে লুকতো। পুলিশের মাথার পাগাড়ি ছিল লাল। গ্রামের লোক পুলিশ না বলে বলত লাল পাগাড়ি।

কাঁথি থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে মহিষাগোঠ নামক জায়গায় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা পুলিশের গাড়ি ঘিরে মারার চেষ্টা করেছিল। গ্রামে গ্রামে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে কোন জায়গায় কিছু ঘটলেই শাঁখ বাজাতে হবে। এক জনের বাড়িতে শাঁখ বাজলেই পর পর সমস্ত বাড়িতে শাঁখ বাজবে, এবং যেখান থেকে শাঁখের শব্দ প্রথম এসেছে সেই দিকে সমস্ত যুবকেরা লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ছুটে যেত। মহিষাগোঠে মারপিটের দিনও অনেকেই ছুটে গেছিল। তার মধ্যে আমাদের এক আত্মীয় সর্বেশ্বর প্রামানিক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন সরকার থেকে টাকা পেতেন।

তার পর থেকেই দেশবাসীর উপর পুলিশের অত্যাচার বাড়তে লাগল। আশ্বিন মাসের দিকে কিছু লালমুখো সৈন্য এসে পিছাবনীতে তাঁবু ফেলে থাকল। পিছাবনী খালে তখন পুল হয়নি। কাঠের তৈয়ারি চাপ দিয়ে মানুষ এবং গাড়ি পারাপার করত। সৈন্যরা তাঁবু ফেলে ছিল পিছাবনী খালের উত্তর দিকে। তারা প্রতিদিন সকালে গ্রামের দিকে যেত। এক একদিন এক এক গ্রামের দিকে। যে দিন যে গ্রামে যেত সেদিন সে গ্রামের যতগুলি সম্ভব বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিত। সেখানে যদি কোন যুবক উপস্থিত থাকত

তবে তাকে প্রচণ্ড প্রহার করত। সেই জন্য গ্রামে দিনের বেলায় সাধারণত কোন পুরুষ উপস্থিত থাকত না। সৈন্যরা দিনের বেলাতেই আসত, সন্ধের আগে চলে যেত। আমাদের বাড়ি পিছাবনী খালের দক্ষিণ দিকে। আর চাপ পার করত যে মাঝি তাকে বলা ছিল যখন সৈন্যদের এদিকে পার করবে তখন চাপের যে চেন সেটা খুব জোরে আছাড় দিবে। চাপকে ডাঙার সঙ্গে আটকানোর জন্য খুব মোটা লোহার চেন দুদিকে দেওয়া থাকত। তখন আশ্বিন মাস, সমস্ত মাঠ জলে ভর্তি সেই জন্য ওই চেনের আওয়াজ আড়াই মাইল তিন মাইল পর্যন্ত শুনা যেত। সেই আওয়াজ শুনলেই সমস্ত লোক সমুদ্রের ধারে যে 'সি ডাইক' বাঁধ আছে সেইদিকে পালিয়ে যেত। বাড়ির মেয়েরা জঙ্গলে বা ধান খেতের দিকে চলে যেত। যেখানে মাঠে খুব বড় ধানগাছ সেই মাঠে বেঞ্চ অথবা চৌকি ফেলে তার উপর বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র ধান ও চালের বস্তা রেখে আসা হত। সমস্ত বাসন পুকুরের জলে ডুবিয়ে রাখা হয়েছিল। মেয়েদের সমস্ত গয়নাপত্র পোঁটলা করে সঙ্গে সঙ্গে রাখা হত। আমাদের কিছু চাল মাটির জালাতে করে মাটির মধ্যে পুঁতে রাখা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির পাশাপাশি যে সমস্ত অবস্থাপন্ন লোকের পাকা বাড়ি তারা ঘরের ভিতরে সমস্ত জিনিসপত্র রেখে, ঘরের সমস্ত দরজা জানালা ইট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে আমাদের পাড়া পর্যন্ত সৈন্য আসার আগেই দুর্গাপুজো এসে গেল।

দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন রাত্রি থেকে ঝড় এবং বৃষ্টি আরম্ভ হল। সপ্তমীর দিন সকালে প্রচণ্ড ঘূর্ণি ঝড় এবং বৃষ্টি, প্রায় সমস্ত বড় বড় গাছ ভেঙে বা উপড়ে গেল, অনেকের ঘর-বাড়ি পড়ে গেল, প্রায় লোকেরই মাটির দেওয়ালের ঘর। আমাদের গোয়াল ঘরের দেওয়াল যখন পড়ে গেল সেই মাটিতে বসে যাওয়া চালার উপর আমরা থাকলাম। আমাদের গোয়াল আসল ঘরের সঙ্গে প্রায় লাগানো ছিল।

মনে হয় তখন সকাল সাতটা হবে। হঠাৎ ঝড় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল যেন রোদ উঠবে। তখন অনেকেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। আমার এক দাদাও ঘর থেকে বেরিয়ে কাকাদের বাড়িতে গেল। কাকাকে নিয়ে মাছ ধরতে যাবে। এই বৃষ্টির সময় সমুদ্রের ধারে ভাল মাছ পড়ে। এই অবস্থা দশ মিনিটের বেশি ছিল না। হঠাৎ বাবা বাইরে থেকে এসে বললেন সর্বনাশ হয়েছে 'নোনা বন্যা' আসছে, তাড়াতাড়ি সকলে খড়ের চালার উপর উঠে যাও। এরই মধ্যে আবার প্রচুর বৃষ্টি এবং ঝড় আরম্ভ হয়েছে। বাবার এই কথা শুনে দাদারা এবং বাবা মেয়েদের এবং বাচ্চাদের খড়ের চালার উপর তুলতে লাগলেন, তুলতে তুলতে সেই উঁচু জায়গাতেও প্রায় ছয় ফুট জল হয়ে গেছে। তখন দেখা যাচ্ছে পূর্ব দিক থেকে প্রায় দশ হাত উঁচু হয়ে পাহাড়ের মতো জল ছুটে আসছে। পরে দেখা গেছে, জলের উচ্চতা প্রায় দশ হাত হয়েছিল। গাছের গায়ে খড় এবং ময়লা লেগে অনেকদিন সে দাগ ছিল। আমাদের সকলকে খড়ের চালার উপর তোলা হল কিন্তু আমার এক বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে পাওয়া গেল না। আমাদের পরিবারের প্রায় ১৮ জন একসঙ্গে ছিলাম। পরের দিন আমার সেই ঠাকুরমার মৃতদেহ একটি কাঁটা ঝোপের

সঙ্গে আটকে থাকতে দেখা গেল। তারপর তাঁকে মাটি খুঁড়ে পুঁতে ফেলা হল। কারণ চারিদিকে জল, পোড়ানর মতো কোন জায়গা ছিল না। আমরা সকলে খড়ের চালার উপর বসলাম। সকলে এক কাপড়ে ছিলাম। এত জোর হাওয়া ও বৃষ্টি যে কাপড়ের একটা খুঁট দিয়ে চালার খড় ফাঁক করে ভিতরের বাঁশের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রাখলাম। তখন আমরা ছোট ধুতি পরতাম। আর পিঠের উপর এমন বৃষ্টি হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন সূঁচ ফুটে যাচ্ছে। পরে পিঠের এক পস্থ চামড়া উঠে গেছিল। আমাদের বাড়িটা এমন জায়গায় তার চার পাশ ফাঁকা, জলের স্রোত পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে। আমাদের চালার দুই পাশ দিয়ে, কত গরু, মানুষ, বাক্স, সিন্দুক, দুর্গা প্রতিমা ভেসে যাচ্ছে। কত যে জিনিসপত্র ভেসে যাচ্ছে তার কোন ঠিক নাই। আমরা যে চালার উপর বসে ছিলাম সেখানে দেখা গেল বিষধর সাপও শুয়ে আছে। আমার এক দিদি আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁর ছেলে হয়েছিল সবে মাত্র ১০ দিন আগে। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টির মধ্যে সেই চালার উপর তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে শরীর কেমন শক্ত হয়ে গেছিল, দিদি তখন দাদাকে বলল 'দাদা আমার ছেলে আর নেই'। দাদা বললেন, 'তাহলে ঐ বানের জলে ভাসিয়ে দে', কিন্তু মায়ের প্রাণ, দিদি না ফেলে আঁকড়ে ধরে থাকল। বর্তমানে সে ছেলে বড় হয়ে তার আবার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এইভাবে সকাল সাতটা থেকে সারাদিন এবং সারা রাত্রি অতিবাহিত হল। আমরা সেই ভোরবেলা একটু মুড়ি খেয়েছিলাম, মায়েদের কিছু খাওয়া হয়নি। প্রায় ভোর রাত্রের দিকে ঝড় বৃষ্টি বন্ধ হল। মাটির দেওয়াল যখন পড়ে গেল তখন খড়ের চালা জলের উপর ভেসে থাকল। চারিদিকে গাছপালা পড়ে থাকার জন্য বাহিরের দিকে যেতে পারেনি। আমার যে দাদা, কাকার বাড়ির দিকে গেছিলেন, তিনি কোন দিকে যেতে না পেরে মাঝ রাস্তায় একটা গাছে উঠে সারাদিন রাত্রি সেখানেই কাটিয়েছেন, আমরা সমস্ত দিন রাত্রি অভুক্ত অবস্থায় সেই খড়ের চালার উপর বসেছিলাম। পরদিন সকালে বেশ ভাল রোদ উঠল, দিন রাত্রি ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে অনেকেরই অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ছিল। কড়া রোদ পেয়ে সকলেরই শরীর একটু চাঙ্গা হল। দেখা গেল সমুদ্রের জল যে পরিমাণ উঁচু হয়ে এসেছিল, ভাঁটার সময় অনেকটা কমেছে। তবে রাস্তা ঘাট মাঠ পুকুর সমস্ত এক হয়ে আছে। যেখানে ঘর ছিল দেওয়াল পড়ে মাটি কিছু উঁচু হয়েছে এবং তার উপর চালা বসে গেছে সেইটুকু দেখা যাচ্ছে। সমস্যা হল সকলেই এক বস্ত্রে এবং সেটি ভিজা, একদিক পরে এক দিক শুকনো করা হল। কারও বা গায়েই শুকালো।

তারপর সমস্যা পানীয় জল এবং খাবারের। কোথাও কিছুই নাই। বাবা দাদারা সকলে বাস্তুর চারদিক ঘুরে দেখছেন কী করা যায়। তখন সকলের মনে একটাই চিন্তা আমরা আর বাঁচব না। তারপর ওঁরা ঘুরে কিছু নারিকেল যোগাড় করে আনলেন। সেই নারিকেলের জল এবং নারিকেল খেয়ে কোন রকমে ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটান হল। গাছ এবং ঘরের চালা পড়ে যাওয়ার জন্য তার মধ্যে কিছু নারিকেল আটকে ছিল।

ঘর পোড়ার ভয়ে আমাদের যে চাল মাটির জালায় করে পুঁতে রাখা হয়েছিল সেইটা কোন জায়গায় আছে খোঁজার চেষ্টা হল। বাঁশের গজাল তৈরি করে নরম মাটিতে পুঁতে পুঁতে সেটার সন্ধান পাওয়া গেল। কিন্তু ভিজে চাল কী করে খাওয়া হবে, আগুনের কোন সন্ধান নাই। বেশ কিছু দূরে একজনের পাকাবাড়ি ছিল। তার বাড়িতে আগুন ছিল, তারা তাদের ছাদের উপর শুকনো খড় দিয়ে আগুন জ্বালাতে সেই ধোঁয়া দেখে আমার এক দাদা একখানা বাঁশ নিয়ে সাঁতার কেটে ঐ বাড়িতে গিয়ে খড়ের তৈরি 'বেনিয়া' মাথায় বেঁধে আগুন নিয়ে এলেন। ('বেনিয়া' খড়ের তৈরি আগুন রাখার একটা জিনিস)। তারপর খড়ের চালা সরিয়ে ঝোঁপের পাশে খুঁজে একটা ভাঙা হাঁড়ি ও কলসি পাওয়া গেল। খড় জ্বালিয়ে সেই ভাঙা হাঁড়িতে চাল ভাজা হল এবং সেই খাওয়া হল। মাঠ-পুকুরের সমস্ত জল নোনা। প্রায় দেড় দু মাইল দূরে একটা টিউবওয়েল ছিল। দাদা বাঁশের লাঠি নিয়ে কলসি জলে ভাসিয়ে জল নিয়ে এলেন। নারিকেলের মালা দিয়ে আমরা জল খেলাম। সেই সময় আমাদের বড় পুকুরের উল্টোদিকে যে বাঁশঝাড় ছিল, সেইখান থেকে কে যেন বাবা বাবা বলে ডাকছে। সেখানে যেতে হলে কিছুটা জলে সাঁতার কেটে যেতে হয়, দাদা সেখানে গিয়ে দেখেন বাঁশগাছের উপরে একটি ৬/৭ বছরের মেয়ে উলঙ্গ অবস্থায়। তার কাছ থেকে জানা গেল, বাবার সঙ্গে একই খড়ের গাদায় আমাদের পাশের গ্রাম থেকে ভাসতে ভাসতে আসছিল। হঠাৎ খড়ের গাদা ভেঙে গিয়ে দুজনে দুদিকে চলে গেল। ওর বাবা কিছুদূর গিয়ে একটা বটগাছে লেগেছিল। পরে এসে তার মেয়েকে নিয়ে গেছিল। তার সংসারে আর কেহ বেঁচে ছিল না। কিছু কিছু পরিবার ছিল যাদের বংশে কেহ বেঁচে ছিল না। সেই ভেঙে যাওয়া চালা ঘর খুলে সেই বাঁশ খড় দিয়ে কোন রকম কুঁড়ে ঘর তৈরি করে তাতেই থাকার ব্যবস্থা হল, খড়ের চালা ভাঙতে গিয়ে তার ভিতর থেকে একটা বস্তায় কাপড় চোপড় পাওয়া গেল। ঘর পোড়ার ভয়ে কাপড়ের বস্তা দিনের বেলায় বাহিরে রাখা হত, রাত্রে ঘরে রাখা হত।

সপ্তমীর ঝড়ে সমুদ্রের জল যে বেড়েছিল সেই জলের ধাক্কায় সমুদ্রের পাশে যে ৩০ ফুট উঁচু বাঁধ আছে সেটা এক জায়গায় খুব বড় রকমের ভেঙে গেছিল। আরও কিছু কিছু জায়গায় অল্প অল্প ভেঙে ছিল, কোথাও সেই বাঁধের উপর দিয়েও জল এসেছিল। সেই বাঁধের বাহিরে 'বেঙ্গল সল্ট ফ্যাক্টরী' নামে লবণ তৈরির একটি কারখানা ছিল। তাদের সেখানে দোতলা পাকা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িতে যে সমস্ত লোক ছিল তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এমন কি সেখানে যে পাকাবাড়ি ছিল তারও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। সেই বাড়ির একখানা ইট পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সেখানে খালের মধ্যে ৯০০ মণ কয়লা বোঝাই একটা বোট ছিল। জলের তোড়ে সে বোটকে বাঁধের উপর দিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়েছিল। সেটা ধান খেতের ভিতর দিয়ে দুই আড়াই মাইল দূরে একটি বটগাছে আটকে গেছিল। এই ঝড়ের ফলে আমাদের সে অঞ্চলে গাছপালা প্রায়

ছিল না বললেই চলে। এক জায়গা থেকে তাকালে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যেত।

এদিকে ধীরে ধীরে জল কমতে লাগল, গোরু, মানুষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি যত মরে পড়েছিল সমস্ত পচে দুর্গন্ধ হতে লাগল। জল অনেকটা কমার পর পুলিশ এসে গ্রামের লোকজনকে ধরে কিছু কিছু গণকবর দিয়েছিল। তারপরেও গ্রামের মধ্যে অনেক রাস্তায় মানুষ গোরু বাছুরের মৃতদেহ পড়ে ছিল। রাস্তা দিয়ে যাওয়া কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সেগুলি ফুলে এমন চেহারা হয়েছে দেখলে ভয় লাগে। সেই পচা দুর্গন্ধ তার উপর আবার খাওয়ার কষ্টতে অনেকেরই অসুখ হতে লাগল। এমন ভাবে কলেরা এবং ম্যালেরিয়া হল যে বহু মানুষ মারা গেল, তখন চিকিৎসার এমন সুযোগ ছিল না, আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় চার মাইল দূরে একটি ছোট সরকারি হাসপাতাল ছিল, সেখান থেকে ঔষধ আনতে হত।

জল কমার পরে কিছু কিছু সেবা প্রতিষ্ঠান সাহায্য দিতে আরম্ভ করেছিল। দিলে কী হবে বন্টন ব্যবস্থায় অনেক গোলমাল ছিল। আমাদের গ্রামের এবং পাশাপাশি অঞ্চলের অনেকের সুন্দরবনে এবং উড়িষ্যায় কিছু কিছু জমি ছিল। তাদের অনেকেই যে যেদিকে পারল চলে গেল। আমাদের অনেক জ্ঞাতিই এখনও সুন্দরবনে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছেন। সেই সময় বহুলোক দোরে দোরে ভাতের ফ্যান ভিক্ষা করত। অনেক মা নিজের বাচ্চা ছেলেমেয়ের হাতের খাবার ছিনিয়ে খেয়ে ফেলত। এইভাবে অনেকে রাস্তার পাশে বসে ধুঁকতে ধুঁকতে মরে পড়ে থাকত।

বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান যে রিলিফ দিত তার মধ্যে চাল প্রায়ই পাওয়া যেত না। গম, ময়দা, ভুট্টা, জোয়ার এবং বজরা এই সমস্ত পাওয়া যেত। বজরা এক প্রকার ঘাসের বীজের মতো। এই সমস্ত খেয়ে প্রত্যেকেরই পেটের অসুখ হত। মানুষের চেহারা যাহা হয়েছিল বলে বোঝান যাবে না। পেট বড় হয়ে হাত পা সরু হয়ে বীভৎস চেহারা হয়েছিল। প্রায় প্রত্যেকের পেটে প্লীহা বেড়েছিল। আমাদের থানার মধ্যে এক জায়গায় রিলিফ দেওয়া হত। সকালে ভোরে উঠে রিলিফ আনতে যেতাম রিলিফ নিয়ে বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে যেত। আমাদের বাড়ি থেকে রিলিফ কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে আসতে হত। গ্রামের মধ্যে খুব কম লোকই ছিল, অনেকেই গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন জায়গায় কোথাও দূরে কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে চলে গেছিল। বহুদিন পর্যন্ত অনেক পরিবারের বাস্তুতে কোন লোক ছিল না। যারা যখন কিছু চাল যোগাড় করত ভাত রান্না করে তাতে জল ঢেলে সেই জলভাত খেত। কারণ একজনের ভাত জলঢালা ভাত করলে দুজনের পেট ভরে যেত। প্রায় বাড়িতে দিনে একবেলার বেশি খাওয়া জুটতো না। অনেকে শুধু শাকপাতা সিদ্ধ করে খেয়ে দিন কাটাত। তখনকার সেই কুঁড়েঘরে দরজা একটু আলগা থাকলে জল জল দেওয়া ভাতের হাঁড়ি চুরি হয়ে যেত। রাস্তা দিয়ে কোন খাবার জিনিস হাতে করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর ছিল। কোন কোন সময় কেড়েও নিত। শাকপাতা ছিল প্রধান

খাদ্য, সমুদ্রের পাশে নোনা জলে একপ্রকার ঘাসের মতো হয় মুখে দিলে নোনতা লাগে, তাকে সিদ্ধ করে জল ফেলে দিলে নোনা ভাব কমে যায়, অনেকেই সেই সমস্ত খেয়ে বেঁচে থাকত। সজিনা ডাঁটার যে সমস্ত গাছ ভেঙে গেছিল, ভাঙা অংশ থেকে ডাল গজিয়ে সে বছর প্রচুর পাতা হয়েছিল। সেই পাতা ছিল খুব উপাদেয় খাদ্য। সে বছর যে কোন জায়গায় একটা কুমড়ার বীজ পড়লেই সেখানে গাছ হয়ে প্রচুর কুমড়া হয়েছিল। এক একটা ১০/১২ সের ওজনের। এই সমস্ত খেয়েই বেশিরভাগ লোকের দিন কেটেছে।

সমুদ্রের জলের সঙ্গে বালি এসে মাঠ ভর্তি হয়ে গেছিল এবং মাটিও নোনা হয়েছিল। আবার যখন চাষের সময় হল আষাঢ় মাসের দিকে, বহু দূর দূর অঞ্চল থেকে বীজ ধান এনে চাষের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। হয়ত নোনা মাটির জন্য ধান চাষ হত কিনা সন্দেহ, তারপর বৃষ্টি হতেই উড়িষ্যার সুবর্ণরেখা নদীতে বন্যা হওয়াতে, নদী পাড়ের বাঁধ ভেঙে আমাদের গ্রাম পর্যন্ত নদীর মিষ্টি জল এসে মাঠ ডুবিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে নোনা ভাব কেটে গিয়ে জমিতে ধান হয়েছিল। তারপর গ্রামের অনেকেই বাইরে থেকে ধীরে ধীরে ফিরতে আরম্ভ করেছিল। কিছু লোক উড়িষ্যা ও সুন্দরবনে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছে। প্রায় দুই বছর আমাদের ওই অঞ্চলে কোন স্কুল ছিল না, স্কুল বাড়ি তো পড়েই গেছিল, পরে যখন আরম্ভ হল লোকের বাড়িতে কিছু ছেলেদের নিয়ে।

এই ঝড়বৃষ্টির আগে যে সমস্ত সৈন্য ঘর পোড়াত তারা পিছাবনীতে ফাঁকা জায়গায় তাঁবু ফেলেছিল। তারপর বন্যার ফলে তাদের কয়েক জন মারা গেছিল। তাদের সেই খালের পাড়ে খাস জমিতে কবর দিয়ে জায়গাটি ইট দিয়ে ঘিরে রেখেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের সেই কবর খুঁড়ে শব নিয়ে গেছে। □

শ্রীভাস্করচন্দ্র জানা*
গ্রাম : কালিন্দী
পোস্ট : কালিন্দী
থানা : রামনগর
জেলা : মেদিনীপুর

* শ্রীভাস্করচন্দ্র জানার বয়স ৬০ বছর। আনন্দবাজার সংস্থার কর্মী তিনি।

চিত্ত প্রসাদ সম্পর্কে

তাঁর ছবিতে 'চিত্ত প্রসাদ' নামটি আলাদা হতে দেখিনি। কিন্তু লেখার ক্ষেত্রে নামটি সর্বদাই আলাদা লিখেছেন। আমরা লেখার রীতিটিই অনুসরণ করেছি। তাতে 'প্রসাদ' যেন উপাধি। নিজের নামের পিছনে ভট্টাচার্য লিখেছেন এমন দেখিইনি। চিত্ত প্রসাদের জন্ম ১৯১৫ সালে নৈহাটিতে। বাবা চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সরকারি চাকরি করতেন। শ্রীরামপুর থেকে রামপুরহাট, যশোর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরে বদলি হয়ে যেতে হয়েছে চারুচন্দ্রকে। সেই সুবাদে চিত্ত প্রসাদও দেশটাকে ঘুরে দেখেছেন। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর শিশু মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। কক্সবাজারে শিশু চিত্ত প্রসাদ স্লেট মাটি সংগ্রহ করতেন। গড়তেন মূর্তি। তাঁর তৈরি সরস্বতী মূর্তির পুজোও হয়েছে। গুরুসদয় দত্তের স্ত্রী সরোজনলিনী দেবীর মহিলা সংগঠনের সদস্যা মা ইন্দুমতীই তাঁকে শিল্পকর্মে প্রেরণা জুগিয়েছেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কিছুদিন পরেই মাষ্টারদা, গণেশ ঘোষ, প্রীতিলতা, ও কল্পনার (পরবর্তীকালের কল্পনা যোশি) সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের পরিচয় হয়।

চট্টগ্রাম কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন চিত্ত প্রসাদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে তখন। সেই সময় পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) কমিউনিস্ট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছিল। সুরেশ চক্রবর্তী চিত্ত প্রসাদকে মার্কসবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য বইপত্তর দিতে থাকেন। এই সময় পি. সি. যোশি চট্টগ্রামে যান। তিনি চিত্ত প্রসাদের কাজ দেখে তাঁকে কলকাতায় পার্টি অফিসে চলে আসতে বলেন।

ভারতের পূর্ব প্রান্তে জাপ-হামলা শুরু হয়েছে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, নোয়াখালি থেকে লোক অপসারণ শুরু হল। চারুচন্দ্র এইসময় মেদিনীপুরে বদলি হয়ে যান। চট্টগ্রামে চিত্ত প্রসাদ থেকে গেলেন। পরে 'পিপলস ওয়ার' কাগজে দুর্দশা পীড়িত চট্টগ্রামের মানুষের কথা মর্মস্পর্শী আঁচড়ে জীবন্ত করে তুলেছিলেন চিত্ত প্রসাদ।

পি. সি. যোশির দেওয়া পরিচয়পত্র নিয়ে ১৯৪০-এ কলকাতার পার্টি অফিসে চলে এলেন। পার্টি অফিসে চিত্ত প্রসাদ দিনকয়েক পোস্টার আঁকলেন। কিন্তু সেখানে স্থায়ী আস্তানা জুটল না।

এরপরই মেদিনীপুর পর্ব। বন্যা-দুর্ভিক্ষের মেদিনীপুর জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিত্ত প্রসাদ আর্ত মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। নির্দয় মৃত্যুমিছিল দেখেছেন কাছ থেকে। 'হাংরি বেঙ্গল' দুর্ভিক্ষনামা সেই বিবরণ ও ছবিতে হয়ে উঠেছে এক ঐতিহাসিক দলিল। পরে নিজের খেয়াল খুশির খাতায়ও দেখা যায় কবিতার আঙ্গিকে ঘুরে ফিরে আসছে এই মৃত্যু :

'তারপর দেখেছি দুর্ভিক্ষ মড়ক,—
দেখেছি মরবার দু মিনিট আগে
খুন হওয়া অন্তঃসত্তা কন্যার দু চোখ'…

মেদিনীপুর থেকে ফিরে এলেন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে। ১৯৪২-এর শেষে যোশির ডাকে বোম্বাই গেলেন। কৃষক-মজুর সম্মেলনের, তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ছবি আঁকা শুরু হল। 'পিপলস এজ', 'পিপলস ওয়ার', 'জনযুদ্ধ' ইত্যাদি পত্রিকায় চিত্ত প্রসাদের অজস্র ছবি ছাপা হয় এসময়।

১৯৪০-এর পর মুছে গেল পার্টির সঙ্গে সব সম্পর্ক। নেতা ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অনেকের মধ্যে আখের গোছানোর ঝোঁক দেখে হতাশ, বিরক্ত হয়ে পড়েন। পেট চালানোর জন্য সিনেমার বিজ্ঞাপনের কাজ করেছেন। ব্যবসায়িক মন না থাকায় এসব ক্ষেত্রে কেবলই ঠকেছেন। অর্থ কষ্ট তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। টান পড়েছে দু বেলার দুমুঠো খাবারেও। জীবনের শেষ কটা দিন অসুস্থ হয়ে কলকাতায় কাটান। ১৯৭৮ সালের ১৩ নভেম্বর চিত্ত প্রসাদ মারা যান। □

চিত্ত প্রসাদের খাতা

চিত্ত প্রসাদের অপ্রকাশিত রচনা ও মুদ্রিত হয়নি এরকম ছবির সংখ্যা অনেক। বাংলার দুর্ভিক্ষ, তেলেঙ্গানা বিপ্লব ও বোম্বাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যে দু-তিনজন শিল্পীর জীবন ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে চিত্ত প্রসাদ তাঁদের অন্যতম। জয়নাল আবেদিন, সোমনাথ হোর, সুধীর খাস্তগীর এবং চিত্ত প্রসাদ সেদিক থেকে একটি যুগের যোগ্য প্রতিনিধি।

বোম্বাইয়ে থাকাকালীনই চিত্ত প্রসাদ নিজের খেয়ালে নানা রকম লেখার কাজে হাত দিয়েছিলেন।

একটি খাতার শুরুতে লেখা আছে :

চিত্ত প্রসাদ
জুলাই ২৫, ১৯৬২
'রুবি টেরেস'
কুর্লা রোড, আন্ধেরী
বোম্বাই ৬৯

সব খাতায় এভাবে লেখা হয়নি— কোন রকম নাম ঠিকানা ছাড়াও একেবারে

প্রথম পাতা থেকেও লেখা শুরু হয়েছে। কবিতা, ছড়া, নিবন্ধ, কবিতায় চিঠি, চিঠিতে কাহিনী— নানারকম লেখা। কবিতায় দিনলিপিও লেখা হয়েছে। এসব লেখার পিছনে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা কিছু ছিল না। কবিতায় দিনলিপির যে আদল আসে তাতে দেখা যায় বাহ্যজগতের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে নিজেরই মনের নানা অবস্থা। সমাজ ও জীবনের নানা প্রশ্ন। এসবের মধ্যে তিনি ঢুকে রাখেন কোচবিহার থেকে সংগৃহীত মৌচাক কাটার মন্ত্রও।

যোগসূত্রে প্রকাশিত চিত্ত প্রসাদের লেখা দুটি খাতা থেকে সংগৃহীত। একটি ১২৮ পৃষ্ঠার স্কলার খাতা, খাতাটির পিছনে 'সি এস এস কলকাতা' মুদ্রিত আছে। অর্থাৎ খাতাটি সম্ভবত কলকাতা থেকে সংগৃহীত। দ্বিতীয় খাতাটি বাঁধানো। পাতার দুদিকেই লিখেছেন, বাঁদিকে বেশি মার্জিন রেখে।

'গুহাচিত্র' শিরোনামে যে রচনাটি প্রকাশ করা হল, সম্ভবত সেটিই একমাত্র পরিকল্পিত রচনা। 'ভারতীয় চিত্র ও ভাস্কর্যের ইতিহাস' এই রকম একটি শিরোনামও দিয়েছিলেন তিনি। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রচনার শেষে তারিখ লিখলেও, এখানে কোন তারিখ দেওয়া নেই। চিত্র ও ভাস্কর্যের এই ইতিহাস রচনার কাজ তিনি শুরু করে-ছিলেন মাত্র। মুদ্রিত অংশটির জন্য মূলে রয়েছে 'প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র' এই শিরোনাম।

সাধারণভাবে চিত্ত প্রসাদের বানান রীতি আমরা বজায় রেখেছি। দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া। যেমন সুডান, স্পেইন, কিনতু বদলে করা হয়েছে সুদান, স্পেন, কিন্তু। □

হাংরি বেঙ্গল

দুর্ভিক্ষের জীবন্ত দলিল এই পুস্তিকাটি ছাপার কাজ শেষ হওয়া মাত্র ইংরেজ সরকার এটির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে। পুড়িয়ে ফেলা হয় প্রায় সমস্ত কপি। দু-একটি কপি কোনক্রমে অক্ষত থেকে যায়। 'পিপলস ওয়্যার' পত্রিকায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়ে চলেছিল মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকা ঘুরে রচিত চিত্ত প্রসাদের প্রতিবেদন ও ছবি। এইসবে বাংলার বিয়াল্লিশের দুর্ভিক্ষের সঙ্গে চিত্ত প্রসাদের নামটি জড়িয়ে যায়। 'হাংরি বেঙ্গল' পুস্তিকাটির নাম অনেকের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু পুস্তিকাটি চোখে দেখার সুযোগ খুব কম লোকেরই হয়েছে। শাহরাফ আতার আলি বইটির প্রকাশক, প্রকাশকের ঠিকানা ছাপা হয়েছিল: রাজভবন, সান্ডহার্স্ট রোড, বোম্বাই।

১৯০বি, খেতবাদি মেইন রোড, বোম্বাই-৪। নিউ এজ প্রিন্টিং প্রেস বইটি ছেপেছিল। দাম : তিন টাকা।

কভার পাটকিলে রঙের ক্ষুধার্ত অবসন্ন এক মহিলা ও শিশুর ছবি। পাশেই রয়েছে একটি শূন্য হাঁড়ি। এই ছবিটির উপর মোটা আঁচড়ে লেখা রয়েছে, HUNGRY BENGAL কথাটা। একেবারে তলায় টাইপে কম্পোজ করা হয়েছে 'A Tour Through Midnapur District, By CHITTA PROSAD, in November 1943 এবং তার নিচে ডান দিকে কোণ ঘেঁষে অপেক্ষাকৃত ছোট টাইপে ছাপা আছে 'Price Rs. 3/- কথাটি। ডিমাই ⅛ সাইজে বইটি ছাপা। □

চিত্ত প্রসাদকে লেখা জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের চিঠি

৮/৫/৬৭

ওরে রে প্রকাণ্ড-কাণ্ড প্রমত্ত মাতাল,

তোমার বিচিত্র পত্রে হৃদয়-চাতাল স্নেহ-লিপ্ত, পিচ্ছিল প্রণয় নির্য্যাসে। অনুরাগ-রক্তছটা বিচ্ছুরিত প্রাণের আকাশে। তোমার বেদনা বুঝি উজ্জীবিত শিল্পের গভীরে আমারও বেদনা জেনো পুঞ্জীভূত চেতনার তীরে যত ক্ষয় যত ক্ষতি অসম্মান অবনতি বন্ধু- নেই প্রেম নেই আছে শুধু আত্মরতি— সব সব সবকিছু ভুলে যেতে পারো সমস্ত ক্ষয়ের চেয়ে তুমি সত্য আরও। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম স্নায়ু নিয়ে জীবন ত নয়, কী হবে প্রাক্তন ভেবে ; অমোঘ চূড়ায় তপ্ত মরু বিজয়ের কেতন উড়ায়। যতক্ষণ শ্বাস ভাই ততক্ষণ আশ—চলে এসো কর্ম্মব্যূহ দীর্ণ করে আজ তোমার শিল্পের চিত্র তোমার পুতুল কোটি ব্যর্থ জীবনের চেয়ে বড় জেনো। আমাদের মৃত্যু নেই ক্ষয় নেই, শেষ নেই স্রষ্টাদের ছায়া নেই কায়া নেই মায়া নেই অথচ তাদেরই ছায়া কায়া আর মায়া নিয়ে সম্মুগ্ধ জীবন। ভুলে যাও ব্যর্থতার নেশা—অবক্ষয় তোমার সাজে না। স্বাস্থ্য আনো স্থৈর্য্য আনো আমার দক্ষিণ হাত বাড়াচ্ছি, টানো ॥

নিত্যশুভানুধ্যায়ী

বটুকদা

□

সোমনাথ হোরকে লেখা চিত্ত প্রসাদের চিঠি

৩১ অক্টোবর '৫২

ভাই সোমনাথ,

কাল তোমার চিঠি পেলাম নন্দবাবুর পত্রসহ। এর আগে, মানে অনেকদিন আগে তোমার আর রেবার চিঠি পেয়েছি কিন্তু আজ লিখি কাল লিখি করে' তোমাদের চিঠির উত্তর দিয়ে উঠতে পারিনি। তোমাদের কথা সব সময় আমার মনে থাকে ভাই সোমনাথ, তোমাদের মতো করে' আমায় ভালোবাসে এ পৃথিবীতে আমার আর ক'জনই বা আপনার জন আছে বলো। তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে যতোই দেরি করছিলাম ততোই নিজেরই কাছে নিজেকে লজ্জিত বোধ করছিলাম। বিশেষ করে গত সপ্তাহেক অবধি তোমাদের কথা খুবই মনে হ'চ্ছিল।

নন্দবাবুর আশীর্বাদী যে চিঠিখানি পাঠিয়েছ তা পেয়ে যেমন অসীম আনন্দ হোলো তেমনি অবাক হ'লাম। অতোটুকু কাজের অতো বড়ো পুরস্কার আমি যেন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না কাল সারাদিন। অনেকের প্রশংসা স্নেহ পেয়েছি জীবনে কিন্তু নন্দবাবুর স্নেহ আশীর্বাদ যেন আমার কাছে স্বপ্নাতীত রকমের অপ্রত্যাশিত আর কতো বড়ো মূল্যবান আমার কাছে ঐ চিঠিটুকু তা তোমায় বর্লে বোঝাতে পারবো না। ভাই সোমনাথ, তুমি আমার বুকভরা ভালোবাসা জেনো আমার সকল শুভেচ্ছা রইলো তোমার উদ্দেশ্যে, তুমি আমায় আমার জীবনের এক অমূল্য পুরস্কার পাঠিয়েছো। একেক সময় মনে হ'চ্ছে অতো বড়ো পুরস্কারের যোগ্য কাজ আমি আজো কিছুই করিনি। নন্দবাবুর হাতে খাতাটি সত্যি পেঁছবে জানলে আরো যত্ন নিয়ে কাজটি করতাম। শুনেছি লোকের কাছে যে নন্দবাবু সহজে চিঠিপত্র লেখেন না ভক্তদেরও। আর সেই নন্দবাবু নিজে থেকে ঐ চিঠি লিখেছেন আমায়। বুঝতে পারি যে কাজকে তিনি কতো ভালোবাসেন। আমি তাঁকে নিশ্চয় লিখবো আজকালের মধ্যেই। আনন্দের নেশাটা একটু থিতিয়ে নিই, এখন কিছু লিখতে নার্ভাস লাগছে আমার। তুমি যদি আজ আমার কাছে থাকতে তবে পাগলের মতো তোমায় বুকে ধরে নাচতাম ভাই, কিন্তু এমন কপাল আমার, আমার ঘরে আমি সম্পূর্ণ একা। একা একা দুঃখ ভোগ করা যায়, বোধহয় উচিতও তাই, কিন্তু আনন্দভোগ করা যায় না, কেমন তাই না? নন্দবাবুর চিঠির খবরে সবচেয়ে খুশি হবেন আমার মা কারণ তাঁর কাছে 'সবার উপরে শান্তিনিকেতন সত্য তাহার উপরে নাই।' আর খুশি হবেন দাদা— যোশি— আর সমরদা। কিন্তু কেই বা খুশি হবেন না বলো।

নন্দবাবুর চিঠি পড়ে তাঁকে যেন নতুন করে দেখলাম এবার। তিনি 'হাতের কায়দা'র

চেয়ে 'যাহা বলতে চাচ্ছি'কে 'ভালোকাজের' মাপকাঠি করেছেন চিঠিতে, মানে ফর্মের ঊর্ধ্বে Contentকে ! তাঁর নিজের কাজ থেকে এটি আমি বুঝতে পারিনি কখনো।

এবার তোমায় (আর রেবাকেও) কিছু সুখবর দিই। PPH আমার ঐ লিনোর খাতাটি ছাপিয়ে বার করছে শীঘ্রই। প্রত্যেকটি ছবির সঙ্গে এক একটি ছড়া লিখেছিলাম— ইংরেজিতে— সেগুলি সমেত। খাতার শেষ ছবিটি নতুন করে করেছি। ইংরেজি ছড়া সব Pat Miles— এক ইংরেজ লেখিকাকে দিয়ে দেখিয়ে নিয়েছি।

তারপর দ্বিতীয় সুখবর : তোমাদের 'ওগোনিয়ক্' নামের সভিয়েট পত্রিকার কথা ইতিপূর্বে লিখেছিলাম। আরো লিখেছিলাম ওগোনিয়কের art-editor ভিক্টর ক্লিমাশিন্ আমার আর সমরদার কিছু কাজ নিয়ে গেছিলেন। আজ হপ্তাখানেক হোলো ওগোনিয়কের ১৪ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যা পেয়েছি, তাতে সমরদা'র দুখানি ছবি— ওয়াটার কালারের ধানক্ষেত আর সমুদ্দুরের ছবি, আর আমার পাঁচখানি সবর্ণে ছেপে বেরিয়েছে! আমার ছবির চারখানি Pastel-landscapes, আর একখানি Poster Colour-এ (tempara বলতে পারো, বা গোয়াশ্)— Composition— 'বেজোয়াভার চাষীর মেয়েরা জোয়া তানিয়ার গীতিকা গাইছে'— '৪৪ শালে কিষাণ সভার কনফারেন্সে দেখেছিলাম— স্কেচ করে' এনেছিলাম— পরে '৪৫ শালে ছবিটি এঁকেছিলাম। এটি আমার প্রণামী ছিল সভিয়েট মুক্তি ফৌজের এবং সভিয়েট বীর নরনারীর উদ্দেশ্যে, ফ্যাসিস্ট বর্বরতার হাত থেকে বিশ্বকে তথা আমাদের দেশকে তাঁরা রক্ষা করেছেন সেই সীমাহীন ঋণের স্বীকৃতি হিসেবে। এতো দিনে আমার সেই প্রণামী পৌঁছল মনে হচ্ছে যথাস্থানে। বলো খুশি হয়েছ কিনা এই সুখবরে। ল্যান্ডস্কেপগুলির সম্পর্কে পত্রিকাটিতে পরিচয়সূত্রে লিখেছে যে ওগুলি এদেশের শিল্প-ধারায় realism এর নতুন পরিচয়— স্বদেশের সৌন্দর্যকে ভালোবাসা এবং যথাযথভাবে আঁকার চেষ্টা। ওগোনিয়কে নিজের কাজ বেরুতে দেখে কতো আনন্দ কতো সাহস কতো গর্ব বোধ করেছি তা না বললেও বুঝতে পারো। তবু এতো কুণ্ঠিত বোধ করছি যে কি বলবো— কিছুদিন আগেই তো সোভিয়েট ছবির নমুনা কিছু দেখেছি তো নিজের চোখেই। আর ওগোনিয়কে ছবি বেরোনো ব্যাপারটা সভিয়েট শিল্পীর পক্ষেও যে কতো বড়ো সম্মানের তা এই থেকে বুঝবে যে একমাত্র স্তালিন প্রাইজ বিজয়ী ভিন্ন অন্য কোনো সভিয়েট শিল্পীর কাজ ও পত্রিকায় বার হয় না। এমন কি— আজ প্রায় তিনবছর অবধি ওগোনিয়কের গ্রাহক আমি— এর মধ্যে একবার শুধু চীনের রঙিন উডকাটের ছাপা দেখেছি ওতে। আর বিদেশীর মধ্যে আমেরিকার নিগ্রো শিল্পী Charles White এর একখানি রঙিন— নিগ্রো মেয়ের Portrait, আর তিনখানি black & white বেরিয়েছিল। —এর মানে, সোভিয়েট দেশে ভারতের কী অসীম সম্মান তা আমাদের ধারণার অতীত। ওগোনিয়ক আমার হাতে মাত্র এক কপি, নইলে তোমায় পাঠাতাম নিশ্চয়। যদি ওখানে কোথাও যোগাড় করতে পারো— ধরো Current Book

House-এ, চেষ্টা কোরো ১৪ই সেপ্টেম্বর '৫২-র সংখ্যা।

তুমি যে সামনের শীতে কলকাতায় আমার ছবির exhibition করতে চাও ভাই, তা কি করে সম্ভব হবে? প্রথম কথাই হোলো, আমার অতো ছবি কই? দেখাবার মতো যা কিছু উৎরেছে আজ অবধি তার প্রায় সবই তো হাতছাড়া হ'য়ে কোথায় কোনটা চলে গেছে। মাত্র দুখানি oils-এর কাজ ভগতসিং আর জালিয়ানওয়ালাবাগ হাতে আছে আজো। এছাড়া বহু landscape আছে Pastel-এর কিন্তু সবই স্কেচ সেগুলি। আর কিছু linocut আর pen & ink। এ দিয়ে কি exhibition করা চলে? ঐ ভগত সিং— জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার ছবির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে অন্তত খান দশ বারো ছবি, বা অন্য কিছু নিয়ে major composition যদি ১০/১২ খানা অন্তত থাকতো তবে আর সব মিলিয়ে লোক ডেকে দেখানো চলত। এখন তো দেখাবারই কিছু নেই। সমরদা আর আমি দুজনে মিলে ফি বছরই ঠিক করি exhibition-এর জন্যে ছবি করব সারা বছর একটু একটু করে খেটে, আর ফি বছরই দেখি যে কাজটি ছাড়া আর সবই হয়েছে।— মোট কথা, এবছর তো কিছু হবার নয়, যদি আসছে বছর শীতে কিছু করা যায়।

CROSS ROADS আমায় মাসে ১৫০ টাকা দিচ্ছে, হপ্তায় হপ্তায় কাজ এখান থেকে পাঠাই, হপ্তায় ৩/৪টে দিন ঐ কাজ নিয়ে কেটে যায়। বাকি দিন ক'টা এখনো plan করে' কিছু কাজে লাগাতে পারছি না।

তোমার শরীর আগের চেয়ে ভালো আছে জেনে ভালো লাগলো। কিন্তু ঐ যে চাকরির চেষ্টায় ঘুরচো সে কথায় মন খারাপ হয়ে গেল। আমার অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে তোমায় এখানে চলে আসতে লিখি। কিন্তু কিসের ভরসায় ডাকবো তা তো দেখিনা। বম্বেতে লোকের পয়সা আছে কিন্তু দেখি আর্টিস্টদের দাম সর্বত্রই সমান এদেশে, দু-চার জন পয়সাঅলা লোক, ছবি কেনে বছরে একবার, দেখি তাদের নিয়ে কী নির্লজ্জ খেয়োখেয়ি চলে' আর্টিস্ট মহলে। বিজ্ঞাপন কোম্পানীগুলো যতো আর্টিস্টকে ঠাঁই দেয় তার বেশিকেই খেদিয়ে দেয়।— এই লাঞ্ছনা দেখে আর সাহস হয় না তোমায় এখানে ডাকতে। আমি নিজে অনেকবার ভেবেছি ছবি ছাপা মানে block-making & printing শিখবো, তাতে হাত পাকাতে পারলে অন্তত ভাতে মরতে হবে না। তোমার কেমন মনে হয় ও ধরণের কাজ? যদি ভালো মনে করো কোনো প্রেসে এ্যাপ্রেনটিস হয়ে যেতে পারো কিনা দেখো না। রোজগারের দিকটা secure থাকলে বোধ হয় creative কাজের দিকে মন দেওয়া সহজ হবে। নয় কি? টেকনিক্যাল কিছু জানা থাকলে আমার মনে হয় অনেকটা স্বাধীন হওয়া যায় সমাজের বর্তমান অবস্থায়। তুমি ছাপার কাজ না হোক অন্য কোনো applied-arts-এর কাজের দিকে যদি চেষ্টা করো বোধহয় ভালো হবে। ভেবে দেখো।

রেবার কাছে আমি বড়ো লজ্জিত আছি। সে আমায় উডকাটের কাঠ পাঠাতে

চেয়েছিল। কিন্তু কলকাতা থেকে আসবে এমন কেউ আমার জানা ছিল না। দেবী চাটুজ্জে বিলেতে যাবার পথে এখানে হ'য়ে গেল কিন্তু এখানে মানে আমার ঘরে পেঁছবার আগে সে খবর আমি জানতে পাইনি। রেবাকে বোলো কলকাতায় গিয়ে আমি নিজেই নোবো সে কাঠ আর আমরা এক সঙ্গে বসে খোদাই করবো। মাকে এখানে আনবার জন্যে আমায় যেতেই হবে দুচার মাসের মধ্যে অন্তত। খরচপত্রের অভাবে যেতে পারিনি নইলে ইচ্ছে ছিলো পুজোর সময় যাবার। আচ্ছা তোমার সঙ্গে প্রভাস সেন আর খালেদ চৌধুরির দেখা সাক্ষাৎ হয়? এখানে একজনের মুখে শুনলাম প্রভাস কোন নতুন ঠিকানায়— টালিগঞ্জে আছে। তার ঠিকানাটি আমায় পাঠাতে পারো?

এই সঙ্গে দু কপি করে আমার নোতুন লিনোকাট পাঠালাম, এক কপি করে' তোমরা রেখো। আর এক কপি "মা-শিশু" ডেভিড কোহেনকে দিয়ো উনিটির জন্যে। "মাছধরা"র এক কপি যদি পারো সুভাষকে দিয়ো পরিচয়ের জন্যে, আমি তাকে আলাদা করে' পাঠাবো— কিন্তু কবে তা জানিনা।

আজ চিঠি এখানেই শেষ করি। তোমরা চিঠি দিয়ো— "তাড়াতাড়ি দিয়ো" লিখতে লজ্জা করছে কিন্তু আমি এবার কথা দিচ্ছি তাড়াতাড়ি উত্তর দেবো।

তোমরা দুজনে আমার বুকভরা ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিয়ো। ইতি—

তোমাদের
চিত্ত

□

With best compliments from :

Bharat Lithographing Co.

Photo Offset, Art Printers & Photo Engravers

98/4, S. N. BANERJEE ROAD
CALCUTTA-700 014
Phone : 24-3855 / 24-6862
Gram : LITHO PRINT

With best compliments from :

EASTERN ENTERPRISE

P-14, C. I. T. ROAD
CALCUTTA-700 014
Phone : 29-1375 / 29-1376
Telex : 021-4236 SUR IN

Courier Service, Pest Control, Marketing & Advertising
EXPORT * IMPORT * REAL ESTATE CONSULTANT

□

With best compliments from :

G. K. Construction

ENGINEERS & CONTRACTORS

Specialist : Industrial Piping Structural & Equipment

71 / 2 / 1, ICHAPUR ROAD
KADAMTALA, HOWRAH-711 101

□

With best compliments from :

Hotel Jupiter

Sibaloy Road, Digha
Post—Digha, Dist.—Midnapur (W.B.)

□

With best compliments from :

Reliable Hardware Stores

Manufacturers, Representatives, Hardware Merchants &
General Order Suppliers
185, Chandney Chawk, Calcutta-700 072
Phone : 27-3916

□

□

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

SRI RADHA KRISHNA EXPORT INDUSTRIES LTD

Head Office
207, MAHARSHI DEBENDRA ROAD
CALCUTTA-700 007

Corporate Office
3, MIDDLE ROAD, HASTINGS
CALCUTTA-700 022

Office Ph. : 38-6322 / 7654, 39-8456
22-0394 / 0615
Res. Ph. : 45-7705
Cable : SHIVASAKTI
Telex : 021-3541 SHIV IN
Fax : 9133286871

MERCHANT, EXPORTERS, IMPORTERS AND REPRESENTATIVE

□

বাংলাদেশের হৃদয় হতে···

মঞ্জুষায় এলেই পৌঁছে যাবেন
পশ্চিমবাংলার মর্মস্থলে

বালুচরী থেকে পোড়ামাটি—রেশমের কাজ, মাটির কাজ, পর্দা, গৃহসজ্জার উপকরণ, এমনকি শাড়ী—বাংলার বহু শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্যের নানা ফসল আপনার জন্য একত্র করেছে মঞ্জুষা

আসুন
মঞ্জুষায়
সঙ্গে নিয়ে যান একটু কিছু
যা একান্তভাবেই পশ্চিমবাংলার

পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৭১, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৬

□

□

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

KHAN ELECTRONICS

29/1B, CHADNEY CHOWK STREET
BIMLA CHOWK, 1st Floor, Shop No. 120
CALCUTTA-700 072
Phone : P. P. 27-8662

A most trusted repairing centre for
Funai, Akai, National and other
makes V. C. R., V. C. P. & Colour TV

by

SHAWKAT ALI KHAN

and

UTTAM NEWPANI

□

SPACE DONATED BY :

A

WELL

WISHER

□

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

LEMUIR GROUP OF COMPANIES

LEE & MUIR HEAD LTD.—Sea Division
LEMUIR AIR EXPRESS—Air Division
LEMUIR CONTAINER—Container Division
LEMUIR PACKERS—Packing Division
LEMUIR EXPRESS—Courier

26, SHAKESPEARE SARANI
CALCUTTA-700 071

5, CLIVE ROW
CALCUTTA-700 001

Phone : 40-5369, 20-7671/2/3, 20-8459,
47-6235, 47-4326/7

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

M/s. B. K. ELECTRIC CO.

21, KHETRA MITRA LANE
HOWRAH-711 106

□

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

B. M. ENTERPRISE

76/2A, A. P. C. ROAD

CALCUTTA-700 009

Quality Printers & Binders

□

WITH BEST COMPLIMENTS OF :

LUMEN INDUSTRIES

Regd. Under S. S. I. (Govt. of W. B.)

133, RAY BAHADUR ROAD

(Elyde Fan Building)

CALCUTTA-700 034

□

NO MORE TRIAL & ERROR FOR YOU

It is already perfected

Buy— 'KONATRON'

Inverter *

Voltage Stabilizer *

Battery Charger *

Marketed by :

THE HOWRAH MOTOR CO. LTD

16, R. N. MUKHERJEE ROAD

CALCUTTA-700 001

Phone : 28-1805 / 9

Branches at :

Cuttack, Delhi, Dhanbad, Guwahati, Patna, Siliguri

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :

STAR TEA COMPANY PVT. LTD.

[SINCE 1940]

RETAILER, WHOLESELLER & EXPORTER

8/1 LALBAZAR STREET
CALCUTTA-700001

Office : 20 0559
20 5710

Shop : 28 2630

BRANCH:

23 R. G. KAR ROAD
CALCUTTA-700004
Phone : 55 6599

Cable : HINDCHA

Telex : 212352 STARIN

কুন্তল রায় কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হতে মুদ্রিত এবং টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।